কেন এমন হলো

শ্যামল বসু

রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন ॥ কলিকাতা-৭০০ ০০৯

যাঁর হাত ধরে জীবনের চলার পথে নির্ভয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ করার সাহস পেয়েছি, যাঁর আপোসহীন সংগ্রাম ও প্রতিজ্ঞার প্রবল চাপে ভারতবর্ষে গণতন্ত্র খতম করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চক্রান্তের প্রধান দুর্গটি একেবারে ধুলিসাৎ হয়ে গেছে সেই পিতৃপ্রতিম

শ্রী রাজনারায়ণের

করকমলে শ্রদ্ধার সঙ্গে এই সামান্য গ্রন্থটি অর্পিত হলো।

এই লেখকের অন্যান্য বই :

নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য
খুনী মুখ্যমন্ত্রী
শিক্ষা প্রসঙ্গে
আমি মুজিবর বলছি
সুভাষ ঘরে ফেরে নাই
হায় স্বদেশ ! আমরা জুয়া খেলছি

ইয়ে আকাশবাণী দিল্লী। রায়বরেলী সে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কী চুনাও পরিণাম ঘোষিত্ কিয়ে গয়ে। জনতা পার্টি কে উম্মিদবার শ্রী রাজনারায়ণ নে শ্রীমতী গান্ধী কো পচ্পান হাজার সে ভী অধিক ভোটো সে হারাকর বিজয়ী হুঁয়ে।

এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত মাত্র কয়েকটি শব্দ হঠাৎ যেন একটা জ্বলন্ত দেশলাই-কাঠিতে রূপান্তরিত হয়ে ছিটকে এসে পড়লো এক বিরাট বারুদের স্তূপের ওপর। 'ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া'ওয়ালা মতলববাজের দল গত কয়েক বছর ধরেই এই বারুদের স্তূপকে মৃত-মুষিকের-ফসিল-স্তূপ বলে প্রচার করে আসছিলো এবং সহযোগী দালালদেরকেও সে কথা বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছিলো। 'বাবু যতো বলে পারিষদ দলে বলে তার শত গুণ' নীতিতে বিশ্বাসী দালালের দলও তাই দু হাত তুলে নৃত্য সহযোগে গান গাওয়া শুরু করেছিলোঃ 'জিতেগা ভাই জিতেগা, গাই বাছরা জিতেগা।'

প্রচার ছিলো ভয়ঙ্কর, অপপ্রচার ছিলো তার থেকেও বেশি। তাই জন-মন ছিলো আশঙ্কিত, আতঙ্কিত। দুরু দুরু বুক নিয়ে কোটি কোটি মানুষ সন্ধ্যা থেকেই খরগোশের মতো কান খাড়া করে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বসেছিলো রেডিওর সামনে। তখন প্রত্যেকের মনেই শুধু একটি জিজ্ঞাসার পেণ্ডুলাম দুলছিলোঃ এদেশে গণতন্ত্র আসবে, নাকি এক-নায়কতন্ত্রই চিরকালের জন্য আসন গেড়ে বসবে অর্দ্ধাহারে-অনাহারে শীর্ণদেহ অর্দ্ধ-উলঙ্গ মানুষগুলোর বুকের নড়বড়ে পাঁজরার ওপর। প্রশ্ন ছিলোঃ এরপরও কি এদেশে দেড়জন মানুষেরই রাজত্ব চলবে, নাকি জনতাই হবে এ-'রাজের' মালিক।

রেডিওর খবরই ছিলো যাদের কাছে একমাত্র 'সংবাদ-সূত্র' সেই কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মনের শঙ্কিত প্রশ্নের বহু-প্রতীক্ষিত ছড়ানো ছিটোনো উত্তর আসা শুরু হয়ে গিয়েছিলো অনেক আগেই—সন্ধ্যা সাতটা থেকে। প্রথম দিকে যে খবরগুলো আসছিলো তাকে রাজনীতিক

পরিভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় 'তেমন আশাব্যঞ্জক নয়।' বরং সেগুলো সাধারণ মানুষের আশা-লালায়িত চোখের ঔজ্জ্বল্যতাকে ক্রমাগত নিষ্প্রভ করেই তুলছিলো। তখন কংগ্রেস চারটে আসন পাচ্ছিলো তো জনতার ভাগ্যে জুটছিলো ছুটো কি তিনটে। যদিও কিছু কিছু অতি-আশাবাদী 'টেম্পো' বজায় রাখার জন্য এবং ম্রিয়মান জন-চোখে ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ক্রমাগত দক্ষিণ ও উত্তরের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিপরীতাত্মক গুণাগুণ বর্ণনায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করে রেখেছিলো, তবু বাস্তব সত্য ছিলো এই যে, যাদের চোখের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পেয়েছিলো, তারা অন্যমনস্কভাবে চেষ্টা করেও সেই হৃত ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনার মতো কোনো আন্তরিক তাগিদ অনুভব করছিলো না।

ফলাফল ঘোষণার প্রথম চার ঘণ্টা কেটেছিলো এভাবেই। তারপর শুরু হলো হাওয়ার দিগ্-পরিবর্তন। দক্ষিণী হাওয়া আকস্মিকভাবে পর্যবসিত হয়ে গেলো উত্তুরে ঝড়ে। একটার পর একটা ইন্দ্রপতনের খবর এসে আছড়ে পড়তে লাগলো জন-সমুদ্রের উত্তাল বক্ষে। প্রতিশোধ-সফল উল্লাসে ফেটে পড়লো জনতা। দিকে দিকে জয়ধ্বনি উঠলো 'জনতা পার্টি জিন্দাবাদ' 'লোকনায়ক জয়প্রকাশ জিন্দাবাদ।'

জনসমুদ্রে 'জিন্দাবাদ' ধ্বনির জোয়ার আসতে রাত এগারোটা বেজে গেলেও সমগ্র দেশব্যাপী ভোট গণনা কেন্দ্রগুলোতে কিন্তু বেলা ছুটো থেকেই 'জিন্দাবাদ' তরঙ্গের আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। মথুরায় মনিরাম বাগড়ী যখন এক লক্ষ ষাট হাজার ভোটে এগিয়ে রয়েছেন তখন রায়বেরেলীতেও রাজনারায়ণ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ষোলো হাজার ভোটে পিছিয়ে দিয়েছেন। আবার ওদিকে আমেথীতে সঞ্জয় গান্ধী যখন রবীন্দ্র প্রতাপ সিংয়ের থেকে চল্লিশ হাজার ভোটে পিছিয়ে পড়েছেন তখন ভিমানীতে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী এবং দেড় জন মানুষের-বংশবদ বংশীলালের মধ্যে ভোটের ব্যবধান দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার।

যারা তখন ভোট গণনা কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে এবং যারা ভেতরে ভোট গণনার কাজে ব্যাপৃত তাদের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে কেন, কারো পক্ষেই সম্ভব বলে আমি অন্তত বিশ্বাস করি না।

সেই উত্তেজনা, সেই মুহুর্মুহুঃ জলের গেলাসে চুমুক দেওয়া, ইতস্তত ছুটোছুটি, চকিত দৃষ্টি-নিক্ষেপ এবং দৃষ্টি-পরিবর্তন, উচ্ছ্বাস, আবেগ, আনন্দাশ্রু, আলিঙ্গন, করমর্দন, শ্লোগান—এর কোনো বর্ণনা হয় না, বর্ণনা দেওয়া যায় না, বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

শুধু রায়বেরেলীর কথাই ধরা যাক।

ছোট্ট শহর, তুলনীয় হতে পারে নৈহাটি, কিংবা বড়োজোর বারাকপুরের সঙ্গে। স্টেশনে নেমে শহরের শেষপ্রান্তে পৌঁছোতে সাইকেল রিক্সায় খুব বেশি যদি সময় লাগে তো দশ থেকে বারো মিনিট। অনুমেয়, এ শহরে হাজার পঞ্চাশেকের বেশি লোক থাকা সম্ভব নয়, বরং সংখ্যাটা নিচের দিকেই হওয়া স্বাভাবিক।

সেই শহরে ভোট গণনা শুরু হয়েছে বিশে মার্চ সকাল আটটায়। স্থান আদালত প্রাঙ্গণ। প্রতিদ্বন্দ্বী: ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা নেহরু গান্ধী এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে উনিশ শো একাত্তর সালের নির্বাচনী মামলায় বিজয়ী শ্রী রাজনারায়ণ। এ ছাড়াও ভোটপত্রে মুদ্রিত হয়েছে আরো সাতটি নাম ও নির্বাচনী চিহ্ন। তবে সেইসব নির্বাচন প্রার্থীদের কাউকেই রায়বেরেলীর জনতা কখনো দেখেনি—কিংবা বলা যেতে পারে, সেইসব 'ভাগ্যবানের দল' ভোটে দাঁড়ানো বাবদ খরচ খরচা সুদ সহ ফেরৎ পেয়ে যাবার পর আর রায়বেরেলীর জনতাকে দর্শন দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি।

কথাটা অপ্রিয় হলেও লিখতে হলো—কারণ, ভোটের বহু আগে থেকেই রায়বেরেলীতে বেশ কিছু লোক বলাবলি করছিলো যে কেবলমাত্র ভোটারদের বিভ্রান্ত করার জন্যই শাসক দলের পক্ষ থেকে এই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

কিন্তু কৌশলটা কি?

গ্রামের অশিক্ষিত জনসাধারণ প্রার্থীর নাম পড়তে পারে না, তারা ভোট দেয় নির্বাচন-চিহ্ন দেখে। সুতরাং সেই ভোটারদের বিভ্রান্ত করার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে তাদের সামনে বিভ্রান্তিকরভাবে নির্বাচন-চিহ্নগুলোকে হাজির করা। দুটি কি তিনটি নির্বাচন-চিহ্ন থাকলে ভোটারের পক্ষে

সহজেই নিজের পছন্দসই প্রার্থীর নির্বাচন-চিহ্ন খুঁজে বের করে তার ওপর ছাপ মারা যতোটা সহজ আট দশটি নির্বাচন চিহ্নের মধ্যে থেকে নিজের পছন্দসই প্রার্থীর নির্বাচন-চিহ্ন খুঁজে বের করে তাতে সঠিকভাবে ছাপ মারা ততোটা সহজ নয়। সেক্ষেত্রে বিভ্রান্তির ফলে বহু ভোটারের ভোটই বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় কিংবা ভুল জায়গায় ছাপ মারার ফলে ভোটারের প্রার্থীত লোকটির ভাগ্যে ভোটটি না জুটে অন্য কারো ভাগ্যে জুটে যেতে পারে।

এছাড়া এসব ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত গ্রামীণ ভোটার সাধারণত বিরাট প্রার্থী তালিকার ওপর দু-একবার চোখ বুলিয়ে শেষে বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য ভোটপত্রের একেবারে মাথার দিকে যে-প্রার্থীর নাম এবং নির্বাচনী চিহ্ন থাকে তাকেই ভোট দিয়ে বসে।

শহরে বসবাসকারী লোকেদের কাছে কথাটা হাস্যকর শোনালেও উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান কিংবা উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ দরিদ্র অশিক্ষিত চাষীদের সঙ্গে যাদের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ আছে তারাই এই ঘটনার সত্যাসত্য স্বীকার না করে পারবেন না।

রায়বেরেলীতেও তাই করা হয়েছে। একফুট লম্বা ভোটপত্রের একেবারে উপরের দিকে ছিলো শ্রীমতী ইন্দিরা নেহরু গান্ধীর নাম এবং তাঁর নির্বাচনী-চিহ্ন গাই-বাছুর। তারপর ছিলো যথাক্রমে শ্রীকামাল আহমেদ খান, শ্রী কৃষ্ণপ্রসাদ, শ্রী ঠাকুরপ্রসাদ, শ্রী নাগরমল বাজোরিয়া, শ্রী পি নাল্লাথাম্পী তেরা এবং সাত নম্বরে শ্রী রাজনারায়ণের নাম। রাজনারায়ণজীর নিচে ছিলো আরো দুটো নাম—সীয়ারাম শুক্লা ও হরিপ্রসাদ শর্মা। শ্রীমতী গান্ধী এবং শ্রী রাজনারায়ণ বাদে আর যে সাতজন এই নির্বাচন কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন তাদের মধ্যে একমাত্র সীয়ারাম শুক্লা ছাড়া আর কেউই স্থানীয় লোক নন। অর্থাৎ রায়বেরেলী নির্বাচনক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী নজন প্রার্থীর মধ্যে আটজনই ছিলেন বাইরের লোক। অথচ ভোটের চূড়ান্ত ফলাফল বিচার করে দেখলে দেখা যায়, শ্রী ঠাকুরপ্রসাদ এবং শ্রী হরিপ্রসাদ শর্মা ছাড়া অন্য প্রতিটি প্রতিদ্বন্দ্বীই স্থানীয় বাসিন্দা

সীয়ারাম শুক্লার থেকে বেশি ভোট পেয়েছেন।

এই রহস্যের সমাধান করতে হলে আমাদের অতি অবশ্যই ভোটের চূড়ান্ত ফলাফল এবং প্রার্থীদের পরিচিতির উপর নজর দিতে হবে।

এক নম্বর প্রার্থী শ্রীমতী ইন্দিরা নেহরু গান্ধীর পরিচিতির কোনো প্রয়োজন নেই, সুতরাং দু নম্বর প্রার্থীর পরিচিতির দিকে প্রথমে নজর দেওয়া যাক। দু নম্বর প্রার্থী কামাল আহমেদ খানের বাসস্থান উত্তরের বস্তি জেলার রামপুরে। নিজের মনোনয়নপত্রে তিনি বয়স লিখেছেন চৌত্রিশ বছর। ভদ্রলোকের একটা পা খোঁড়া, তাই সব সময় তাঁকে লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে হয়। তিনি প্রার্থী হিসেবে কতোটা মজবুত তা একটা ছোটো ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে। তাঁর মনোনয়নপত্রের প্রস্তাবক একজন স্থানীয় মজুর—যাকে তিনি একবেলার মজুরী দেবার শর্তে যোগাড় করে এনেছিলেন—সে ছাড়া তাঁর সাথে রায়বেরেলী শহরের আর একটি লোকও জোটেনি। অথচ আশ্চর্য, ভোট গণনার শেষে দেখা গেলো সেই নিঃসঙ্গ মানুষটিই ৭৪৬৭টি অমূল্য ভোট পেয়েছেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের তালিকায় ভোট প্রাপ্তির দিক থেকে তাঁর ক্রমিক স্থান চতুর্থ।

তৃতীয় প্রার্থী কৃষ্ণপ্রসাদজী স্থানীয় বাসিন্দা নন—রায়বেরেলীতে কেউই তাকে চেনে না, অথচ চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা গেলো তিনি ৪০৮৩টি ভোট পেয়েছেন। ভোট প্রাপ্তির তালিকায় তাঁর স্থান পঞ্চম।

চতুর্থ প্রার্থী ঠাকুরপ্রসাদজীর বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার কালিম্পং-এ। ভদ্রলোক কি করেন তাঁর খোঁজ অন্তত রায়বেরেলীতে কারো জানা নেই, তবে তাঁর দেওয়া একটা হ্যাণ্ডবিল অনেকের হাতেই পড়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, 'আমি কারো কাছে ভোট চাইবো না, কোনো পোস্টার দেবো না, কোথাও বক্তৃতা করবো না।' অথচ তিনিও ভোট পেয়েছেন। ভোটের সংখ্যা ২৫০৩। ক্রমিক হিসেবে তাঁর ঘুঁটি গিয়ে ঠেকেছে একেবারে শেষের ধাপে। নম্বর নয়।

পঞ্চম প্রার্থী নাগরমল বাজোরিয়া এসেছিলেন ভাগলপুর থেকে। ভদ্রলোক পেশায় ব্যবসায়ী। হয়তো সেই ব্যবসায়িক তাগিদেই সুদূর

ভাগলপুর থেকে রায়বেরেলী এসে মনোনয়নপত্র দাখিল করেই আবার তিনি চম্পট দিয়েছিলেন ভাগলপুরের পথে। এঁর ভাগ্যে ভোট জুটেছে ২৯৮০। ভোটপ্রাপ্তির ক্রমিক সংখ্যার দিক থেকে ভদ্রলোকের স্থান ষষ্ঠ।

ভোটপত্রের ক্রমিক অনুযায়ী ষষ্ঠস্থানে অবস্থিতি করছিলেন পি নাল্লাথাম্পী তেরা। তিনি এসেছিলেন কেরলের কালিকট থেকে। রায়বেরেলী পৌঁছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া ছাড়া তিনি আর কোনো কাজ করেননি। অথচ ভোটের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যাচ্ছে শ্রী রাজ নারায়ণ ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পরেই তাঁর স্থান। তিনি পেয়েছেন সর্বমোট ৯৩১১টি ভোট।

সপ্তম স্থানে ছিলেন শ্রী রাজনারায়ণ, আর অষ্টমে ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা মহারাজগঞ্জের শ্রী সায়ারাম শুক্লা, যিনি ইতিপূর্বে নিজের এলাকায় অঞ্চল-প্রধান পদেব জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সর্বমোট ভোট পেয়েছিলেন একটি। অথচ লোকসভাব নির্বাচনে দেখা গেলো, সেই একটি ভোট পাওয়া বাহাত্তর বছরেব অথর্ব ভদ্রলোকটিই ১৮৩৯টি ভোট পেয়ে সপ্তম স্থানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর অষ্টম স্থান মিলেছে রাজস্থানের সিপাহ-সালার, যিনি মনোনয়নপত্র দাখিল করার সমযও তরোবারি আন্দোলিত করছিলেন, সেই হরিপ্রসাদ শর্মার। তিনি ভোট পেয়েছেন ২৭০৩টি।

যদি সাতজন নির্দল প্রার্থীর ভোটের ফল যোগ করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে তাঁরা মোট ৩১৮৮৬ জন ভোটদাতার সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু যদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা যায় তাহলে আমরা কিভাবে এই ফলাফলের বিশ্লেষণ করবো? রাজনারায়ণজী এবং শ্রীমতী গান্ধীর পরেই যিনি সব থেকে বেশি ভোট পেয়েছেন তিনি থাকেন কালিকটে। একদিনের জন্য মাত্র এসেছিলেন রায়বেরেলীতে, মনোনয়নপত্র জমা দিয়েই আবার চলে গেছেন স্বস্থানে। অথচ সেই ভদ্রলোকটি কী যাদুমন্ত্রবলে ৯৩১১ জন ভোটারের সমর্থন আদায় করে নিলেন? যে যে কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মতদাতারা প্রভাবিত হন, যেমন জাত, ধর্ম, ভাষা, দল, মতবাদ ইত্যাদির কোনোটাই তো এক্ষেত্রে কাজে লাগার

কথা নয়। শ্রী তেরার জন্মভূমি কেরালা, তাঁর মাতৃভাষা মালায়ালাম। আমি রায়বেরেলী নির্বাচনক্ষেত্রে একমাসব্যাপী প্রতিদিন কম করেও ১৫০/২০০ মাইল পথ সফর করেছি রাজনারায়ণজীর নির্বাচনী কাজের তদারকীর জন্য। রায়বেরেলী, বাছরাওঁয়া, সাতাওঁ, সারেণী ও ডালমৌ—এই পাঁচটি বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্র নিয়ে গঠিত হয়েছে রায়বেরেলী লোকসভা নির্বাচনী এলাকা। আমার নিজের বিশ্বাস এই বিস্তৃর্ণ এলাকায় এমন কোনো শহর কিংবা গ্রাম নেই যেখানে আমি যাইনি। দক্ষিণের উঁচাহার থেকে উত্তরের বাছরাওঁয়া পর্যন্ত, আর পূবের রাহী থেকে পশ্চিমের খিরো পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে আমি প্রতিদিন ঘুরেছি—কিন্তু কৈ, কোথাও তো একজনও মালায়ালামভাষী কেরলীর দেখা পেলাম না; কিংবা এমন একটি লোকের সঙ্গেও তো আলাপ হলো না যিনি কিনা শ্রী তেরার নাম পর্যন্ত শুনেছেন। অথচ সেই মানুষটিই ৯৩১১টি ভোট পেয়ে গেলেন!

এ রহস্যের একটাই মাত্র উত্তর: তাঁর নাম এবং নির্বাচনী চিহ্নটি ছিলো শ্রী রাজনারায়ণের নাম এবং নির্বাচনী চিহ্নের ঠিক উপরেই। আর যেহেতু এবার নির্বাচন অধিকর্তার দপ্তর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো, কোনো নির্বাচন প্রার্থীই নমুনা ব্যালটপত্রে একমাত্র নিজের নাম ও নির্বাচনী চিহ্ন ছাড়া অন্য কোনো প্রার্থীর নাম ও নির্বাচনী চিহ্ন ছাপাতে পারবেন না, সেহেতু রাজনারায়ণজীর নমুনা-ব্যালটপত্রে মোট ৯টি ঘর কেটে তার সপ্তম ঘরে রাজনারায়ণজীর নাম ও নির্বাচনী চিহ্ন ছাপা হয়েছিলো, এবং বাকি ঘরগুলো ছিলো ফাঁকা। ফলে যারা গ্রামে গ্রামে ভোটারদের কাছে নমুনা-ভোটপত্র নিয়ে কিভাবে ভোট দিতে হবে বোঝাতে যাচ্ছিলো তাদেরকে বারবার শুধু এ কথাই বলতে হচ্ছিলো যে, 'নিচের দিক থেকে তিন নম্বর ঘরে ছাপ দেবেন।' কাউকে আমি একথা বলতে শুনিনি যে ওপর দিক থেকে গুনে গুনে সাত নম্বর ঘরে ছাপ দেবেন। কারণ, তাতে আশঙ্কা ছিলো, অশিক্ষিত গ্রামীণ ভোটার সঠিক ঘরটা গুলিয়ে ফেলবে।

আসলে সাতজন নির্দলীয় খাড়া করার পেছনে কংগ্রেস পক্ষে এই একটাই উদ্দেশ্য ছিলো—যেভাবেই হোক ভোটারকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া।

কারণ, তাতে কংগ্রেসেরই বেশি সুবিধে হওয়ার কথা। কেননা ভোটপত্রে প্রথম নামটি ছিলো ইন্দিরাজীর। যেহেতু তাঁর নামের আদি অক্ষর 'ই' দিয়ে শুরু হচ্ছে সেহেতু বর্ণমালা অনুযায়ী তিনিই ছিলেন সবার উপরে। লক্ষ্য করার বিষয়, যে সাতজন প্রার্থী নির্দলীয় হিসেবে নিজেদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন তাদের কারো নামই অবতার সিং কিংবা আতাউর রহমান অথবা ইকবাল মালিক নয়; কারণ ওই ধরনের নামওয়ালা কোনো লোক যদি প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হতেন তাহলে শ্রীমতী গান্ধীকে তিন কিংবা চার নম্বরে চলে যেতে হতো। সেক্ষেত্রে ভোটাররা তাঁকেও খুঁজে বের করতে গিয়ে হয়রাণ হতেন, এবং সর্দার অবতার সিং এক নম্বরে থাকার পুরো ফায়দাটা উঠিয়ে নিতেন। কিন্তু তা যখন হয়নি, এবং রাজনারায়ণজীর পেছনেও যখন একজন সীয়ারাম ও একজন হরিপ্রসাদ জুটে গেছেন তখন এ সিদ্ধান্তে অবশ্যই আমরা আসতে পারি যে এই নির্দলদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো ভোটার-দের বিভ্রান্ত করা, আর সে কারণেই প্রথমে এই মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছি যে, 'সেই সব ভাগ্যবানের দল ভোটে দাঁড়ানো বাবদ খরচ খরচা সুদসহ ফেরৎ পেয়ে যাবার পর আর রায়বেরেলীর জনতাকে দর্শন দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি।'

কেউ কেউ বলতে পারেন, কংগ্রেসের যদি তাই উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে তো তারা স্থানীয় লোকদের দিয়েই মনোনয়নপত্র দাখিল করাতে পারতো, তার জন্য সুদূর কেরালা, রাজস্থান, কালিম্পং, ভাগলপুর কিংবা বস্তী থেকে লোক খুঁজে আনতে যাবে কেন? সহজ বুদ্ধিতে ভাবতে গেলে প্রশ্নটা বেশ যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হবে ; কিন্তু যদি একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখা যায় তাহলে এ প্রশ্নের অতি সহজ সমাধান পাওয়া যাবে। যদি স্থানীয় লোককে 'ডেমী' হিসেবে খাড়া করে দেওয়া হতো তাহলে তাতে 'রিস্ক' থাকতো ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ার। তাতে কংগ্রেসের কিছু 'জেনুইন' ভোটও ছিটকে গিয়ে পড়তো 'ডেমী' কংগ্রেসীর বাক্সে। তাছাড়া ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে জনমনে তার খারাপ প্রভাব পড়তে পারতো। কিন্তু বাইরের লোককে এনে প্রার্থীপদে দাঁড়

করিয়ে দেওয়াতে অন্তত, জনমনে তেমন ব্যাপক সন্দেহের উদয় হয়নি। তাছাড়া যে সব প্রার্থীকে বাইরে থেকে আনা হয়েছিলো, তাঁরা আচারে ব্যবহারে এতো লঘু চরিত্রের ছিলেন যে সাধারণ মানুষ তাদেরকে নিতান্ত পাগল-ই ভেবেছে—এর পেছনে যে কোনো ষড়যন্ত্র কিংবা উদ্দেশ্যে থাকতে পারে সেটা বেশির ভাগ লোকের মাথায়-ই আসেনি। আর সেই সব প্রার্থীরাও মনোনয়নপত্র জমা দেবার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে এমন সব নাটকীয় কাণ্ডকারখানা করছিলেন, যেমন তরবারি সঞ্চালন, গোঁফে তা-দেওয়া, লাঠি ঘোরানো, ক্রমাগত সাইকেলের বেল বাজানো, মাথায় বারবার পাগড়ি বাঁধা ইত্যাদি, যাতে জনসাধারণ মনে করে যে এসব নিতান্তই পাগলের খেয়াল। এবং বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র রায়বেরেলী শহরে এই সব প্রার্থীদের সম্পর্কে এধরনের কথাই বেশি রটেছিলো।

এই সব প্রার্থীদের কাউকেই চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তবে রায়বেরেলী শহরে পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের কাছে যা শুনেছি তাতে এই সাতজন নির্দল প্রার্থীর বসন ভূষণ এবং শ্রী-ছাঁদ দেখে তাদের কারোই মনে হয়নি যে তাঁরা ইচ্ছে করলেই আটশো, হাজার টাকা খরচ করে রেলে চড়ে রায়বেরেলীতে এসে জামানতের টাকা জমা দিয়ে নির্বাচনে দাঁড়াবার মতো ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং সেক্ষেত্রে যদি সন্দেহ করা হয় যে কেবলমাত্র ভোটদাতাদের বিভ্রান্ত করার জন্যেই তাদেরকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিয়ে এসে টাকা দিয়ে মনোনয়নপত্র ভর্তি করানো হয়েছিলো তাহলে কি সেটা খুব একটা অমূলক সন্দেহ হবে? কেননা, যতোই পাগল হোক, শুধুমাত্র পাগলামি করার জন্যই কোনো গরিব মানুষ আটশো, হাজার টাকা খরচ করতে পারে না।

তর্ক উঠবে: এতে তো ইন্দিরা গান্ধীর নিজেরও ভোট কম পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো।

সবিনয়ে বলবো: না, মোটেই তা ছিলো না। কারণ, যে-কোনো ভোটদাতার পক্ষেই প্রথম ঘরটি খুঁজে নেওয়ার থেকে সহজ কাজ আর কিছুই হতে পারে না। কংগ্রেস পক্ষের প্রচারকরা তাদের সমর্থকদের যখন কিভাবে ভোট দিতে হবে বোঝাচ্ছিলেন তখন তাদেরকে

শুধু একটা কথাই বলতে হচ্ছিলো, 'একেবারে ওপরের ঘরটাতে ছাপ মারবেন।' কিন্তু যদি শ্রীমতী গান্ধীর নামের আগে অবতার সিং, আতাউর রহমান এবং ইকবাল মালিকের দল জুটে জেতেন তাহলে আর তাঁর প্রচারকরা অতো সহজে তাদের কাজ সারতে পারতেন না। সুতরাং তা যখন হয়নি তখন ইন্দিরাজীর নিজেরও ভোট কম পাওয়ার সম্ভাবনার কথা ওঠে না।

আসলে যা-কিছু হয়েছে, তা শুধুমাত্র রাজনারাণজীর সমর্থকদের বিভ্রান্ত করার জন্যই হয়েছে। এবং এর প্রমাণ ভোটের চূড়ান্ত ফলাফল। তাতে দেখা যাচ্ছে রাজনারায়ণজীর ঠিক আগেই যাঁর নাম ছিলো সেই নাল্লাথাম্পী তেরা পেয়েছেন তৃতীয় বৃহত্তম ভোট। আমি আগেই বলেছি, জাত-পাত মতের বিচারে এর কোনো যুক্তিপূর্ণ উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং এক্ষেত্রে যুক্তিপূর্ণ উত্তর যা হওয়া উচিত তা হচ্ছে : যেহেতু শ্রী তেরার নাম শ্রী রাজনারায়ণের নামের ঠিক উপরেই ছিলো, এবং যেহেতু নমুনা ব্যালটপত্রে প্রার্থী তাঁর নিজের নাম ও নির্বাচনী চিহ্ন ছাড়া আর কারো নাম ও নির্বাচনী চিহ্ন ছাপার অধিকারী ছিলেন না, সেহেতু রাজনারায়ণের সমর্থকদের শুধুমাত্র একটি বাক্যের ওপরই জোর দিতে হয়েছিলো, 'নিচের দিক থেকে তৃতীয়'—আর তার ফলেই বিভ্রান্ত ভোটারদের অনেকেরই সমর্থনের মোহর গিয়ে পড়েছে 'নিচের দিক থেকে তৃতীয়'র পরিবর্তে 'নিচের দিক থেকে তিনটে ছেড়ে' চতুর্থের গায়ে। শুধুমাত্র এই সামান্য বিভ্রান্তি এবং হেরফেরের জন্যই রায়বেরেলীর জনসাধারণের কাছে একবারেই অপরিচিত দু'হাজার কিলোমিটার দূরের মালায়ালামভাষী শ্রী তেরা ৯৩১১টি ভোট পেয়ে গেছেন।

সমালোচকরা বলতে পারেন এ ঘটনা তো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষেত্রেও হয়েছে। কেননা, কামাল আহমেদ খান, যাঁর নাম শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নামের ঠিক পরেই ছিলো তিনিও তো চতুর্থ বৃহত্তম ভোট পেয়েছেন। সবিনয়ে বলবো, হে সমালোচক মহাশয়, কিছু মনে করবেন না, যে ভোটগুলো মাননীয় কামাল আহমেদের ঘাড়ের ওপর বোঝার মতো চেপে বসেছে সেগুলোর অধিকারিণী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নন,

অধিকারী শ্রী রাজনারায়ণ। কারণ, রায়বেরেলীর শতকরা নব্বইজন ভোটারই জানতেন যে তাদের এলাকা থেকে শুধুমাত্র দুজন ব্যক্তিই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দিতা করছেন—তাঁদের একজন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, অন্যজন এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিজয়ী শ্রী রাজনারায়ণ। সুতরাং যারা রাজনারায়ণজীকে ভোট দেবার জন্য গিয়েছিলেন. তাদের মধ্যে অনেকেরই এ-বিশ্বাস ছিলো যে ইন্দিরাজীর পরেই রাজনারায়ণজীর নাম থাকবে, আর সে কারণেই যারা পড়তে পারেন না, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো ব্যাপার বুঝিয়ে দিলেও কিছুক্ষণ পরে আর তা মনে রাখতে পারেন না, তাদের মধ্যে অনেকেই দু নম্বর ঘরে ছাপ মেরেছেন। সুতরাং এই ভুলের ফলে যে ভোট কাটা গেছে তা শ্রী রাজনারায়ণের অংশ থেকেই গেছে, শ্রীমতী গান্ধীর অংশ থেকে নয়।

আমার মনে হয়, 'শতকরা নব্বইজন ভোটারই জানতো যে তাদের এলাকা থেকে শুধুমাত্র দুজন ব্যক্তি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন'—আমার এ মন্তব্যে অনেকেই উলটে আমাকেই প্রশ্ন করবেন যে, আপনিই তো বলেছেন রাজনারায়ণজীর সমর্থকরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিচ থেকে তিন নম্বর ঘরে ছাপ মারবার জন্য ভোটারদের বলেছিলো।'

কথাটা স্বীকার করছি, এবং স্বীকার করে নিয়েই বলছি, শ্রী রাজনায়ায়ণের সমর্থকেরা নমুনা-ব্যালটপত্র নিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে যতোজন ভোটারকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলো তাদের সংখ্যা শতকরা দশ থেকে পনেরো শতাংশের বেশি নয়।

একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। 'ভোটার স্লিপ' বলে যে একটা ব্যাপার আছে, যার গুরুত্ব ভোটারদের বাড়ি থেকে বার করে ভোটদান কেন্দ্র পর্যন্ত যেতে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে খুব কম নয়—নির্বাচনের দিনও আমি দেখেছি সেই ভোটার স্লিপের শতকরা পঁচাত্তরটি লেখা কিংবা বিলি করা—কোনোটাই হয়নি।

আসলে নির্বাচনী সংগঠন কিংবা ইলেকশন মেসিনারী বলতে আমরা যা বুঝি তা রাজনারায়ণজীর একেবারে ছিলো না বললেই চলে। রায়বেরেলী শহরে কেন্দ্রীয় অফিস বলে একটা বস্তু ছিলো বটে, কিন্তু

সেই অফিসের সাথে বিভিন্ন আঞ্চলিক নির্বাচনী কার্যালয়ের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ কিংবা সমন্বয় আছে বলে অন্তত আমি কখনো উপলব্ধি করিনি। কারণ, রায়বেরেলীর নির্বাচনী অফিসে যখনি যেতাম, দেখতাম অফিসের সামনে বারো তেরটি জিপ, মোটর আর স্টেশন ওয়াগান দাঁড়িয়ে রয়েছে। সমগ্র রায়বেরেলী নির্বাচনী এলাকায় রাজনারায়ণজীর জিপ, মোটর ও স্টেশন ওয়াগনের সংখ্যা ছিলো মোট বাইশটি। সুতবাং তার মধ্যে বারো তেরোটি যখন সব সময়েই কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো তখন যে-কোনো অনভিজ্ঞ লোকও অনুমান করে নিতে পারবেন যে সেখানে কি ধরনের কাজ চলছিলো।

একটা নমুনা দেওয়া যাক: হয়তো কোনো আঞ্চলিক অফিসের পোস্টারের দরকার পড়লো। তখন সে কিভাবে পোস্টার পাবে? পদ্ধতিটা ছিলো এই: তাকে সেই পোস্টার সংগ্রহের জন্য বাসে করে একজন লোককে পাঠাতে হলো কুড়ি কিংবা চল্লিশ মাইল দূরের রায়বেরেলী শহরের কেন্দ্রীয় দপ্তরে। দেড় ঘণ্টা কি আড়াই ঘণ্টা বাসে চড়ে সেই লোকটি এসে পৌঁছোলেন নির্দিষ্ট স্থানটিতে। তিনি যোগাযোগ করলেন যিনি কেন্দ্রীয় অফিস পরিচালনা করছেন সেই হিসেবী মানুষটির সঙ্গে। পরিচালক ভদ্রলোকটি আবেদনকারীকে জবাব দিলেন, 'এখন পোস্টার নেই; লক্ষ্ণৌতে লোক গেছে, রাতের দিকে এসে যাবে; কাল সকালে আসুন, পোস্টার নিয়ে যাবেন।'

আবেদনকারী হিসেবী মানুষটির জবাব শুনে চলে গেলেন বাস-আড্ডায়; সেখানে থেকে বাস ধরে গিয়ে পৌঁছোলেন নিজের শহরে। তার শহর থেকে যাত্রা এবং ফিরে আসার মধ্যে আট, দশ কিংবা বারো ঘণ্টা সময় চলে গেলো। কারণ এদিকে বাস সময় মতো চলে, অসময়ে তাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু কাজটা কি হলো?—কিছুই না।

পরদিন সকাল সকাল স্নান খাওয়া সেরে ভদ্রলোক আবার বেরিয়ে পড়লেন রায়বেরেলীর উদ্দেশ্যে। সঙ্গে বড়ো সাইজের থলি নিয়ে নিলেন, কারণ একসাথে অনেক পোস্টার বয়ে আনতে হবে তো। প্রথম বাস ধরে গিয়ে হাজির হলেন রায়বেরেলীর শহবে—তখন ঘড়িতে বেলা

এগারোটা। কেন্দ্রীয় অফিসে পৌঁছে দেখা করলেন সেই হিসেবী মানুষটির সঙ্গে। মানুষটি আচার ব্যবহারে বেশ ভদ্র, হিসেবের ব্যাপারে খুব কড়া, রাজনারায়ণজীর অত্যন্ত গুণমুগ্ধ, কিন্তু একটি ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন—সেটা হলো তাঁর স্মৃতিশক্তি। স্মৃতিকে তিনি মোটেই প্রশ্রয় দেওয়ার পক্ষপতি নন, বরং বিস্মৃতিই তাঁর কাছে আদরণীয়। সুতরাং আজও তিনি সেই লোকটিকেই প্রশ্ন করলেন, 'আপ কাহা সে আ রহে?'

'বরারাবুজুর্গ সে।' উত্তর দিলেন আগন্তুক।

'ইয়ে বরারাবুজুর্গ কাহা হায়?' জানতে চাইলেন বিস্মৃতি-প্রিয় মানুষটি।

আগন্তুক জবাব দিলেন, 'ডালমৌ মে।'

'আচ্ছা।' অফিস-পরিচালক স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তো কহিয়ে, ক্যা সেবা করু?'

অবাক হলেন আগন্তুকটি। বললেন, 'কাল ভি তো ম্যায় আয়া থা আপকে পাস পোস্টার লেনে কে লিয়ে। আপনে কহা থা…'

শিবের বরদানের ভঙ্গিতে হাত তুললেন হিসেবী মানুষটি, আলতো ভাবে গড়িয়ে দিলেন চোখের উন্মুক্ত পাতা দুটো—এবার তিনি ধ্যানমগ্ন। পাঁচ সেকেণ্ড পরে ধ্যানভঙ্গ হলো তাঁর, চোখ খুলে তাকালেন সামনে বসা আগন্তুকের দিকে। তারপর উদাস সুরে ছোট্ট একটা বাক্য উচ্চারণ করলেন, 'পোস্টার তো চলা গয়া।'

'চলা গয়া!' অবাক হলেন আগন্তুক, 'কাহা?'

'বরারাবুজুর্গ মে।'

'বরারাবুজুর্গ মে! ম্যায় তো আব্ ভি বরারাবুজুর্গ সে হি আ রহা হু।' সবিস্ময় জবাব দিলেন আগন্তুক।

'আপকা আনে সে পহেলেই চলা গয়া।' উত্তর দিলেন রাজনারায়ণের অনুগত মানুষটি।

ব্যাপারটা অতি সোজা। আজই সকালে রায়বেরেলীর দক্ষিণ অংশের নির্বাচনী এলাকায় যে গাড়িটি গেছে বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করতে তাতে নিত্য-দিনের মতো পোস্টার, ফেস্টুন, ফ্লাগ, ব্যাজ,

হ্যাণ্ডবিল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অফিস পরিচালকের নির্দেশ হচ্ছেঃ হে আগন্তুক, আপনি বাড়ি ফিরে যান ; সময় মতো আপনার এলাকার নির্বাচনী অফিসে পোস্টার পৌঁছে যাবে। সুতরাং পোস্টার বিনাই আগন্তুক তার শহরে যাওয়ার বাসে চড়ে বসলেন।

নিজের এলাকায় যখন ফিরে এলেন ভদ্রলোক তখন সময় বিকেল পাঁচটা। বাসে বসে ভাবছিলেন, ভালোই হলো, সাথে করে আর একগাদা পোস্টার বয়ে আনতে হলো না—গাড়িতে করেই পৌঁছে গেলো সামগ্রী।

কিন্তু অবাক হলেন স্বস্থানে ফিরে এসে। অফিসের সামনে দেখলেন বেশ বড়ো জটলা—পরিচিত লোকজনেরা সব পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। তাকে দেখতে পেয়ে জটলার মধ্য থেকে কয়েকজন এগিয়ে এলো। বললো, 'কৈ, পোস্টার কৈ ?'

যেন আকাশ থেকে পড়লেন ভদ্রলোক। বললেন, 'কেন, পোস্টার আসেনি এখনো ?'

'কৈ, না তো।'

'কিন্তু অফিস পরিচালক যে বললেন গাড়ি করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

ভদ্রলোকের কথায় দু-একজন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। একজন তো বলেই বসলো, 'রায়বেরেলীতে গিয়েছিলে, নাকি হাটে গিয়ে বাসভাড়ার পয়সায় নাস্তা করে এলে ?'

সহকর্মীর কথায় চমকে উঠলেন ভদ্রলোক। রাগে কাঁপতে কাঁপতে পকেট থেকে বাসের টিকিট বের করে দেখালেন। তিনি যে অন্য সবার মতো 'চোর' নন সে কথাটাও বার বার বলতে লাগলেন। এবং এ ও আশ্বাস দিলেন, 'হয়তো অন্য কোথাও গাড়ি কাজে আটকে গেছে, তবে পোস্টার আজ আসবেই।'

এভাবেই এক এক মিনিট করে সময় অবিবাহিত হতে লাগলো। ঘড়ির কাঁটা ছটা, সাতটা, আটটা পার হয়ে নয়ের ঘর ছুঁলো—কিন্তু গাড়ি নিয়ে কেউ এলো না। তখন যে-যার ঘরে ফিরে যেতে শুরু করলো,

এবং একসময় সবার ফেরাও শেষ হয়ে গেলো।

তার পরদিন আর স্নান খাওয়া নয়, ঘুম থেকে উঠেই মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়লেন ভদ্রলোক বাস ধরতে। প্রথম বাস ধরে সকাল আটটার মধ্যে এসে হাজির হলেন রায়বেরেলীর কেন্দ্রীয় অফিসে, সাক্ষাৎ করলেন বিস্মৃতি-প্রিয় ভদ্রলোকটির সঙ্গে। প্রশ্ন করলেন, 'এ রসিকতার অর্থ কি ?'

হাতের ইশারায় হিসেবী মানুষটি বসতে বললেন আগন্তুককে। তারপর অতি-বিনীত নম্র ভাষায় বুঝিয়ে বললেন আসল ঘটনাটা। বললেন, 'কাল গাড়িটা উঁচাহার পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিলো, তারপর সেটাকে সারিয়ে চালু করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তখন আর বরারাবুজুর্গের দিকে না গিয়ে গাড়িটা সোজা রায়বেরেলীতেই ফিরে আসে। তাই আপনারা পোস্টার পাননি। ঠিক আছে, এখন যা দরকার নিয়ে যান।'

এই ছিলো রাজনারায়ণজীর কেন্দ্রীয় নির্বাচনী দপ্তরের অবস্থা। যে কাজটা একবারে হওয়া দরকার সেটা হতো সাতবারে, যেটা একদিনে হতে পারতো সেটা হতো সাত দিনে।

অথচ একেবারে বিপরীত অবস্থা ছিলো কংগ্রেস নির্বাচনী অফিসে। নিউ মার্কেটের পাশে তাদের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী অফিসেও কখনো একসাথে পাঁচ সাতটার বেশি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিনি ; আর গত নির্বাচনে রাজনারায়জীর কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কার্যালয় যে বাড়িটাতে ছিলো, এবং জরুরী অবস্থায় কংগ্রেসীরা যেটাকে জোর করে দখল করেছে সেই তিলক ভবনের সামনেও কখনো একটা গাড়ি অলস দাঁড়িয়ে আছে চোখে পড়েনি। অথচ কংগ্রেসের কাছে জনতা পার্টির গাড়ির তুলনায় অন্তত দশগুণ গাড়ি ছিলো।

এই ছোট্ট তুলনাটুকু করতে হলো কেবলমাত্র আমার এই মন্তব্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে, রাজনারায়ণজীর সমর্থকেরা সত্যি সত্যিই রায়বেরেলীর ভোটারদের গরিষ্ঠ অংশের কাছেই পৌঁছোতে পারেননি। এবং তার কারণ ছিলো রসদ, সংগঠন ও পরিচালনার অভাব।

কংগ্রেসী তরফে এ তিনটের কোনোটারই কোনো অভাব ছিলো না। রসদের যেমন ঢালাও ব্যবস্থা ছিলো, সংগঠন ও পরিচালকের তৎপরতাও ছিলো তেমনি বেশি। তারা তাদের কর্মীদের কোনো কিছুর অভাব বুঝতে দেননি, এমনকি সংগঠনের ওপরের স্তরে যশপাল কাপুর এবং জগপৎ দুবের মধ্যে যে মন কষাকষি চলছিলো সেটাও কখনোই অন্য কোনো কর্মীর ওপর ছায়া ফেলতে পারেনি। তাছাড়া কংগ্রেসের সব থেকে বড়ো ভরসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোড়লরা, যারা চিরকাল ভোটের আগের দিন এসে কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে 'সিলভার টনিক' নিয়ে যেতো তারাও এবার তাদের ডিউটি ঠিক মতোই করেছিলো। এছাড়াও কম্বল, ধুতি, সাড়ি, গেঞ্জি এসব তো ছিলোই, তার ওপর অতিরিক্ত হিসেবে সংযোজিত হয়েছিলো হিণ্ডোলিয়ামের টিফিন ক্যারিয়ার এবং ইন্দিরা গান্ধীর বহুবর্ণরঞ্জিত ছবিসহ মোদির চারপাতার ক্যালেণ্ডার। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে, সব নির্বাচনেই কংগ্রেসের তরফে যা যা থাকে, একাত্তরেও রায়বেরেলীতে যা যা ছিলো, এবারও তার সবকিছুই ছিলো—এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ইন্দিরাজী তাঁর নির্বাচনী পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। আর সেই পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করেই জগপৎ দুবে এবং যশপাল কাপুর প্রতিদিন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের বলছিলেন, 'এবার আমরা কম সে কম দু লাখ ভোটে জিতবোই। এমনকি আশা করছি, হয়তো রাজনারায়ণের জামানতই বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।'

সত্যি বলতে কি, সেদিন, সেই অবস্থায় মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে অনেকেই ঘাবড়ে গিয়েছিলো। অবশ্য জানি, আজ তাদের মধ্যে কেউ-সে কথা আর স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু আমার লজ্জা নেই, আমি স্বীকার করছি, পনেরো তারিখ রাত পর্যন্ত আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম রাজনারায়ণজী কিছুতেই নির্বাচনে জিততে পারবেন না। চোদ্দ তারিখ রায়বেরেলী থেকে কোলকাতায় চিঠিও লিখেছিলাম, 'আমি নিশ্চিত, এ নির্বাচনে রাজনারায়ণজী কিছুতেই জিততে পারবেন না, কারণ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে জেতার জন্য যে ধরনের সংগঠন থাকা দরকার জনতা পার্টির তা মোটেই নেই।' কথাটা রাজনারায়ণজীর কাছ থেকেও

লুকিয়ে রাখিনি। তিনি যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি বুঝছো?' তখন স্পষ্টই বলেছিলাম, 'যেভাবে কাজ চলছে, তাতে আমার মনে হয় না যে জেতা যাবে।' কথাটা শুনে হয়তো তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু সেদিন, সেই চূড়ান্ত মুহূর্তে তাঁকে একটা মিথ্যা আশ্বাসবাণী শোনাতে কেন যেন আমার মন কিছুতেই রাজি হয়নি। যদিও দেখেছি, আশে-পাশে অনেকেই, যারা আমাকে খোলাখুলিই বলেছিলেন যে রাজ-নারায়ণজীর জেতার আশা এক আনাও নেই, তারাই আবার তাঁর সামনে তোষামুদে ভৃত্যের মতো কৃত্রিম হাসি হেসে বলেছেন, 'আপকা জিত তো নিশ্চিত্ হ্যায়। কমসে কম একলাখ ভোট সে আপ জিতেঙ্গে।' সেই মুহূর্তে মনে মনে প্রার্থনা করেছি যেন তাই হয়, কিন্তু আন্তরিকভাবে সে-কথা বিশ্বাস করতে পারিনি।

আমি যা বিশ্বাস করতে পারিনি রাজনারায়ণজী নিজেও কি তা বিশ্বাস করেছিলেন? ডাকবাংলোয় পাশাপাশি খাটে শুয়ে সারারাত ধরে এই অক্লান্ত সৈনিকটিকে যেভাবে এপাশ-ওপাশ ছটফট করতে দেখেছি, যেভাবে তিনি বারবার তাঁর অভ্যাসমাফিক গলা-খাঁকারি দিয়ে উঠেছিলেন তাতে আজো আমি জোর গলায় বলতে পারি, তিনি নিজেও সেই মুহূর্তে নিজের জয় সম্পর্কে মনে মনে আমারই মতো সংশয়ী ছিলেন।

সত্যি বলতে কি মাঝে মাঝেই রাজনারায়ণজীর কথাবার্তায় একটা হতাশার সুর ফুটে উঠছিলো। প্রায়ই তিনি আমাদের দোষারোপ করতেন, 'তোমাদের জন্যই দেখছি আমাকে একটা জেতা লড়াই হেরে যেতে হবে।'

কথাটা ঠিকই। কারণ রায়বেরেলীর যেখানেই গেছি সেখানেই দেখেছি জনতার মধ্যে বিপুল উৎসাহ। যাকেই জিজ্ঞাসা করেছি সে-ই বলেছে 'হলধর' অর্থাৎ 'জনতা পার্টি'ই জিতবে।

এক্ষেত্রে পাঠকের হয়তো জানার আগ্রহ হবে, যখন জনতাই বলছিলো যে জনতা পার্টিই জিতবে তখন আমরা কেন তার বিপরীত কথা বলছিলাম?

প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক, খুবই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং এর উত্তরও

যথেষ্ট স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে স্বর্গীয় সোস্যালিষ্ট নেতা ডক্টর রামমনোহর লোহিয়ার একটি বক্তব্যর কিছুটা উদ্ধৃতি প্রয়োজন বোধ করছি। ডক্টর লোহিয়া ভারতবর্ষের বিগত কয়েকটি লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'বাহান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে দেখেছি, বিরোধী দলের মিটিংগুলোতে যে ভিড় হতো তার তুলনায় কংগ্রেসের মিটিংয়ের ভিড় ছিলো নিতান্তই নগন্য। তখন আশা করা হয়েছিলো, বিরোধী দল, বিশেষতঃ সোস্যালিষ্টরা লোকসভায় বিপুল সংখ্যক সদস্য নিয়ে প্রবেশ করবে; কারণ তখন গ্রামে গঞ্জে সব জায়গাতেই লোক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বলতো, এবং তারা আমাদেরকে সমর্থন করতো। কিন্তু নির্বাচন শেষে দেখা গেলো, কংগ্রেস নয়, বিরোধীরাই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যেতে বসেছে।'

এবারও আমাদের মনে সেই আশঙ্কাই ছিলো। বিশেষতঃ রায়বেরেলী নির্বাচনক্ষেত্রে সবজায়গাতেই দেখেছি জনতার মধ্যে একটা অতি উৎসাহের ভাব। তাই, অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে বারবার মনে হয়েছে, এই অতি উৎসাহীতা শেষ অব্দি হয়তো ব্যালটবাক্স পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। কারণ, উৎসাহী জনতাকে ব্যালট বাক্সের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সংগঠন থাকা প্রয়োজন তার কোনো হদিসই আমি কোথাও দেখতে পাইনি। তাই রাজনারায়ণজী মনে কষ্ট পাবেন জেনেও প্রতিবার তাঁকে সত্যি কথাটাই বলেছি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হলো ভোটগ্রহণ পর্ব—ষোলই মার্চ উনিশ শো সাতাত্তর।

সকাল সাতটার সময় রায়বেরেলী থেকে যাত্রা শুরু করলাম উত্তর মুখে। উদ্দেশ্য: উত্তরের নির্বাচনী এলাকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং যেখানে প্রয়োজন সহযোগিতা দান।

প্রথমে গেলাম দেবানন্দপুর, হরদাসপুর হয়ে মহারাজগঞ্জ। পথে যতোগুলো ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পড়লো তার সব কটাতে থামলাম এবং স্থানীয় কর্মীদের জিজ্ঞাসা করার আগেই উত্তর পেলাম, 'সব ঠিক আছে, আমরা

পঁচাশি শতাংশ ভোট পাচ্ছি।'

মহারাজগঞ্জ থেকে ডানদিকে বেঁকে গেছে সেমোরোতা যাবার রাস্তা; বেলা নটা নাগাদ সে পথে এগোনো শুরু করলাম। পথে প্রতিটি কেন্দ্রে থেমে যখন জানতে চাইলাম, 'অবস্থা কি?' সোৎসাহী জবাব পেলাম, 'সব ঠিক আছে, চিন্তার কোনো কারণ নেই, কম করেও এক লাখ ভোটে জিতবো।'

জবাব শুনে বিরক্ত হলাম, কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। ইচ্ছে হলো এদের বলি, তোমরা তো রয়েছো এই গাঁয়ের চৌহদ্দিতে, খুব বেশি হলেও এখানে ভোটার সংখ্যা দু হাজার—তা তোমরা কি করে বাপু বেশ হিসেব কষে ফেললে যে এক এক নয়, দুই নয়, একেবারে একলাখ ভোটে জিতে যাচ্ছো?'

সেমরোতো থেকে আবার ফিরে এলাম মহারাজগঞ্জ, সেখান থেকে এগোলাম রাঁবাঁর দিকে। পথে পড়লো কুওলা, পুরাসী, সমসপুর ইল্লোর আর মঝগাঁওয়া। যেখানে গেলাম সেখানেই শুনলাম জনতা পার্টি আশি শতাংশ ভোট পাচ্ছে। অতি-উৎসাহীদের নাচানাচি দেখে বিরক্ত হতে বাধ্য হলাম। একজনকে প্রশ্ন করলাম, 'এমন একটা কেন্দ্রের খবর বলুন যেখানে আমরা পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভোট পাচ্ছি না।'

ভদ্রলোক হেসে জবাব দিলেন, 'এ্যয়সা কোই গাও আপকা রায়বেরোলী ছেত্র মে নেহী মিলেগী।'

আমিও হাসলাম, তবে কৃত্রিম হাসি। ড্রাইভারকে বললাম, 'চলো, বাঁছরাওয়ার দিকে যাওয়া যাক।' গাড়ি ছুটলো বাঁছরাওয়ার পথে।

গাড়িতে ছিলেন রায়বেরেলী কোর্টের একজন উকিল শ্রী হরিহর সিং, অল ইণ্ডিয়া কোলিয়ারী মজদুর কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক বিনয় মিশ্র, ভারতীয় নবযুবক দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী উমেশ বাজপেয়ী এবং জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরের পক্ষ থেকে শ্রী চন্দ্রশেখর।

গাড়িতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চললো। চন্দ্রশেখরজী বললেন, 'উত্তর ভারতের যেখানেই যাচ্ছি, সবার মুখে এক কথা, আমরা

আশি পার্সেন্ট ভোট পাবোই।' তারপর রসিকতা করে বললেন, 'বাবা, আশি শতাংশের দরকার নেই, দয়া করে প্রদত্ত ভোটের একান্ন শতাংশ দাও, তাহলেই তোমাদের জীবনভর মাথায় করে রাখবো।'

বিনয়জীও চন্দ্রশেখরজীকেই সমর্থন করলেন। বললেন, 'আশি শতাংশের ভার এতো বেশি হবে যে শেষে তাকে সামাল দেওয়াই হবে মুশকিল।'

হরিহর সিং বললেন, 'যদি আমরা সব কেন্দ্রেই আশি শতাংশ ভোট পাই তবে তো রাজনারায়ণজী ইন্দিরাজীর জামানত জব্দ করে ছেড়ে দেবেন।'

বিনয় মিশ্র বললেন, 'সেক্ষেত্রে এক লাখের ভবিষ্যতবাণীটা মোটেই খাপ খাবে না, ওটাকে আড়াই লাখ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে।

চন্দ্রশেখরজী বললেন, 'আমাদের আর নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই, জগপৎ দুবে ওটা অনেক আগেই রিজার্ভ করে রেখেছেন।'

পাঠক, সেদিনকার কথোপকথনের কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিলাম শুধু এই কারণে যে এ থেকেই আপনারা অনুমান করে নিতে পারবেন, রাজনারায়ণজীর নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মানসিক অবস্থা কোন পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো।

আসলে এর একমাত্র কারণ ছিলো দপ্তর পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুতর অসঙ্গতি এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। আর সে কারণেই রাজনারায়ণজী আক্ষেপের সুরে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'আপ লোগো নে জিতা হুয়া চুনাও হার জায়েঙ্গে।'

কিন্তু সত্যিই কি আমরা হারছি?

না, হারছি না। অন্তত বেলা বারোটার সময় আমার সে কথাই মনে হলো। মনে হলো, আমরা জিতছি, এবং কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার ভোটে।

জানতে চাইছেন, কেন হঠাৎ এই মত-পরিবর্তন?

বলছি।

খুবই ছোট্ট একটা ঘটনা। বেলা বারোটা নাগাদ আমাদের গাড়ি গিয়ে পৌঁছোলো বাঁছরাওয়া শহরে। শহর বলাটা বোধ হয় অন্যায় হলো, সঠিক বলতে গেলে বল্‌তে হয় 'মহল্লা।' সারাটা এলাকার লোক সংখ্যা হাতে গুনেই বলা যেতে পারে।

সেই 'মহল্লা' কিংবা শহর—যাই বলুন, সেখানে ভোট গ্রহণ চলেছে একটা স্কুল বাড়িতে। আমরা দূর থেকেই দেখতে পেলাম ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশ পথে প্রচুর লোক জমায়েত হয়ে উত্তেজিতভাবে হাত নাড়ছে, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বলতে চাইছে।

আমরা কাছে যেতেই ভিড়ের মধ্য থেকে একদল লোক এগিয়ে এসে অভিযোগ জানালো, একজন কংগ্রেসী শহর-প্রধান সকাল থেকে ভোটারদের সঙ্গে নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে যাচ্ছে-আসছে, কিন্তু যেহেতু সে এ-এলাকায় খুব প্রভাবশালী সেহেতু পুলিশ তাকে কিছু বলছে না।

অভিযোগ শুনে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে—মোলাকাত হলো সেই প্রভাবশালী লোকটির সঙ্গে। তারপর শুরু হলো বচসা, বচসা থেকে গালিবর্ষণ, এবং গালিবর্ষণ থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়ালো অর্দ্ধচন্দ্রপ্রদানে। যিনি বলেছিলেন কেউ তাকে ভেতরে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না, তিনিই শেষ পর্যন্ত নতমস্তকে ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন রঙ্গমঞ্চ থেকে।

ছোট্ট নাটকীয় মুহূর্তের কর্তব্যটুকু সম্পাদন করে আমরা পাঁচজন ফিরে এলাম অপেক্ষমান গাড়িতে। গাড়ি চলতে শুরু করলো। ভিতরে আমরা ছজন প্রাণী, কিন্তু কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। প্রত্যেকেই আত্মমগ্ন, প্রত্যেকেই ধ্যানস্থ।

মিনিট দশেক কেটে গেলো এভাবে। তারপর আমিই প্রথম মুখ খুললাম, 'ভাইসাব, হাম লোগ জিত রহে হ্যায়।'

বিনয়জী জবাব দিলেন, 'সায়েদ···'

চন্দ্রশেখরজী বললেন, 'এ্যয়সাই পতা লাগ রহা···'

সকাল থেকে আমরা যেখানে যেখানে গেছি, সেখানেই শুনেছি

আশি পার্সেন্ট ভোট পাচ্ছি। তখন মনে হয়েছে আমাদের সমর্থকরা যেমন আমাদের গাড়ি দেখলেই দৌড়ে এসে বলছে 'আশি পার্সেন্ট' তেমনি কংগ্রেসের সমর্থকরাও নিশ্চয় কংগ্রেসের গাড়ি দেখতে পেলেই দৌড়ে গিয়ে বলছে 'আশি পার্সেন্ট।' কিন্তু বাঁছরাওয়ার ঘটনায় আমাদের সব হিসেবনিকেশ যেন উলটে যেতে বসলো। আমরা একজন কংগ্রেসী মাতব্বরকে পনেরো মিনিট ধরে যাচ্ছেতাইভাবে হেনস্তা করলাম, তাকে বাধ্য করলাম ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের চৌহদ্দি থেকে বাইরে চলে যেতে, শত শত লোক তাকে টিটকারি মারলো, কিন্তু কৈ, একজন কংগ্রেসীও তো তাকে এলো না রক্ষা করতে? ইন্দিরা গান্ধীর নিজের নির্বাচনী এলাকায় এমন বিচিত্র ঘটনা ঘটলো কি করে? তাহলে কি জনতা যা বলছে সেটাই ঠিক? সত্যি কি কংগ্রেস কুড়ি পার্সেন্টে গিয়ে দাঁড়িয়েছে? আমরা কি তাহলে সত্যিই আশি?

এরপর যার সাথেই দেখা হলো, জনতার মতো আমরাও তাকে বলতে লাগলাম, 'আমরা জিতছি, এবং কম করে পঞ্চাশ হাজার ভোটে।'

সতেরো, আঠারো, উনিশ— রুদ্ধ নিঃশ্বাস বুকে নিয়ে তিনটে দিন কাটিয়ে দিলাম। অবশেষে এলো সেই প্রতীক্ষিত দিন—বিশে মার্চ।

রায়বেরেলীর আদালত প্রাঙ্গণে বিরাট সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। তার নিচে পাতা হয়েছে চোদ্দটি টেবিল। প্রতিটি টেবিলের চারদিকে সাজানো হয়েছে চারটি করে চেয়ার। সমগ্র আদালত এলাকাকে ঘিরে রেখেছে পুলিশ বাহিনী। বাইরে উৎসুক জনতা।

সকাল আটটা বাজার সাথে সাথে ব্যালট বাক্স খোলা শুরু হলো। একটা ড্রামের ভেতর রেখে বেশ কয়েকটি ব্যালট বাক্সের ব্যালট-পত্র যেভাবে মিশিয়ে ফেলা হয় সেভাবে মেশানো শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সেগুলোকে এক একটা টেবিলের ওপর জড়ো করা হতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে গণনা কর্মীর দল সেগুলোকে আলাদা আলাদা করে নটি বিভিন্ন খোপে ফেলা শুরু করে দিলেন।

রাজনারায়ণজী বেশ কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে হাজির হলেন গণনা কেন্দ্রে। তাঁকে দেখেই বাইরে জনতা ধ্বনি দেওয়া শুরু করে দিলো, 'জিতেগা ভাই জিতেগা, রাজনারায়ণ জিতেগা।' সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সমর্থকদের তরফ থেকে আওয়াজ উঠলো, 'হারা থা ঔর হারেগা, রাজনারায়ণ পস্তায়েগা।'

ধ্বনি প্রতিধ্বনির মধ্যেই মুখে স্বভাবসুলভ হাসি নিয়ে রাজনারায়ণজী এগিয়ে এলেন সামিয়ানার দিকে, তাঁকে দেখে মৃদু হেসে অভিবাদন জানালেন রিটার্নিং অফিসার বিনোদ মালহোত্রা।

রাজনারায়ণজীর মুখ্য নির্বাচনী এজেণ্ট মানভাই এগিয়ে এলেন তাঁর দিকে। রাজনারায়ণজী কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই মানভাই বললেন, 'সব ঠিকঠাক চলেছে, কিছু চিন্তা করার নেই।'

কথাটা শুনে রাজনারায়ণজীর মুখটা যেন আর একটু প্রসন্ন হলো। তিনি তাঁর প্রধান নির্বাচন সঞ্চালক রামশরণ দাশের দিকে ফিরে বললেন, 'বাক্স খোলার আগে সিলগুলো ঠিক মতো আছে কিনা দেখা হচ্ছে তো?'

রামশরণ দাশজী বেনারসী টানে বললেন, 'হা নেতাজী, ম্যায়নে হর বাক্সা পর কড়ী নজর রখ্খা।'

রাজনারায়ণজী রামশরণজীর উত্তরে প্রসন্ন হয়ে হাতের এলুমিনিয়ামের লাঠিটা মাটিতে ঠুকে শরীরটাকে ডানদিকে সামান্য কাত করে সামনের দিকে পা বাড়ালেন।

কংগ্রেস পক্ষের যাঁরা মুখ্য সঞ্চালক তাঁরাও সকলেই সময় মতো এসে গিয়েছেন। মুখ্য নির্বাচনী এজেণ্ট শ্রী মাখনলাল ফোতেদার তো কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতেই পারছেন না: সবসময়েই তিনি এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছেন। সত্যিই তো, আজকের যতো কিছু দায় দায়িত্ব সে তো একা তাঁর-ই।

ইন্দিরাজীর তরফে আরো তুজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হাজির রয়েছেন। তাঁরা হচ্ছেন শ্রী যশপাল কাপুর এবং শ্রী জগপৎ সিং তুবে। শ্রী তুবে এবং শ্রী কাপুর তুজনেই নিজেকে 'প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য নির্বাচনী সঞ্চালক' বলে

দাবি করে আসছেন অনেকদিন ধরে ; এবং নির্বাচনী কাজ শুরু হওয়ার দিন থেকেই ভুজনে ভুটো আলাদা অফিস খুলে বসেছেন। এর যে কি কারণ তা আমার কাছে কখনোই বোধগম্য হয়নি। তবে লোকের মুখে শুনেছি, সঞ্জয় গান্ধী যশপাল কাপুরকে তেমন বিশ্বাস করতে পারেননি বলেই এবার জগপৎ ভুবেকে দিয়ে আর একটা অফিস খুলিয়ে দিয়েছেন, এবং যশপাল কাপুরও সর্বসমক্ষে তাঁকে সঞ্জয়জী যেভাবে অপদস্থ করেছিলেন সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না বলেই 'মহেন্দ্র অ্যাণ্ড মহেন্দ্র' থেকে পাওয়া নতুন জিপগাড়িগুলোকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শুধু ঘুরে বেড়াবারই নির্দেশ দিয়েছেন, কোথাও থামাবার হুকুম দেননি। ফলে বাইরে থেকে জিপ গাড়ির ছোটাছুটি এবং মানুষজনের কর্মব্যস্ততা যতো দেখা গেছে আসলে নাকি ভেতরে ভেতরে তেমন কাজ হয়নি।

যাইহোক, টেবিলে টেবিলে গণনার কাজ বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। রাজনারায়ণজী তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে একবার ভেতরে যাচ্ছেন, আবার কিছুক্ষণ পরেই ঘুরতে ঘুরতে চলে আসছেন বাইরে, যেখানে জনতা গভীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে। রাজনারায়ণজী বাইরে আসতেই বিপুল জনতা তাঁকে ঘিরে ফেলছে, শ্লোগান দিচ্ছে; প্রত্যুত্তরে তিনিও হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন, হাসছেন। ভিড়ের মাঝখান থেকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন আসছে, 'ফলাফল কি?' রাজনারায়ণজী সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভ জবাব দিচ্ছেন, 'বহুত আচ্ছা।'

যদিও মুখে বলছেন বহুত আচ্ছা, কিন্তু অন্তরে কি তিনি সে কথা বিশ্বাস করছেন? শত আশা সত্ত্বেও কি তাঁর বুক মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে না কোনো অশুভ অঘটনের আশঙ্কায়? না হলে তিনি কেন তাঁর সঙ্গীসাথীদের মাঝে মাঝেই জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'ক্যায়া, জিতেগা না?'

ভুটো নাগাদ আশঙ্কা ক্রমে আশায় রূপান্তরিত হওয়া শুরু হলো। সকাল থেকে যতোগুলো বাক্সের ব্যালট গোনা হয়েছে, এবং যতোগুলো টেবিলে গণনা চলেছে তার কোনোটাতেই ইন্দিরাজী

রাজনারায়ণজীকে অতিক্রম করতে পারেননি। ক্রমাগত ভোটের ব্যবধান বেড়ে চলেছে। ইন্দিরাজী কোথাও ১৫১৮টি ভোট পাচ্ছেন তো রাজনারায়ণ পাচ্ছেন ১৬৯০টি, আবার রাজনারায়ণ যেখানে ১৮০২টি পাচ্ছেন, সেখানে ইন্দিরাজীর ভাগ্যে জুটছে ১১৮৭টি।

সকাল থেকে ইন্দিরাজীর সমর্থকদের মধ্যেই উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছিলো বেশি। তারা কোনো জনতা-সমর্থককে কিছু বলতে দেখলেই তাকে টিটকারি মেরে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু দুটোর পর অবস্থা গেলো পালটে। এবার জনতা সমর্থকদের টিটকারি দেবার পালা এলো।

জগপ্রৎ দুবে এবং যশপাল কাপুর সকাল থেকে যেরকম খোস-মেজাজে ঘোরাফেরা করছিলেন, মাখনলাল ফোতেদারকে যেরকম খুশি খুশি দেখাচ্ছিল এবং যার-ই সাথে দেখা হচ্ছিল তাকেই তিনি যেভাবে গদ্‌গদ কণ্ঠে 'দুটো জায়গাতেই জিতছি, বলে রোমাঞ্চ অনুভব করছিলেন সেটা যেন ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে যাওয়া শুরু হলো। বরং পরিবর্তে প্রত্যেকের মুখের ওপর একটা দুশ্চিন্তার ছায়া নেমে এলো। তিনজনেই ঘন ঘন ঘাম মোছা শুরু করলেন, ফিস্‌ফাস্ কথাবার্তা শুরু হলো এবং শুরু হলো একটার পর একটা ট্রাঙ্ক বুকিং। ফোতেদার বেশ উত্তেজিতভাবে হাত-মুখ নেড়ে নির্বাচনা অফিসার এবং মাঝে মাঝে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের কী যেন বলতে লাগলেন।

এদিকে রাজনারায়ণজীরও তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট মানভাইয়ের সাথে বারবার কথা বলতে লাগলেন, দু একবার তাঁর কথা হলো প্রধান রিটার্নিং অফিসার বিনোদ মালহোত্রার সঙ্গেও। ওদিকে বাইরে উত্তেজনা বাড়া শুরু হয়েছে, ভিড় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। জনতা অস্থিরভাবে একটা জটলা থেকে আর একটা জটলায় যাচ্ছে। প্রত্যেকেই বেশ উত্তেজিত।

এভাবেই কেটে গেলো তিন ঘণ্টা। ইন্দিরাজীও ইতিমধ্যে প্রায় বিশ হাজার ভোটে পিছিয়ে গেছেন। আদালত প্রাঙ্গণের ভিড় সকাল বেলা ভোট গণনা শুরু হওয়ার সময় যা ছিলো তার প্রায় দশগুণে পরিণত হয়েছে। সেই অনুপাতে পুলিশের সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও আনুপাতিক

হারে মোটেই বাড়েনি।

তিনটের সময় মাইকে ঘোষণা শুরু হলো ঃ 'আপনারা আদালত প্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে যান। বাইরেও কেউ দাঁড়াবেন না। আদালত সীমানার ছুশো মিটার এলাকার মধ্যে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয়েছে।'

ঘোষণা শুরুর সাথে সাথেই পুলিশের কাজ শুরু হয়ে গেলো। তারা জনতাকে পিছিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলো। জনতাও পুলিশের নির্দেশে আস্তে আস্তে পেছোনো আরম্ভ করলো। মিনিট পনেরোর মধ্যে ভিড় নির্দিষ্ট সীমানাব বাইরে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

কিছুক্ষণ আগেও জনতার মধ্যে যে চাঞ্চল্য ছিলো তা যেন পুলিশী ঘোষণার সাথে সাথেই আতঙ্কে পরিণত হয়ে গেলো। প্রতিটি মানুষ যেন রূপান্তরিত হয়ে গেলো এক একটি ভয়ের প্রতিমূর্তিতে। কেউ আর জোবে কথা বলছে না, কেউ শ্লোগান দিচ্ছে না, কেউ উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছে না। প্রত্যেকে যেন নিজের মনের সাথে গোপন পরামর্শ করছে; বাইরে শুধু একটা ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ কী হলো, যেন ভুঁই ফুঁড়ে একদল সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ানের আবির্ভাব ঘটলো। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে স্টেনগান, চোখে সতর্ক দৃষ্টি। সারি বেঁধে তারা দাঁড়িয়ে গেলো যেখানে ভোট গোণা হচ্ছে সেই সামিয়ানা ঘিরে।

বাইরে যতোই উত্তেজনা থাক ভেতরে বসে যারা ভোট গুণছেন তারা কিন্তু মোটেই উত্তেজিত নন। অন্তত তাদেরকে বাইরে থেকে তেমন মনে হচ্ছে না। মাঝে মাঝে রাজনারায়ণজীর মাথার সবজে রুমালটা নজরে আসছে। তিনি মানভাই এবং রামশরণ দাশের সঙ্গে কিছু একটা আলোচনা করছেন, তারপরই হয়তো আবার কথা বলছেন রিটার্ণিং অফিসার মালহোত্রার সঙ্গে।

ওদিকে ফোতেদারকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন উত্তেজনায় পাগলা হয়ে গেছেন। কিছুতেই এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না, সবসময় এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছেন। সকালে যিনি মৌজে

সিগারেট টানছিলেন 'মাতাজী এবং বেটাজী' জিতছেন এই খোয়াবে মশগুল থেকে, এখন সেই লোকটিই উত্তেজনায় এতো বেশি ছটফট করছেন যে তাঁর মতো একজন চেইন-স্মোকারের ছ তিন ঘণ্টার মধ্যে একবার একটা সিগারেট ধরাবার কথা মনেও হয়নি।

সন্ধ্যা ছটা নাগাদ অবস্থা যা দাঁড়ালো তাতে সকলেই নিশ্চিত হয়ে গেলো যে ইন্দিরাজী হারছেনই; ওদিকে আমেথী থেকেও খবর এসে গেছে সঞ্জয় হেরে গেছেন—শুধু ফলাফল ঘোষণাই যা বাকি। এদিকে রায়বেরেলী আদালত প্রাঙ্গণে আমেথীর যে দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা চলেছে সেখানেও তিনি রবীন্দ্র প্রতাপের থেকে পঁচিশ হাজার ভোটে পিছিয়ে পড়েছেন।

সাংবাদিকরাও আর ধৈর্য ধরতে পারছেন না, প্রত্যেকেই উত্তেজিত ভাবে প্রশ্ন করছেন, 'এখন পযন্ত যতোটা গোণা হয়েছে সরকারীভাবে সেটুকুরই বা খবর ঘোষণা করা হচ্ছে না কেন?'

জবাবে অতি নম্রভাবে রিটার্ণিং অফিসার মালহোত্রা প্রত্যেককেই বলতে লাগলেন, 'একটু অপেক্ষা করুন, ওপর থেকে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এখন ফলাফল ঘোষণা না করার জন্য।'

একজন বিদেশী সাংবাদিক বললেন, 'আর ঘণ্টা তিনেক পরেই আমার দেশে সকাল হয়ে যাবে। সুতরাং আপনিই বলুন, কতোক্ষণ আর অপেক্ষা করবো? সকালবেলা কাগজে যদি লোকে ইন্দিরা গান্ধীর খবর না পায়, তাহলে কি তারা আমাদেরকে ছেড়ে দেবে?'

মালহোত্রা বিনীতভাবে বললেন, 'কী করবো বলুন, ওপর মহলের হুকুম।'

এমন সময় রাজনারায়ণজী ঢুকলেন মালহোত্রাজীর ঘরে। বেশ উত্তেজিতভাবেই বললেন, 'প্রথম দফার ভোট তো গোণা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তবু এখনো তার ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে না কেন?'

মালহোত্রা আবার সেই বিনীত স্বরেই বললেন, 'আমাকে কিছুক্ষণ দেরি করতে বলা হয়েছে।'

মালহোত্রার জবাব শুনে রাজনারায়ণজী রেগে গেলেন। বললেন,

'ইন্দিরাজী হারছেন তাই দেরি করতে বলা হচ্ছে. যদি তিনি জিততেন তাহলে গোণা শেষ না হতেই জেতার খবর ঘোষণা শুরু হয়ে যেতো। আমি কোনো অজুহাত শুনতে চাই না, আপনি এখনি ফলাফল ঘোষণা শুরু করুন।'

রিটার্ণিং অফিসার বিনীত ভঙ্গীতে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রাজনারায়ণজীর গলার ধমকে তাঁকে থেমে যেতে হলো। রাজনারায়ণজী বললেন, 'সব ব্যাপারেই দেখছি একই চাল। খেলা শুরুর আগে এক নিয়ম, খেলা শেষ হলে অন্য নিয়ম। এ চলতে পারে না। আমাকে ফল ঘোষণা করতেই হবে।'

বিব্রত মালহোত্রাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন নির্বাচন কমিশনের তরফে পর্যবেক্ষক পি. বি. দত্ত। তিনি বললেন, 'দেখুন মালহোত্রাজী. নির্বাচনী নিয়ম হলো. একটা বুথে গণনা শেষ হলে সাথে সাথেই ফলাফল ঘোষণা করতে হবে।''

শ্রী দত্তের কথায় মালহোত্রাজী যেন মনে মনে বেশ ভরসা পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহকারী রিটার্ণিং অফিসারকে নির্দেশ দিলেন, 'ফলাফল ঘোষণা করুন।'

মালহোত্রাজীর নির্দেশ পেয়ে একজন সহকারী রিটার্ণিং অফিসার মাইকের সামনে গিয়ে ফলাফল ঘোষণা শুরু করলেন।

এরপরই শুরু হলো চূড়ান্ত নাটকীয় কাণ্ডকারখানা। রাজনারায়ণজীর এগিয়ে যাওয়ার সরকারী ঘোষণা শুনে জনমনে যে চাঞ্চল্য জাগবে অনুমান করা হয়েছিলো তা কিন্তু হলোনা। কোথাও কারো মুখে একটা শ্লোগান পযন্ত শোনা গেলো না। বরং রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন ঘিরে ফেললো নিষিদ্ধ এলাকাব বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে। শুধু একটা ফিস্‌ফিস্‌ হিস্‌হিস্‌ আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো হিমেল বসন্ত বাতাসে।

ঘোষণা জারির হুকুম দিয়েই মালহোত্রাজী বেরিয়ে গেলেন তাঁর ঘর থেকে। যাবার সময় একজন সহকারীকে বলে গেলেন, 'যদি দিল্লী থেকে ফোন আসে তবে বলবে আমি এখানে নেই; ভিড়ের মধ্যে

কোথায় আছি তা খুঁজে পাচ্ছো না

কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রত্যাশিত ফোন এলো দিল্লী থেকে। ফোন করছেন স্বনামধন্য ওম মেহেতা।

অনেক খোঁজাখুজি করেও পাশের ঘরে বসে থাকা মালহোত্রাকে খুঁজে পেলেন না তাঁর সহকারী। শেষে ফোন ধরলেন ফোতেদারজী।

মেহতার সঙ্গে তাঁর কী কথা হলো তা তিনিই জানেন। তবে ফোন ছাড়ার সাথে সাথেই একটা কাগজ নিয়ে তিনি, জগপৎ তুবে এবং যশপাল কাপুর বসে গেলেন। দ্রুত লেখা হতে লাগলো একটা পিটিশন। অন্য ছ তিন জন লোক, সম্ভবতঃ তারা পেশায় আইনজীবী, তারাও বিভিন্ন শব্দ চয়নে এঁদেরকে সাহায্য করতে লাগলেন।

মিনিট দশেকের মধ্যে ফোতেদারজী পিটিশনটা হাজির করলেন মালহোত্রার টেবিলে। আবেদনঃ যেহেতু অনেক বাক্সের সিল ভাঙ্গা পাওয়া গেছে, এবং সন্দেহ করা হচ্ছে ভোট গ্রহণের ব্যাপারে বেশ গুরুতর গোলোযোগ ঘটেছে, সেহেতু ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা বন্ধ রেখে আবার সমগ্র লোকসভা এলাকায় ভোট গ্রহণের আদেশ দেওয়া হোক।

আবেদনপত্র পড়ে মালহোত্রাজী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। দশ পনেরো সেকেণ্ড অবাক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ফোতেদারের দিকে। তারপর অতি শান্ত স্বরে বললেন, 'গণনা যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন আর এটা কি করে সম্ভব?'

ফোতেদার তবুও বলে চললেন, 'না, এটা করতেই হবে।'

মালহোত্রা বললেন, 'ঠিক আছে, এখনি আপনার আবেদন শোনার জন্য আদালত বসছে।'

সেই টেবিলেই আদালত বসলো। শুরু হলো ফোতেদারের উত্তেজিত ভাষণ। তিনি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলা শুরু করে দিলেন।

মালহোত্রা যে-কোনো কারণেই হোক সন্ধ্যা থেকেই বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এমন ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা তিনি হয়তো স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তাই কোন তর্কের কি উত্তর দিতে হবে সেটা

যেন এই মুহূর্তে ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। কোথাও কোথাও বেশ ইতস্তুতঃ করছিলেন।

তাঁর এই মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করে নির্বাচন কমিশনের তরফের পর্যবেক্ষক পি. বি. দত্ত এগিয়ে এলেন। বললেন, 'মালহোত্রাজী, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি একটা কথা বলতে পারি কি?'

মালহোত্রাজী অথৈ জলে পড়ে ডুবতে ডুবতে হাতে যেন একটা লাইফ বোট পেয়ে গেলেন। সোৎসাহে বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

শ্রী দত্ত ফোতেদারকে লক্ষ্য করে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'মিস্টার ফোতেদার, অনুগ্রহ করে বলবেন কি, নির্বাচনী আইনের কোন ধারা অনুযায়ী বর্তমান অবস্থায় আপনি আবার নতুন করে নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছেন?'

একটি সময়োচিত মোক্ষম প্রশ্নে ফোতেদার একেবারে কাত। তিনি নগদ চার টাকা দিয়ে কেনা নির্বাচনী আইনের বইটির প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত বার দু-তিন উলটে গেলেন। এর আগে আর কখনো বইটি তাঁর উলটে দেখার প্রয়োজন হয়েছিলো বলে মনে হলো না—কারণ বইটি এখনো একেবারে নতুনই রয়েছে।

খরচ হয়ে যাওয়া চারটে টাকা আর উশুল হলো না ফোতেদার সাহেবের। তিনি হাজার খুঁজেও এমন একটি ধারা পেলেন না, যা দেখিয়ে বলতে পারেন যে, এই ধারা অনুযায়ী আবার নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানাচ্ছি।

মালহোত্রা ইতিমধ্যে ফোতেদারকে বলে দিয়েছেন, 'আমার পক্ষে আর বেশি সময় দেওয়া সম্ভব নয়, আপনার যা বলার তা পনেরো মিনিটের মধ্যে বলতে হবে।' কিন্তু দুর্ভাগ্য, পনেরো মিনিটের মধ্যে বলবার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলেন না ফোতেদারজী।

মালহোত্রা টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে শুধু চারটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'আপনার আবেদন অগ্রাহ্য হলো।' তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে—যেখানে তখনো শেষ পর্যায়ের গণনা চলেছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারা দুনিয়া জেনে গেলো 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য' অস্তমিত। সমগ্র ভারতবর্ষ নয়—ভারতবর্ষের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ, 'মুক্তিসূর্যের' একান্ত আপনার এলাকার একান্ত আপনজন বলে প্রচারিত মানুষরাও তাঁকে প্রত্যাখান করেছে—'এশিয়ার মুক্তিসূর্য' শেষ পর্যন্ত রায়বেরেলীর 'চন্দ্র' হয়েও আকাশে উদিত হতে পারেননি—তিনি এখন নিতান্তই নিভু নিভু প্রদীপ।

স্বভাবতঃই পাঠক জানতে আগ্রহান্বিত হবেন, রায়বেরেলীতে যখন নাটকীয় ঘটনার পর ঘটনা ঘটছিলো তখন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এক নম্বর সফদরগঞ্জ রোডে কি হচ্ছিলো?

নিজের চোখে দেখিনি, তবে একজন সাংবাদিক বন্ধু, দিল্লীর 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকার সুমন তুবে যে বিবরণ দিয়েছেন সেটাকেই হুবহু বর্ণনা করছি ঃ

রবিবার সকাল থেকেই এক নম্বর সফদরগঞ্জ রোডের বাড়িটাকে মনে হচ্ছিলো একটা নিঝুম-পুরী। কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই, কোনো ব্যস্ততা নেই, নেই কোনো অস্বাভাবিক দৃশ্যের উপস্থিতি।

সন্ধ্যাবেলা রায়বেরেলী থেকে প্রথম যে ফোন এলো তাতে অবস্থার সঠিক বর্ণনা দেওয়া হলো না, বরং বলা হলো সবকিছু ঠিকঠাক চলেছে। কিন্তু এক ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই দিল্লীর জনৈক সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ফোন করে বললেন, প্রধানমন্ত্রীকে খবর দিয়ে দিন যে ভোট গণনা শুরু হওয়ার সময় থেকেই রাজনারায়ণজী এগিয়ে রয়েছেন, এবং ভোটের ব্যবধান ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

খবরটা শুনেই কর্মচারীটি চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন রায়বেরেলীতে। সেখানে ফোন ধরলেন নির্বাচন অধিকারী। বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক খবরই শুনেছেন। এখন পর্যন্ত ইন্দিরাজী বারো হাজার ভোটে পিছিয়ে রয়েছেন।'

কর্মচারীটি এবার বেশ দোটানায় পড়লেন—কী করবেন তা ঠিক

করে উঠতে পারলেন না বেশ কিছুক্ষণ। শেষে আটটা নাগাদ খবরটা পৌঁছে দিলেন ইন্দিরাজীর কাছে।

খবর শুনে কিছুমাত্র বিচলিত হতে দেখা গেলো না প্রধানমন্ত্রীকে। তখন তাঁর সামনে বসেছিলেন, এমন একজন বলেছেন, অত্যন্ত শান্ত চিত্তে তিনি খবরটাকে গ্রহণ করলেন। তারপর যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যক্তিগত সচিবকে আদেশ দিলেন মন্ত্রীসভার বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্য।

দু ঘণ্টা পরে মন্ত্রীসভার বৈঠক শুরু হলো। ততোক্ষণে চূড়ান্ত ফলাফল জানা হয়ে গেছে। ইন্দিরাজী বললেন, 'জরুরী অবস্থা তুলে নেবার জন্য আমি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করতে চাই।'

মন্ত্রীসভার সদস্যরা তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে সে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হলো শ্রী জাত্তিকে।

ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বহু লোকের আসা শুরু হয়ে গেছে। ওদিকে রায়বেরেলী থেকে ক্রমাগত ফোন আসছে এবং কথা হচ্ছে। শেষে একটার সময় চূড়ান্ত ফলাফল এসে পৌঁছোলো—প্রধানমন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন।

ততোক্ষণে সারা দুনিয়ার লোক জেনে গেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর নিজের নির্বাচনী এলাকায় পঞ্চান্ন হাজারেরও বেশি ভোটে হেরে গেছেন।

যারা তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন তাদের সাথে মোটামুটি বার্তা বিনিময় করে রাত তিনটের সময় তিনি ঠিক করলেন, এবার শোয়া দরকার। তারপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন শোবার ঘরে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

ঘরের কপাট বন্ধ করতে পারলেও সে রাতে কি তিনি নিজের মনের চিন্তার কপাট বন্ধ করতে পেরেছিলেন? সকলের কাছ থেকে

বিদায় নিয়ে শুতে গেলেও কি তিনি ঘুমোতে পেরেছিলেন? সে অবস্থায় কি কারো পক্ষে ঘুমোনো সম্ভব? তখন কি তাঁর মনের দুয়ারে বারবার এসে উঁকি দেয়নি ফেলে-আসা অতীত দিনগুলোর স্মৃতি? বারবার কি তাঁর মন একটি প্রশ্নের দ্বারা তাড়িত হয়ে ছটফট করে ওঠেনি: কেন এমন হলো? কেন? কেন?

কারণ একটা নয়, কারণ অনেক। মানুষকে বোকা বানাবার খেলায় শ্রীমতী গান্ধী দিনকে দিন এতো উৎসাহিত হয়ে উঠছিলেন যে প্রতিদিনই একটা না একটা কারণের সৃষ্টি হচ্ছিলো। দালাল তৈরির কারখানা থেকে প্রতিদিনই নতুন নতুন দালালরা বেরিয়ে এসে তাঁর চারপাশে জমায়েত হচ্ছিলো এবং তাঁকে উৎসাহিত করছিলো আরো বেশি করে 'বোকা বানাবার খেলা' চালিয়ে যেতে। তারা পরামর্শ দিচ্ছিলো, তাঁর মৃত্যুর পর যাতে এই খেলা বন্ধ হয়ে না যায় তার জন্য এখন থেকেই ব্যবস্থা নিতে; এবং শ্রীমতী গান্ধীও এ খেলাটায় এতো বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে এই আনন্দদায়ক খেলাটাকে চিরকালের জন্য চালু রাখার ব্যবস্থা করতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলেন।

জমি তো আগে থাকতে প্রস্তুতই ছিলো, শুধু অপেক্ষা ছিলো ফসল বোনার। পঁচাত্তরের পঁচিশে জুন শুরু হলো সেই ফসল বোনার কাজ।

দেবী প্রথমে একটু নাটক করলেন: 'এটা করা কি ঠিক হবে?'

'কেন নয়?' অসুরের ভূমিকায় যিনি অবলীলাক্রমে মানিয়ে যেতে পারেন সেই জুলফীওলা বাঙালী বাবুটি বললেন, 'এখনো জনতা আমাদের সাথেই আছে, সুতরাং কেন আমরা সি. আই. এর এজেন্টদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাবো?'

একজন সদ্য-মোটা সৌখিন রাজনীতিবিদ, যিনি কিছুদিন আগে পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশে তাঁর জন্মস্থান থেকে দিল্লী আসার রেলের ভাড়া যোগাড় করতে গিয়ে হিমসিম খেতেন তিনি বললেন, 'বাবুজীকে সি. আই. এর এজেন্ট বললে কি লোক সে-কথা বিশ্বাস করবে?'

সন্থ-মোটা ভদ্রলোকের কথা শুনে ধমকে উঠলেন দেবীজীর নতুন 'লেফটেন্যান্ট' ওম মেহতা, 'চুপ করুন তো মশাই, ওখন থেকে ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ করছেন। বাবুজীকে সি. আই. এর এজেন্ট বলতে যাবো কেন আমরা— বলবো তো জয়প্রকাশজীকে।'

এবার হাসি ফুটলো মধ্যপ্রদেশী সৌখিন রাজনীতিকের মুখে। বললেন, 'ও, তাই বলুন; বাবুজীর ব্যাপারটা আসলে জয়প্রকাশজীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ধমকের সুরেই বললেন মেহতা সাহেব।

ঠিক হলো দেশে 'গুরুতর জরুরী অবস্থা' চালানো হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থার বিজ্ঞাপনের ভাষায় যাকে বলা হয়ে থাকে 'ডবল অ্যাকসন।'—তাই।

পাঠক জানতে চাইতে পারেন হঠাৎ এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নাম উঠলো কেন? এর উত্তর পেতে হলে কয়েকটা দিন পিছিয়ে যেতে হবে।

বারোই জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরোবার পরই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে একটি অতি জরুরী বৈঠক শুরু হয়। সেই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত কাছের লোক যারা তারাই উপস্থিত ছিলেন। দেবকান্ত বরুয়া, সিদ্ধার্থ রায়, ওম মেহতা, বংশীলাল, বিদ্যাচরণ শুক্লা— এদেরকেই তখন প্রধানমন্ত্রী কাছের লোক বলে মনে করতেন।

বৈঠকে ঠিক হয় বাইরে থেকে যতো চাপই আসুক প্রধানমন্ত্রী কিছুতেই পদত্যাগ করবেন না। যতোক্ষণ না মামলা সুপ্রীম কোর্টে যাচ্ছে, এবং সুপ্রীম কোর্টের রায় বেরোচ্ছে ততোক্ষণ তিনি যেভাবেই হোক স্বপদে বহাল থাকবেনই।

বিদ্যাচরণ শুক্লার ওপর দায়িত্ব পড়ে প্রচার বিভাগকে সংগঠিত করে এমনভাবে প্রচার চালানোর যাতে জনমনে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, কোর্ট একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপারকে প্রধান ইস্যু করে প্রধানমন্ত্রীকে হেয় করার উদ্দেশ্যেই এমন রায় দিয়েছে। শুক্লাজী সেই অনুযায়ী রায়

বেরোবার মুহূর্তে থেকেই রেডিওকে কাজে লাগিয়ে দেন। সেখান থেকে ক্রমাগত এমন কায়দা করে হাইকোর্টের রায়কে ব্যাখ্যা করে শোনানো হতে থাকে যে মনে হয় যেন কিছুই হয়নি। মনে হয় কোর্ট নিতান্ত তুচ্ছ একটা ব্যাপারে হঠাৎ মুখ ফস্‌কে একটা অতি গুরুতর মন্তব্য করে বসেছে. যা-কিনা সত্যি সত্যিই তেমন গুরুতর নয়।

দেবকান্ত বরুয়ার ওপর দায়িত্ব পড়ে সারা দেশে যেখানে যতো কংগ্রেসী আছে—মুখ্যমন্ত্রী থেকে সাধারণমন্ত্রী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি থেকে কমিটির সদস্য সকলকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থাজ্ঞাপক বিবৃতি প্রচারের ব্যবস্থা করা। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি থেকে এবং কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকে প্রতিটি রাজ্য-রাজধানীতে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে যোগাযোগ শুরু হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিবৃতি আসা শুরু হয়ে যায়। একটার পর একটা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে বিবৃতি দিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বিবৃতি রেডিও মারফত প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

কংগ্রেসী শিবিরে যখন এই অবস্থা তখন বিরোধী শিবিরেও সাজসাজ রব ওঠে। বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে বিবৃতি দেওয়া শুরু করেন।

প্রথম দিকে একটা ব্যাপার বিশেষ লক্ষণীয় ছিলো। যে-সব কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থা জানিয়ে বিবৃতি দিচ্ছিলেন তারা শুধু একথাই বলছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাদের আস্থা আছে। কিন্তু কেউই একথা বলছিলেন না যে এরপরও প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বপদেই থাকুন।

এর দুটো কারণ হতে পারে। এক, হাইকোর্টের রায়ের আইনগত তাৎপর্যটা তখনো কারো কাছে পরিষ্কার হয়নি? তাই প্রত্যেকেই সতর্কভাবে শুধু প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থা জানিয়েই ক্ষান্ত থাকছিলো, প্রধানমন্ত্রীকে স্বপদে থাকার অনুরোধ জানিয়ে আইনগত প্যাঁচে পড়তে চায়নি, কিংবা কোর্ট অবমাননার দায় কাঁধে নিতে রাজি হয়নি।

দুই, তখন পর্যন্ত বেশিরভাগ মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেসী নেতারা রাজধানীর বাইরে রয়েছেন। যতোক্ষণ না তারা সকলে এসে রাজধানীতে পৌঁছোচ্ছেন এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করছেন ততোক্ষণ কেউই নিজ দায়িত্বে প্রধানমন্ত্রীকে স্বপদে থাকার অনুরোধ করার 'রিস্ক' নিতে চাননি।

অবস্থার পরিবর্তন হওয়া শুরু হলো সেদিন রাত থেকে। একে একে বিভিন্ন প্রাদেশিক নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রীরা দিল্লী এসে হাজির হতে লাগলেন। তখন শুরু হলো পারস্পরিক আলোচনা।

আলোচনায় দেখা গেলো সমগ্র কংগ্রেস পুরোপুরি দুটো মতে বিভক্ত হয়ে গেছে। এক, ইন্দিরা গান্ধী এখনি পদত্যাগ করুন। দুই, যতোক্ষণ না সুপ্রিম কোর্টের রায় বের হচ্ছে, ততোক্ষণ তিনি কিছুতেই পদত্যাগ করবেন না।

প্রথম মতের সমর্থক হিসেবে সব থেকে সামনের সারিতে এসে দাঁড়ালেন তরুণ তুর্কি নেতা চন্দ্রশেখর। আর দ্বিতীয় মতের সমর্থনে ময়দানে নামলেন দেবকান্ত বরুয়া।

দু দলেরই প্রচারাভিযান চললো পুরো মাত্রায়। প্রত্যেকেই দিনরাত ধরে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেন যতো বেশি সম্ভব কংগ্রেসী নেতার সমর্থন আদায়ের কাজে।

এদিকে সারা দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলির বেশির ভাগই প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের পক্ষেই রায় দিয়েছে। তারা তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছে, 'আপনি আপাততঃ পদত্যাগ করে আইন ও গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করুন' এবং অদূর ভবিষ্যতে 'সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরোলে সেখানে যদি বিজয়ী হন তখন আবার সসম্মানে স্বপদে ফিরে আসবেন। তাতে আপনার এবং জাতির—উভয়েরই গৌরব বাড়বে।'

সংবাদপত্রের প্রতি শ্রীমতী গান্ধী কোনোদিনই তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, ভারতীয় সংবাদপত্র জনগণের মতের প্রতিফলন ঘটায় না, এবং জনগণ যা চাইছে সে তার বিপরীত কথাই

লেখে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেখতে গেলে, যেহেতু সংবাদপত্র বলছে তাঁকে পদত্যাগ করতে সেহেতু তাঁর দিক থেকে পদত্যাগ না করার সকল্প করাটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু এক্ষেত্রে তা হলো না। ইন্দিরাজী যে-কোন কারণেই হোক পদত্যাগ করবেন বলে ঠিক করলেন।

কথাটা তিনি একান্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে বললেন, এবং এটা যাতে বাইরে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সেজন্য তাদেরকে অনুরোধ জানালেন। প্রত্যেকেই তাঁর অনুরোধে কথা দিলো একথা বাইরে কাক-পক্ষীটিও জানতে পারবে না।

কিন্তু পরের দিনই দেখা গেলো, কাকপক্ষী নয়, অনেক 'মনুষ্য সন্তান'ও খবরটা জেনে গেছে। সুতরাং শুরু হলো 'লবিং।'

ইন্দিরা গান্ধী পদত্যাগ করে ঠিক কাকে প্রধানমন্ত্রীর তখ্‌তে বসাতে চাইছিলেন সেটা তিনি তখন পর্যন্ত কারো কাছেই প্রকাশ করেননি। তবে এটা বোঝা যাচ্ছিলো, তিনি এমন কাউকে চাইছেন, যার ওপর অন্তত আস্থা রাখা যাবে যে, তিনি সুপ্রীম কোর্টে জিতে এলে সেই 'সাময়িক তখ্‌ত দখলকারী' তখ্‌ত ছেড়ে তাঁকে আবার প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠানের সুযোগ করে দেবেন।

ইন্দিরা গান্ধী মনে মনে ঠিক কাকে চাইছেন সেটা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিলো না বলে অনেকেই স্ব-স্ব্ অনুগামীদের মারফত নিজের নামটা বাজারে চালু করার চেষ্টায় মেতে গেলেন। ওদিকে কংগ্রেসের মধ্যেই যারা ইন্দিরা বিরোধী তারাও আর চুপ করে বসে থাকাটা যুক্তি-যুক্ত নয় মনে করে কাজে নেমে পড়লেন।

যদিও তখন বাজারে অনেকগুলো নাম চালু হয়ে গেছে, এবং দিল্লীর হাওয়া গুজবে গুজবে ভারি হয়ে উঠেছে—তবু ইন্দিরাজীর মনের মানুষটি যে সঠিক কে তা কেউ হলফ করে বলতে পারছেন না; প্রত্যেকেই নিজের দলের লোকটিকে ইন্দিরাজীর 'মনের মানুষ' বলে চালাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

দু-তিন দিনের মধ্যেই দেখা গেলো গুজবের দৌড়ে সব থেকে

আগে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। এবং শেষ-পর্যন্ত এটাও পরিষ্কার হয়ে গেলো যে তিনিই হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর সেই বহু প্রত্যাশিত 'মনের মানুষ'টি।

এইখানে এসে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা একেবারে নতুন মোড় নিলো। যখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে ইন্দিরাজী সুপ্রীম কোর্ট থেকে জিতে না আসা পর্যন্ত সিদ্ধার্থ বাবুই প্রধানমন্ত্রীর পদে বসতে চলেছেন তখন, কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীলদের খুঁজে বের করার ঠিকা নিয়ে যারা দেশময় দূরবীন হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই 'পিতৃভূমি' থেকে আশীর্বাদপ্রাপ্ত 'কৌশল পার্টি'র লোকজনেরা ময়দানে নেমে পড়লো। তারা লবিং শুরু করলো, সিদ্ধার্থবাবু তেমন বিশ্বাসযোগ্য লোক নন, যে কোনো সময় তিনি ডিগবাজি খেতে পারেন ; সুতরাং তাঁর মতো লোকের হাতে 'পিতৃভূমি'র অনুগত 'মাতৃভূমি'র ভাগ্য সমর্পণ করলে যে কোনো দিন 'পিতৃভূমি'র স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। অতএব যেভাবেই হোক তাঁকে আটকাতেই হবে।

এই ডামাডোলের বাজারে আর একটি লোক, যিনি বহুদিন ধরে বুকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত হওয়ার বেদনা নিয়ে ঘুরছিলেন, এবং সিদ্ধার্থ রায়ের হাতে আইনগত ও বসুমতী পত্রিকা সংক্রান্ত ব্যাপারে নাকাল হওয়ার কথা ভুলতে পারছিলেন না, সেই অশোক সেনের আবির্ভাব হলো। তিনি কোলকাতার ব্যবসায়ী সমাজের রত্ন 'ইলেকট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী' নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কমল নাথকে ধরলেন।

কমল নাথের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার জন্য বেশ কিছুটা জায়গা লাগবে, সেটা এখন মুলতুবি থাক। এইসূত্রে শুধু এটুকু বলাই হয়তো যথেষ্ট হবে যে মাননীয় নাথ বাবু ইন্দিরা তনয় শ্রী সঞ্জয় গান্ধীর এক-গেলাসের বন্ধু।

সি. পি. আই এবং তস্য উপর-মহলওয়ালারা যখন সিদ্ধার্থ রায়কে প্রধানমন্ত্রী না হতে দেওয়ার কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত তখন অশোক সেনও নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন সেই কাজে। তিনি কমল নাথের মারফত দোস্তি পাতালেন সঞ্জয়ের সঙ্গে।

সঞ্জয় আগে থাকতেই সিদ্ধার্থ বাবুর ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি কিছুতেই সব ব্যাপারেই সিদ্ধার্থ বাবুর মাতব্বরি করাটা সইতে পারছিলেন না। তাছাড়া তাঁর আশঙ্কা ছিলো, সিদ্ধার্থ বাবু যদি আরো উপরে চড়ে বসেন তাহলে তাঁর, অর্থাৎ সঞ্জয়ের নিজের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি হবে। সে কারণে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা চলাকালীনই বারবার মাকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন ননী পালকিওয়ালাকে নিয়োগের জন্য। আর প্রস্তাবটা যতোবারই ইন্দিরাজী সিদ্ধার্থ রায়ের সামনে রেখেছিলেন ততোবারই সিদ্ধার্থ বাবু এই একই যুক্তি দিয়ে সেই প্রস্তাবকে খণ্ডন করছিলেন যে, পালকিওয়ালা বিরোধী দলের রাজনীতির সমর্থক। তাঁর উপর ভরসা করে এতো বড়ো ব্যাপারটাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তিনি হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবেই এমন সব পয়েন্ট উত্থাপন করে বসবেন যার ফলে শ্রীমতী গান্ধী হেরে যাবেন।

সিদ্ধার্থ বাবুর এই মতের সমর্থক কংগ্রেসের ওপর মহলে আরো কয়েকজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় আইন-মন্ত্রী হরিরাম গোখলে এবং ওম মেহতা।

সিদ্ধার্থ বাবু যখন মগডালে প্রায় চড়ে বসতে যাচ্ছেন তখন রণক্ষেত্রে সোজাসুজি আবির্ভাব ঘটলো শ্রীমান সঞ্জয় গান্ধীর। প্রধান-মন্ত্রীর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, আঠাশ বছরের এই 'দুঃসাহসী সংগ্রামী যুবক'টি নিজেকে দেশসেবার কাজে উৎসর্গ করার জন্য একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এবং তার এই অস্থিরতা কমাবার জন্য রাজনীতিতে আসাটা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছিলো।

ওদিকে মারুতি কেলেঙ্কারি ততোদিনে চূড়ান্ত ক্লাইমেক্সে পৌঁছে গিয়েছে। এক বছরের মধ্যে অন্তত নমুনা গাড়ি দেওয়া হবে এই শর্তে সঞ্জয়জী ডিলারদের কাছ থেকে অগ্রিম জমা বাবদ তিন কোটি টাকা আদায় করে নিজের সিন্দুকে ভরে ফেলেছেন। তাছাড়া তাঁর পাশে ততোক্ষণে দু দুটো বৃহৎ আকারের টাকা সাপ্লাই মেসিন এসে দাঁড়িয়ে গেছে—তাঁর একটি কমল নাথ, অন্যটি অশোক সেন।

রাজনীতিতে ঢোকার জন্য প্রথম চোরাগলিটি খোঁজার কাজ দু মাস

আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিলো। সেই চোরাগলি দিয়ে সঞ্জয়জী যুব কংগ্রেসের সদর দপ্তরে পৌঁছোতে চাইছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায়ক হিসেবে জুটেছিলেন দেরাদূন স্কুলের ছেলেবেলার বন্ধু কমল।

যুব কংগ্রেসের ক্ষমতা দখল করতে হলে প্রথম যে কাজটা সব থেকে জরুরী ছিলো তা হলো কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে 'মস্কোপন্থী' প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীকে সরিয়ে দেওয়া। সুতরাং তাঁকে সরাবার ব্যাপারে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যার যার মদত জরুরী ছিলো তার তার সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা হলো। এবং সেই যোগাযোগ অনুযায়ী চুয়াত্তরের এক সন্ধ্যায় কোলকাতা থেকে দিল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন প্রফুল্লকান্তি ঘোষ। সফদরজঙ্গ রোডের রুদ্ধদ্বারকক্ষে সঞ্জয়, কমল এবং প্রফুল্লবাবুর মধ্যে গোপন সলাপরামর্শ চললো প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে। প্রফুল্লবাবু প্রিয়রঞ্জনকে রাজনৈতিক জগতে বেইজ্জত করার জন্য যা যা করা দরকার বলে মনে করবেন তার সবকিছুই নির্দ্বিধায় করবেন বলে সঞ্জয়জীকে কথা দিয়ে এলেন। তবে তার সাথে এ আবেদনটুকুও জুড়ে দিয়ে আসতে ভুললেন না যে, 'স্যার, আপনার জন্য আমি জান লড়িয়ে দেবো। তবে দেখবেন, আমার ছেলেরাও যেন কিছুটা সুযোগ পায়।'

এই 'কিছুটা সুযোগ' বলতে প্রফুল্লবাবু কি বোঝাতে চেয়েছিলেন সেটা সঞ্জয়জী ঠিকই বুঝেছিলেন, তবে 'আমার ছেলেরা' বলতে তিনি ঠিক কাকে কাকে বোঝাতে চাইছিলেন তা তাঁর বোধগম্য হয়নি। তাই তিনি নির্দিষ্ট করে নাম জানতে চেয়েছিলেন, এবং প্রফুল্লবাবুও সাথে সাথে তিনটি নাম তাঁর ডায়রীতে লিখিয়ে দিয়ে এসেছিলেন।

চুয়াত্তরের ডিসেম্বর থেকে পঁচাত্তরের মে পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে কাজ অনেক এগিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর প্রবল বিরোধীতার ফলে সঞ্জয়জীর পক্ষে প্রকাশ্যে যুব কংগ্রেসের ওপর মাতব্বরি করাটা সম্ভব হচ্ছিলো না। কারণ ভয় ছিলো সেক্ষেত্রে প্রিয়বাবুও চুপ করে বসে থাকবেন না। তিনি তাঁর দলবলসহ প্রকাশ্যে নেমে পড়বেন মারুতি কেলেঙ্কারির নায়ককে জনসমক্ষে যতোটা হেয় করা যায়, সেই কাজে। তাছাড়া আর এক 'মস্কোপন্থী' শ্রী দেবকান্ত বরুয়াও

সেক্ষেত্রে প্রিয়রঞ্জনকেই মদদ দেবেন, ইন্দিরা-তনয়কে নয়।

সঞ্জয়জী সিদ্ধার্থবাবুকে সহ্য করতে পারছিলেন না, কারণ সিদ্ধার্থবাবু দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। আবার অশোক সেন তাঁকে পছন্দ করছিলেন না, কারণ তিনিও অশোক সেনকে পছন্দ করতেন না। আর সি. পি. আই তাঁকে চাইছিলো না, কারণ, তিনি পুরোপুরি 'মস্কোর লোক' ছিলেন না। সুতরাং শুরু হলো খেলা।

দুর্বিনীত দুর্যোধনকে ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন ঃ

'অধর্মে দিয়েছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ। জ্বালাতেছি কালানল ঘোর
পুরাতন কুরুবংশ-মহারণ্যতলে—
তবু, পুত্র, দোষ দিস স্নেহ নাই ব'লে ?'

ইন্দিরাজীরও সেই একই অভিযোগ ছিলো পুত্রের প্রতি। আর পুত্রও মায়ের প্রতি বহুদিন ধরেই এই অভিযোগ করে আসছিলেন যে, তাঁর প্রতি যতোটা নজর দেওয়া দরকার মা তা দিচ্ছেন না।

এবারও পুত্র সেই অভিযোগ নিয়েই মার সামনে এসে হাজির হলেন।

পুত্রের অভিযোগ শুনে মা স্তম্ভিত। কারণ, তিনি মনে করতে পারলেন না, সেই তিন বছর আগে একটু অতিরিক্ত ডোজের 'কোকা কোলা' খেয়ে পুত্র-রত্নটি যখন গভীর রাত্রে এক নম্বর সফদরজঙ্গ রোডে ফিরে চিৎকার চেঁচামেচিতে চাকর-বাকরদের জাগিয়ে তুলেছিলেন তখন তাঁর গালে একটু মৃদুহস্তলেপন করা ছাড়া তিনি তো আর কিছুই করেননি।

আর ছেলেও তো তার প্রতিদান কম দেয়নি। পদ্মজা-আন্টির বাড়িতে গিয়ে সেই যে সে উঠে বসলো, যতোক্ষণ না অনুরোধ উপরোধ করে তাকে ডেকে পাঠানো হলো, এবং পদ্মজা-আন্টি নিজে সাথে করে এনে তাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন ততোক্ষণ তো সে কৈ, মা বলে ছুটে এলো না ?

যাক সে সব কথা, পুত্রের অভিযোগ কি, মন দিয়ে শোনা যাক।

পুত্র বললেন, 'সিদ্ধার্থবাবুকে যদি একবার গদি ছাড়া হয় তাহলে

সে গদি আর ফেরৎ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।'

মা উত্তর দিলেন, 'না, সিদ্ধার্থ অতোটা বেইমানি করবে না।'

পুত্র বললেন, 'বেইমানি করবে না কি, ইতিমধ্যেই তো বেইমানি করে বসেছে।'

মা জানতে চাইলেন, 'কি রকম ?'

'কেন, নির্বাচনী মামলাটা তো উনিই চালালেন। মামলা চলাকালীন কোনোদিন কি তোমাকে একবারও আভাস দিয়েছিলেন যে তুমি এ মামলায় হেরে যেতে পারো ?'

'না, তা অবশ্য বলেনি। কিন্তু…'

'এর মধ্যে কিন্তুর কিছু নেই,' পুত্র দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'যা কিছু করা হয়েছে তার সবটাই ইচ্ছাকৃতভাবে। সিদ্ধার্থবাবু জেনেশুনেই এমনভাবে কেসটা চালাচ্ছিলেন যাতে তুমি হেরে যাও।'

'তাতে তার লাভ ?'

'লাভটা কি তা তো এখনি দেখতে পাচ্ছো।'

'কি ?'

'তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন।'

'কিন্তু সে তো কিছুদিনের জন্য।'

'কিছুদিনটা যে চিরদিন হয়ে যাবে না সেটাই বা তুমি বুঝছো কিভাবে ?'

'সুপ্রীম কোর্টে জিতে এলে তখন কংগ্রেস সংসদীয় দল আমাকেই আবার প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করবে।'

'কিন্তু যদি না জিতে আসো, তখন ?'

'আমি জিতবোই।'

'আগে থাকতে সেটা হলফ করে বলছো কোন ভরসায় ?'

'কারণ সুপ্রীম কোর্টে এখন যাঁরা আছে তাঁরা সকলেই "কমিটেড।" '

'সেটা বুঝছো কিভাবে ?'

'কমিটেড লোকদের আমিই বসিয়েছি, আর সে কারণেই হেডগে,

সেলাত ও গ্রোভারকে বিদেয় দেওয়া হয়েছে।'

'বিদায় দিয়ে যাঁদেরকে এনেছো তাঁরা যে তোমাকেই সমর্থন করবে সেটা ভাবছো কেন?'

'না-ই বা ভাববো কেন?'

'সিদ্ধার্থবাবু নিজে আইনজীবী, আইনের ব্যাপারীদের সঙ্গে তোমার থেকে তাঁর দহরম মহরম অনেক বেশি।'

মোক্ষম অস্ত্রটি ছুঁড়ে দিলেন সঞ্জয়জী ; মায়ের বুকের দুরন্ত ক্ষমতা-লোলুপতার কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে আঘাত করলো সেটি। তাঁর মন টলে উঠলো।

ক্ষমতার অমৃতভাণ্ড লাভের কাঁটা বিছোনো পথে কিছুটা যেন কুসুমের আস্তরণ পড়লো। মায়ের মনে সন্দেহের সাজানো উনুনটাতে আঁচ জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন সঞ্জয়জী। এবার শুরু হলো তাঁর শুভযাত্রা।

ওদিকে 'কুড়ি বছরের চুক্তিবদ্ধ' পাকা দোস্তের কাছ থেকে রেড সিগন্যাল আসা শুরু হয়েছে, খবরদার, এমন কাজও করবেন না, তাহলে পরে পস্তাতে হবে। বরং কোনো অসমীয়া ভদ্রলোককে গদীতে বসান, তাহলে ভবিষ্যতে আবার তখ্‌ত-এ-তাউস ফিরে পাবার ব্যাপারে কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না।'

দেখতে দেখতে গুজবের আকাশ ফর্সা হয়ে গেলো। সিদ্ধার্থবাবুর নাম দুদিনের মধ্যেই কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেলো হাওয়ায়। তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন নিতান্ত দিবাস্বপ্নে রূপান্তরিত হলো যুদ্ধের ময়দান থেকে তিনি আহত হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন নিজের শিবিরে।

দিল্লীর রাজনৈতিক জগতে ধ্বনিত হতে লাগলো একটি নাম : দেবকান্ত বরুয়া। প্রস্তাব উঠলো, ইন্দিরাজী পদত্যাগ করে দেবকান্ত বরুয়ার হাতে প্রধানমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব অর্পণ করবেন, এবং সুপ্রীম কোর্টের রায় বেরোলে আবার এসে সেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবেন।

পুরো ব্যাপারটার মধ্যে সব থেকে লক্ষ্যণীয় যেটা, তা হলো, তখন কংগ্রেসের প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলো যে প্রধানমন্ত্রী সুপ্রীম

কোর্টের আপীলে জিতবেনই। তখন দিল্লীতে এমন একজন কংগ্রেসীকেও দেখিনি যার মনে কিনা সন্দেহ ছিলো যে প্রধানমন্ত্রী সুপ্রীম কোর্টে হেরেও যেতে পারেন। এ থেকে সবার কাছেই এটুকু পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে, মোহন কুমারমঙ্গল বারবার 'কমিটেড' বিচারক তৈরির ব্যাপারে যা বলছিলেন সে কাজটুকু অন্ততঃ সমাধা হয়ে গেছে।

যাইহোক, সি. পি. আই বন্ধুদের সহযোগিতায় দেবকান্তবাবু ক্ষমতার ট্রাকের উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে লাগলেন। যারা একদিন মোহন কুমারমঙ্গলম দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন এই আশায় ধেই ধেই করে দু হাত তুলে নৃত্য করছিলেন তারা পাগলের মতো এবার দেবকান্তবাবুকে নিয়ে পড়ে গেলেন।

নাটক যখন এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তখন আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে ময়দানে নেমে পড়লেন বাবু জগজীবন রামের সমর্থকের দল। অধ্যাপক শের সিংয়ের বাড়িতে জরুরী মিটিং ডাকা হলো। সেই জরুরী মিটিংএ প্রস্তাব নেওয়া হলো, 'প্রধানমন্ত্রী আদালতের রায় মাথা পেতে মেনে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীব পদ থেকে ইস্তফা দিন। তিনি ইস্তফা দিলে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে হবেন সে সিদ্ধান্ত নেবে কংগ্রেস সংসদীয দল, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষ নয়।'

দেখতে দেখতে পরিস্থিতি বিস্ফোরণের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোলো। প্রধানমন্ত্রী প্রমাদ গুণলেন। যে দুটি লোকের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি কংগ্রেসের পুরাতন দুর্গ লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলার কাজে নেমেছিলেন, এবং হাজার চক্রান্তের মায়াজাল ছড়িয়ে শেষ পর্যন্ত আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সক্ষম হয়েছেন—তাঁদেরই একজন বাবু জগজীবন রাম। সেই লোকটি শেষ পযন্ত তাঁর ওপর বেঁকে বসেছেন।

বেঁকে বসার যথেষ্ট কারণও ছিলো। ইন্দিরাজী বাবুজী এবং ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের কাঁধে ভর দিয়ে ক্ষমতার গদিটিকে পাকাপাকি ভাবে দখল করার পর প্রথম যে কাজটি শুরু করেছিলেন তা হলো যেনতেন ভাবে বাবুজীর ক্ষমতা খর্ব করা।

ফকরুদ্দিন আলি আহমেদকে তিনি মোটেই গ্রাহ্য করতেন না,

তাঁর ভয় ছিলো বাবুজীকে। পার্টির মধ্যে এবং জনতার ওপর, বিশেষতঃ হরিজনদের ওপর বাবুজীর প্রভাব ছিলো যথেষ্ট। ইন্দিরাজী একাত্তর সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ পঞ্চম লোকসভার নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বাবুজীকে মোটেই ঘাঁটাননি; বরং তিনি সবসময়েই তাঁর সাথে এমন ব্যবহার করতেন যে মনে হতো যেন তাঁর প্রতি বাবুজীর সহযোগিতার জন্য তিনি বাবুজীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

কিন্তু মুখোশ খসে পড়লো একাত্তরের নির্বাচনের পরেই। বাবুজীকে তখন আর তিনি মানুষই জ্ঞান করেন না। নির্বাচনের শেষে যে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হলো সে ব্যাপারে তিনি বাবুজী, চ্যাবন কিংবা ফকরুদ্দিন সাহেব—কারো সাথেই কোনো আলোচনা করা দরকার বলেও মনে করলেন না। শুধু তাই নয়, কারা কারা মন্ত্রীসভায় রয়েছে সে খবরও প্রত্যেকে জানলেন রাষ্ট্রপতির ঘোষণা শোনার পর। ইন্দিরাজী নিজেই লিস্ট তৈরি করে সোজা গিয়ে জমা দিয়ে এলেন রাষ্ট্রপতি ভবনে।

বাবুজী চূড়ান্ত নাজেহাল হলেন কংগ্রেস সভাপতির পদ নিয়ে। ইন্দিরাজী কোনোরকমের নিয়ম কানুনের পরোয়া না করে একদিন বাবুজীকে ডেকে সোজা বললেন পদত্যাগ করতে। পদত্যাগ না করলে কি কি বিপদ ঘটতে পারে সে ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করিয়ে এক রকম জোর করে লিখিয়ে নিলেন পদত্যাগপত্র।

কংগ্রেসের সাংগঠনিক নিয়ম হচ্ছে, কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগপত্র বিচার করবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। ওয়ার্কিং কমিটি পদত্যাগপত্র অনুমোদন করলে তবেই সেই পদত্যাগ গৃহীত হলো বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ইন্দিরাজী ওয়ার্কিং কমিটির ব্যাপারটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। ফলে ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন ছাড়াই বাবুজীর পদত্যাগ বাস্তবায়িত হয়ে গেলো, কিংবা বলা যেতে পারে বাবুজী পদচ্যুত হলেন।

এবার ইন্দিরাজী এক মোক্ষম অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন বাবুজীকে লক্ষ্য করে। তিনি নিজের এক বিশ্বস্ত অনুচরকে দিয়ে তাঁকে বলে পাঠালেন, প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা আপনি কোনো প্রদেশের রাজ্যপাল হোন।

অর্থাৎ কথাটার সোজাসুজি মানে, আপনি আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় থাকুন এটা প্রধানমন্ত্রী চান না।

কিন্তু এবার আর বাবুজী এ অপমান মাথা পেতে নিতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'আমি গভর্ণর হতে চাই না, যেখানে আছি সেখানেই থাকতে চাই।'

কথাটার মানে বুঝলেন ইন্দিরা গান্ধী। তিনি আর বাবুজীকে বেশি ঘাঁটালেন না। কারণ, তাঁর মাথায় তখন সংবিধান সংশোধনের পোকা গিজ্‌গিজ্‌ করছে। এবং সংবিধান সংশোধনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন অবশ্যই জরুরী। সুতরাং বাবুজীকে ঘাঁটিয়ে বেশি রিস্ক নিতে রাজি হলেন না তিনি। ব্যাপারটা সেখানেই চেপে গেলো।

এরপরও যে ইন্দিরাজীর সঙ্গে বাবুজীর সম্পর্কের কোনো উন্নতি ঘটলো তা নয়। তবে ইন্দিরাজী আগের মতো আর বাবুজীকে 'হেনস্তা' করার কথা চিন্তা করলেন না। কেননা, ততোক্ষণে বাংলাদেশের গরম মামলা ঝিমিয়ে গেছে, এবং দেশের আনাচে কানাচে বিরোধীপক্ষের গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

ইন্দিরাজীর আশঙ্কা আরো বেড়ে গেলো যখন জয়প্রকাশজী তাঁর আন্দোলন শুরু করলেন। তিনি কোনো লুকোচুরির ধার না ধেরে সোজাসুজি বাবুজীকে আহ্বান জানালেন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। এ আহ্বানে বাবুজী যতোটা বিচলিত হলেন তার থেকে অনেক বেশি বিচলিত হলেন ইন্দিরাজী।

ঠিক সে সময়েই এলো এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়।

ইন্দিরাজী এবং বাবুজীর সম্পর্ক তখন যতোটা তিক্ত হওয়া সম্ভব, তাই। গত চার বছর ধরে ইন্দিরাজী তাঁকে যেভাবে অপদস্থ করেছেন সে কথা বাবুজী কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। তাই যখন সময় এলো তখন ময়দানে নামাটাই মনস্থ করলেন। তবে তার আগে একবার নিজের 'ক্ষমতা'টা যাচাই করে নিতে চাইলেন।

অধ্যাপক শের সিংয়ের বাড়িতে মিটিং ডেকে প্রস্তাব নিয়ে সেই প্রস্তাবের কপি কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া

হলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবের সমর্থনে সংসদের উভয় সভার সদস্যদের সই সংগ্রহ শুরু হয়ে গেলো।

খবর পেয়ে ইন্দিরা গান্ধী যতোটা বিচলিত হলেন, তার থেকে অনেক বেশি বিচলিত হলেন আমাদেব বিদেশী বন্ধুরা এবং তাদের সহযোগী ভারতীয় কৌশলবাজ প্রগতিশীলের দল। তাদের সঙ্গে জুটে গেলো বংশী বরুয়া-সিদ্ধার্থ-শুক্লা-মেহতা চক্র, যাঁরা নিজেদের যোগ্যতায় নয়, ইন্দিরা গান্ধীর দয়ায় নেতা সেজে বসে ক্ষমতার সরটুকু আস্বাদনের সুযোগ পাচ্ছিলেন।

নাটক জমে উঠলো, ঘন ঘন বৈঠক বসতে লাগলো। বিরোধী পক্ষও আর বসে রইলো না, তারা বাবুজীকে লোক মারফত খবর পাঠালো, আমরা আপনার পেছনে আছি। এদিকে চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্ত, মোহন ধারিয়া ময়দানে নেমে পড়লেন—খোলাখুলি দাবি জানালেন, 'ইন্দিরাজী পদত্যাগ করুন।'

মায়ের আঁচল ধরে নেতা হওয়ার মইতে চড়ার ইচ্ছা মনে মনে লালন করে যিনি প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন সেই সঞ্জয় গান্ধীও এবার প্রকাশ্যে আবির্ভূত হলেন। সোজাসুজি মাকে বললেন, 'তুমি পদত্যাগ কবতে পারবে না।'

'কোরো না' কিংবা 'করা ঠিক হবে না' নয়, বললেন, 'করতে পারবে না।'

'করতে পারবে না' কথার মানে মা বুঝলেন এবং এ ও বুঝলেন এবার কি করতে হবে।

সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হলো। লিস্ট তৈরি হলো কাকে কোথায় তুলতে হবে, কাকে কাকে বাড়িতেই নজরবন্দী করে রাখা হবে এবং কাকে কোন পদ থেকে অপসারিত করতে হবে।

লিস্ট তৈরি শেষ হলে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পুলিশী জাল ছড়িয়ে দেওয়া হলো। নির্দেশ দেওয়া হলো, অমুক অমুক ব্যক্তিকে আটক করুন। কিন্তু কেন, তা কেউ জানলো না। তবে হুকুম পেয়েই গ্রেপ্তার করা শুরু হয়ে গেলো; যাকে যাকে বাড়িতে নজরবন্দী

করে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো তাদের বাড়ির গেটে পুলিশী টহলদারি বসলো।

দেশে গুরুতর জরুরী অবস্থা ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়ে ইন্দিরাজী হাজির হলেন রাষ্ট্রপতি ভবনে। রাষ্ট্রপতিকে বললেন ঘোষণাপত্রে সাক্ষর করতে। তাঁর সাথে রাষ্ট্রপতির কি কথা হয়েছিলো তা আর কারো জানা নেই। তবে এটুকু জানা গেছে, রাষ্ট্রপতি জানতে চেয়েছিলেন, এ সিদ্ধান্ত মন্ত্রীসভার বৈঠকে নেওয়া হয়েছে কিনা? জবাবে ইন্দিরাজী যা বলে-ছিলেন সেটা 'অশ্বত্থামা ইতি গজ' গোত্রের। তিনি বলেছিলেন, 'সদস্যদের জানানো হয়েছে।'

'সদস্যদের জানানো হয়েছে,' আর 'তাদের সমর্থন নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে'—কথা দুটো এক নয়। আসলে ইন্দিরাজী তাঁর একান্ত কাছের লোক বলে পবিচিত কয়েকজন মন্ত্রীকেই শুধু ব্যাপারটা বলেছিলেন, সকলকে নয়।

সকলকে জানাবার জন্য বৈঠকে ডাকা হলো পরদিন ছাব্বিশে জুন। বৈঠকে আগের দিন যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে, তার কথা সদস্যদের জানানো হলো।

উপস্থিত সদস্যদের বেশির ভাগই, কথাটা শুনে মনে মনে হাসলেন। কারণ, ততোক্ষণে তারা এ খবব রেডিও এবং সংবাদপত্র মারফত জেনে গেছেন।

তারা জেনে গেলেও জনতাকে এ খবরটা ভালো করে জানিয়ে দেওয়াটা ইন্দিরা গান্ধী নিজের কর্তব্য বলে মনে করলেন। বিদ্যাচরণ শুক্লা তৈরি হযেই ছিলেন। ততোদিনে গোয়েবেলসীয় কায়দাকানুন তাঁর ভালো করেই রপ্ত হয়ে গেছে। তাই হুকুম পেয়েই চালু করে দিলেন 'হিজ মাস্টার্স ভয়েজ।' দেশের লোক জানলো, জয়প্রকাশজী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে উলটে দেবার জন্য বিদেশী শক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। অথচ আসল সত্য যা, অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী নিজেই জোর করে ক্ষমতায় থাকার জন্য এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে নতুন সরকার গঠনের পথে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিদেশী শক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

হয়েছিলেন—তা প্রচারের প্রবল ডঙ্কানিনাদে চাপা পড়ে গেলো। জগজীবনের ভয়ে যে জরুরী অবস্থা চালু করা হলো, প্রচারের মাহাত্মে সেটার দায় গিয়ে চাপলো জয়প্রকাশের ঘাড়ে।

প্রথম আতঙ্কের ধাক্কায় সারাটা দেশকে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলা হলো। এবার শুরু হলো কাজ গুছোনোর পালা।

সঞ্জয় গান্ধী ছ মাস ব্যাপী প্রতিমুহূর্তের চিন্তার শ্রম দিয়ে যে স্বপ্নের মন্দির রচনা করে চলেছিলেন এবার সেই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের শুভলগ্ন এলো। কমল নাথ 'দোস্ত'-এর 'ডাক' পেয়েই হাজির হলেন 'তোষামোদখানায়।'

শতবাবুর সঙ্গে আগে থাকতে কথা হয়েই ছিলো, সুতরাং কাজ শুরু হতে দেরি হলো না। অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক দিয়ে প্রিয়রঞ্জন দাশ-মুন্সীর কাছে প্রস্তাব পাঠানো হলো: 'আপনি পদত্যাগ করুন।' কিন্তু প্রিয়রঞ্জন পদত্যাগ করতে অস্বীকার করলেন।

প্রিয়রঞ্জন চেষ্টা করলেন 'মাতাজী'র সঙ্গে যোগাযোগের, কিন্তু 'মাতাজী' রাজি হলেন না। প্রিয়রঞ্জন বুঝলেন, এখন আর তিনি মাতাজীর কাছে 'প্রিয়' নন, সেখানে আর একজন দাঁড়িয়ে আছে।

অতি উৎসাহে একদিন প্রিয়রঞ্জন ইন্দিরাজীর 'প্রিয়তম' লোক হওয়ার বাসনায় তাঁকে 'মাতাজী' ডাকা শুরু করেছিলেন। সেদিন ইন্দিরাজীরও তাঁকে দরকার ছিলো, তাই তিনিও তাঁকে 'প্রিয়, প্রিয়' বলে ডাকতেন। কারণ তখন 'প্রিয়'কে না হলে পশ্চিমবাংলায় সি. পি. এমকে ঠাণ্ডা করা যাচ্ছিলো না, 'প্রিয়'কে না হলে দেবী চট্টোপাধ্যায়ের তৈরি 'রিগিং'-এর পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হচ্ছিলো না। কিন্তু এখন তো আর সেদিন নেই। এখন তাঁর পাশে সঞ্জয় আছে, আছে সঞ্জয়ের প্রাণের দোস্ত কমল নাথ। অতএব হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও 'প্রিয়'র পক্ষে আর 'মাতাজী'র দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়।

মাতাজীর দর্শন না পেয়ে বিচলিত প্রিয়রঞ্জন ছুটে গেলেন বরুয়া

সাহেবের কাছে। বললেন, 'আপনি ঐ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন।'

বরুয়া সাহেব রাজি হলেন। তবে প্রতিবাদ বলতে আমরা যা বুঝি তা মোটেই হলো না। শুধু একটা বিবৃতি বের হলো কাগজে। তাতে তিনি বললেন, 'প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীই এখন ভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি, এবং তিনিই এই পদে থাকছেন।'

বিবৃতিটা প্রচারিত হলো কোলকাতা থেকে। দেবকান্তবাবু তখন দিল্লী থেকে আসাম ফিরছেন। আসাম ফিরেই ফোন পেলেন এক নম্বর সফদরজঙ্গ রোড় থেকে, 'ম্যাডাম আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

ফোন পেয়ে ছুটে গেলেন দিল্লীতে। বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দাঁড়ালেন ম্যাডামের সামনে। ম্যাডাম তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ছোট্ট একটা প্রশ্ন করলেন, 'প্রিয়রঞ্জনই যুব কংগ্রেসের সভাপতি থাকছেন এটা আপনি জানলেন কি করে?'

প্রশ্নটা শুনে আমতা আমতা করতে লাগলেন বরুয়া সাহেব। ইন্দিরাজী বললেন, 'যান, তাঁকে গিয়ে বলুন পদত্যাগ করতে।'

নতমস্তকে বেরিয়ে এলেন কংগ্রেস সভাপতি। অফিসে এসে যোগাযোগ করলেন প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে। বললেন, 'আমার কিছু করার নেই; তুমি পদত্যাগ করো।'

কাতর কণ্ঠে প্রিয়রঞ্জন আবেদন জানালেন, 'আমি কি একবার মাতাজীর সঙ্গে দেখা করতে পারি না?'

'না।' ছোট্টো জবাব দিলেন বরুয়া সাহেব, 'তিনি তোমার সাথে দেখা করতে রাজি নন।'

'তা বলে এতো বড়ো একটা অন্যায় মাথা পেতে মেনে নেবো!'

'নিতে হবে; না নিলে চন্দ্রশেখরজীর সাথে গিয়ে থাকতে হবে।'

'আমি তার জন্য মোটেই ভয় পাই না।'

বরুয়া এবার বুঝোবার চেষ্টা করলেন, 'পাগলামি কোরো না, কোথা থেকে কিভাবে ফাঁসিয়ে দেবে তা বুঝতেও পারবে না। বিধান নগরে কংগ্রেস অধিবেশনের খরচ খরচার হিসেবটা এখনো পাকা

হয়নি, অনেকেই তোমার বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের অভিযোগ তুলছে। সুতরাং যা বলছি তাই করো, এখন মাথা গরম করার সময় নয়।'

এবার ব্যাপারটা বোধগম্য হলো প্রিয়রঞ্জনের। নীরবে একটা পদত্যাগপত্র লিখে তার তলে নাম সই করে এগিয়ে দিলেন বরুয়া সাহেবের দিকে। যিনি এক সময় 'আদর্শের জন্য জান দিতেও প্রস্তুত আছি' বলে ঘোষণা করেছিলেন, তিনিই আজ জানের জন্য আদর্শ বিসর্জ্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না।

শতবাবু তৈরি হয়েই ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই পুরাতন ভৃত্য 'কেষ্টা'র মতো বিগলিত বদনে জোরহস্তে গিয়ে হাজির হলেন 'নবাবজাদা'র ঘরে। অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'স্যার, আমি যে নামগুলো দিয়েছিলাম সে কথা মনে আছে তো ?'

প্রশ্ন শুনে সঞ্জয় হাসলেন। বললেন, 'সব মনে আছে। কি যেন নাম বলেছিলেন ? সোমেন মৈত্র না···'

'মিত্র।' কমল নাথ শুধরে দিলেন ভুলটা।

শতবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'না, না, সোমেন নয়, সোমেন নয়, বারিদবরণ দাশ আর পঙ্কজ ব্যানার্জী।'

সঞ্জয় অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, 'কেন, সোমেন নয় কেন ? আপনি তো সব থেকে আগে সোমেনের কথাই বলেছিলেন।'

'তখন বলেছিলাল, তবে এখন আর ও আমাদের সাথে নেই, প্রিয়র দলে গিয়ে ভিড়েছে।'

'ও, তাই বলুন।'

আদর্শবিহীন দলের লোকজন যে যখন তখন মত পালটে ডান, বাম, মধ্য—যে-কোনো দিকে চলে যেতে পারে সে কথা আর সঞ্জয়ের কাছে নতুন কি ! তাই তিন মাস আগে যে লোকটি আদর্শের দোহাই দিয়ে শতবাবুদের সাথে ছিলেন, তিনি যদি এখন একেবারে বিপরীত বিন্দুতে গিয়ে জুটে থাকেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

সেদিন যদি ভুষি কেলেঙ্কারির মামলায় সামান্য সুযোগ লাভের আশায় সোমেন মিত্র প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর সাথে গিয়ে না ভিড়তেন তবে

শতবাবুর চেষ্টায় এবং সঞ্জয়ের আশীর্বাদে সুদীপ ব্যানার্জীর জায়গায় তিনিই হতেন পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের সভাপতি। কিন্তু চালে একটু ভুল হয়ে যাওয়াতে সে শিকেটা আর তাঁর ভাগ্যে ছিঁড়লো না, ছিঁড়লো গিয়ে বারিদবরণ দাশের ভাগ্যে।

সঞ্জয় গান্ধীর চোখের সামান্য ইশারায় বারিদবরণ হলেন পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের সভাপতি আর পঙ্কজ ব্যানার্জী হলেন সর্বভারতীয় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক। রাতারাতি দুজনের 'স্ট্যাটাস' গেলো পালটে। ট্যাক্সির বদলে সর্বসময়ের জন্য বাড়ির দরজায় মোতায়েন হলো শতবাবুর দেওয়া অ্যাম্বাসাডার।

রাজকুমারের অভিষেক হলো রাজনৈতিক মঞ্চে। সঙ্গে এসে জুটলেন শ্রীমতী অম্বিকা সোনি, যিনি 'সখের জন্য' এবং 'বাড়িতে সময় কাটেনা' বলে রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

অম্বিকা সোনির বেনামে সঞ্জয়ের ক্ষমতা-লোলুপ-হস্ত সম্প্রসারণ শুরু হলো যুব কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখায়। দেখতে দেখতে সমগ্র সংগঠন চলে এলো তাঁর হাতের মুঠোয়।

যুব কংগ্রেস পুরোপুরি দখল করতে সঞ্জয়জীর সময় লেগেছিলো প্রায় দু মাস। প্রথম দিকে তাঁর গতি ছিলো ধীর, শেষের দিকে সেটা দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে।

অম্বিকা সোনিকে গদীতে বসাবার কাজ যখন সম্পূর্ণ হলো, তখন যুবরাজ দেশ জয়ে বের হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। দালালরা আগে থাকতে তৈরি হয়েই ছিলো। শুরু হয়ে গেলো প্রচার—তিনি আসছেন, তিনি আসছেন, তিনি আসছেন।

যাদেরকে তিনি গদিতে বসিয়েছিলেন তারা তো বটেই, যারা গদিতে বসতে পারেনি তারাও তখন তাঁর পিছে জুটে গেলো। তাছাড়া আর একদল ছিলো, যাদের সামনে সমস্যা ছিলো যখন তখন গদি চলে যাবার, তারাও গিয়ে হাজির হলো দেবদর্শনে।

পশ্চিম বাংলায় দুটি লোকের মাথায় তখন খাঁড়া ঝুলছিলো। তার একজন দেবী চট্টোপাধ্যায়, অন্যজন প্রণব মুখোপাধ্যায়। দুজনেই ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, এবং দুজনেই নিজেদেরকে একটু বামপন্থী বলে প্রচার করে মানসিক তৃপ্তি লাভ করতেন। কিন্তু সঞ্জয়জী রঙমঞ্চে আবির্ভূত হওয়াতে এঁদের মানসিক তৃপ্তি মাথায় উঠলো—এঁরা তখন নিজেদের জান, মান ও গদি বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

অনেক চেষ্টায় যোগাযোগ হলো যুবরাজের সঙ্গে। এসে হাতে পায়ে ধরে বসলেন দুজনেই। দাসখত লিখে দিলেন, অতীতে যা হয়েছে, হয়েছে, ভবিষ্যতে আর কোনো ভুল হবেনা।

প্রণববাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তেমন গুরুতর ছিলোনা; কারণ, তিনি ইতিপূর্বে যেসব ঘাটে জল খেয়েছিলেন তার কোনোটাকেই কম্যুনিস্ট ঘাট বলা চলেনা! কিন্তু দেবীবাবুকে প্রথম থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে কম্যুনিস্ট অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিলো। ফলে তাঁর পক্ষে নিজের সতীত্ব প্রমাণ করাটা বেশ কঠিন হয়ে উঠলো। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না।

কয়েকদিনের মধ্যেই একটা নতুন পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হলেন যুবরাজের দরবারে। বললেন, যদি কম্যুনিস্টদের একেবারে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিতে চান তবে আমি আপনাকে একটা রাস্তা বাতলাতে পারি।

সঞ্জয় এটাই চাইছিলেন, তাই সুযোগটাকে কাজে লাগালেন। আবার দেবীবাবুও চাইছিলেন যেন-তেন প্রকারে মন্ত্রীত্বের গদিটাকে দখলে রাখতে তাই নিজেকে সঞ্জয়ের কাজে লাগিয়ে দিলেন।

তৈরি হলো ব্লু-প্রিন্ট: কিভাবে কংগ্রেসের মধ্য থেকে কম্যুনিস্ট অনুপ্রবেশকারীদের বার করে দেওয়া হবে। এতোদিনের কম্যুনিস্ট-দরদী দেবী চট্টোপাধ্যায় রাতারাতি কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষীতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন।

এদেশের ইতিহাসে যা আগে কখনো হয়নি এবার তাই হলো। সরকারী কোনো পদমর্যাদা না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর পুত্র হওয়ার সুবাদেই সঞ্জয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিমানে করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়া আসা শুরু করলেন। বিভিন্ন জায়গায় হেলিকপটারও

মজুদ রইলো ছোটো ছোটো সফরগুলোতে তাঁকে মদদ জোগাবার জন্য।

দেখতে দেখতে যুব কংগ্রেস যেন ফুলে-ফলে-পাতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। যুব কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার জন্য সারাদেশের যুব সমাজের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। প্রত্যেকের মনেই তখন কিছু একটা পাওয়ার নেশা। চাকরি, মিনিবাসের লাইসেন্স, ট্রাকের পারমিট, রেশন দোকানের লাইসেন্স, সরকারী ফ্ল্যাট, দোকান ইত্যাদি কিছু না কিছু একটা সবার চাই-ই। এক বছরের মধ্যে এই চানেওয়ালাদের সংখ্যা দাঁড়ালো বাহান্ন লক্ষে। সারা ভারতব্যাপী বাহান্ন লক্ষ যুবক এসে নাম লেখালো যুব কংগ্রেসের খাতায়। এ হিসেব কোনো অনুমানের ওপর নির্ভরশীল নয়—ভারতীয় যুব কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকেই বিবৃতি দিয়ে এই বাহান্ন লক্ষ সদস্য সংখ্যার কথা বলা হয়েছে।

ভারতবর্ষের মানুষ ইতিপূর্বে এমন অদ্ভুত ঘটনা স্বচক্ষে দেখা তো দূরে থাক কানেও শোনেনি। বাহান্ন লক্ষ যুবক এসে একটি সংগঠনে নাম লিখিয়েছে শুধুমাত্র দেশসেবার উদ্দেশ্যে একথা নিশ্চয় কোনো পাগলেও বিশ্বাস করবে না। সুতরাং পাগলেও যা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করবে তা কোনো সুস্থ লোকের পক্ষে কিছুতেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

আসলে কংগ্রেসের চিরকালের যা রাজনীতি," অর্থাৎ কিছু না কিছু পাইয়ে দেওয়া হবেই—সেই বিশ্বাসই এই হুড়োহুড়ির পেছনে কাজ করছিলো। প্রত্যেকেই মনে মনে ভাবছিলো, কংগ্রেসে বুড়োরা গুছোচ্ছে, সুতরাং যুব কংগ্রেসে নিশ্চয় আমরা গুছোতে পারবো। এই আশা যুবকদের মনে তখন এমন প্রবল আকার ধারণ করেছিলো যে যুব কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার জন্য দিল্লীর এক একটা দোকানের সামনে বিরাট লাইন পড়ে গিয়েছিলো।

যুব কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার জন্য দোকানের সামনে লাইন দেওয়ার কথা শুনে নিশ্চয় কোনো কোনো পাঠক বেশ আশ্চর্যান্বিত হবেন। কিন্তু কথাটা সত্যি। পঁচাত্তর সালের শেষাশেষি এবং ছিয়াত্তরের প্রথম দিকে যুব কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার জন্য সুযোগসন্ধানী মানুষদের মধ্যে এমন হুড়োহুড়ি পড়ে যায় যে যুব কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকে সুষ্ঠুভাবে সদস্য

হওয়ার আবেদনপত্র বিলি করা এবং তা গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন ঠিক হয়, দিল্লীতে বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি নির্দিষ্ট দোকান থেকে সদস্য হওয়ার আবেদনপত্র বিলি এবং গ্রহণ করা হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দোকান ঠিক করার কাজ শুরু হয়। এবং শোনা যায়, সে ব্যাপারেও নাকি দুর্নীতি আরম্ভ হয়। কারণ, অনেক দোকানদারই এই সুযোগ গ্রহণের জন্য যুব কংগ্রেসের সদর দপ্তরে ঘোরাঘুরি করছিলো। কেননা, তারা জানতো, সদস্যপত্র বিলির সুযোগ পেলে তাদের দোকানের বিক্রি যেমন বাড়বে, তেমনি বিনে পয়সায় কিছুটা পাবলিসিটিও হয়ে যাবে।

যুব কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে যুবকদের মধ্যে এই বিপুল উৎসাহ দেখে সঞ্জয় গান্ধী একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়লেন। তখন তিনি কি করতে যে কি করবেন তা যেন আর ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। খুশিতে ডগমগ করতে লাগলেন, ক্ষমতা লাভের খোয়াবে মশগুল হয়ে রইলেন।

দালালরা তৈরি হয়েই ছিলো, তারা এবার কাজে নেমে পড়লো। বোম্বে থেকে হাওয়াই জাহাজে উড়ে এলেন খুশবন্ত সিং—ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক। সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করে বেশ নরম নরম, পেলব পেলব প্রশ্ন করলেন এক গাদা। সঞ্জয়জীও তেমনি মধুর মধুর, ভালো ভালো উত্তর দিলেন সেইসব প্রশ্নের। প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ক্যামেরাম্যানের ফ্লাস জ্বলে উঠতে লাগলো মুহুর্মুহুঃ। তারপর সেগুলোতে কালার টাচ লাগলো ; এবং এক সপ্তাহের মধ্যে কালার ট্রান্সফারেন্সি নিয়ে ছবিগুলো ব্লক হয়ে ছেপে বের হলো বাজারে, সঙ্গে রইলো খুশবন্ত সিংয়ের ইন্টারভিউ। ভারতের শিক্ষিত সমাজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, একজন শিক্ষিত লোক, যিনি নিজেকে বিবেকবান, গণতন্ত্রী এবং সৎ বলে জাহির করেন তিনি এমন একজন ব্যক্তির প্রশংসার পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন যিনি সারাজীবনে সততার ধার কাছ দিয়েও যাননি, বিবেকের পথও মারাননি এবং গণতন্ত্রের সর্বনিম্ন শর্তটাও মেনে চলতে রাজি নন। সুতরাং তখনি সবার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, এদেশে এক দল

দুর্যোগের দিন ঘনিয়ে আসছে।

জরুরী অবস্থা চালু হওয়ার আগে সারা দেশের মানুষ সঞ্জয় গান্ধীকে মাত্র দুটি পরিচয়েই চিনতো। এক, তিনি প্রধানমন্ত্রীর পুত্র। দুই, তিনি মারুতি কেলেঙ্কারির নায়ক।

প্রধানমন্ত্রীর পুত্র হিসেবে তাঁর যে-সব কীর্তি সে সম্পর্কে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে বোধ করি না। দেরাদূন স্কুলে থাকাকালীন তিনি পরাশুনোর ব্যাপারে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তার উল্লেখ না করাই মনে হয় শালীনতা হবে। তবে এই প্রসঙ্গে পাঠকদের দিল্লীতে চালু একটা জোক শোনাবার লোভ সামলাতে পারছি না।

এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে প্রশ্ন করছে, 'আচ্ছা, ইন্দিরাজী তো মোট কুড়ি দফা কার্যসূচী ঘোষণা করেছেন, কিন্তু সঞ্জয়জী পাঁচ দফা ঘোষণা করেই থেমে গেলেন কেন?'

বন্ধুটি উত্তর দিলো, 'সঞ্জয়জী এক থেকে পাঁচ পর্যন্তই গুণতে পারেন, তার পরের সিরিয়ালটা তাঁর জানা নেই।'

দেরাদুনের তীর্থযাত্রায় যখন কোনো মোক্ষলাভ ঘটলো না, তখন মা একদিন তাঁর পুত্রের মধ্যে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন স্যার টমাস আলভা এডিশনের মতো মৌলিক সৃজনী প্রতিভা। সুতরাং স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসার জন্য স্কুলের প্রিন্সিপাল বারবার যে তাগাদাপত্র পাঠাচ্ছিলেন তার সম্মান রক্ষিত হলো। মা ছেলেকে স্কুলের নাম কাটিয়ে বাড়িতে নিয়ে এলেন। ঠিক হলো, তাঁকে পাঠানো হবে বিলেতে। সেখানে সে একদিন রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে'র মতোই অসাধারণ হয়ে উদ্ভাসিত হবে ইউরোপের বিদ্বজ্জন সভাতে। তাঁর নামে জয়ধ্বনি উঠবে রয়াল সোসাইটির প্রেক্ষাগৃহে।

আধুনিক টমাস আলভা এডিশন এডিশনের দেশে গিয়েও আবার সেই পুনর্মূষিক ভবঃতেই পরিণত হলেন। সেখান থেকেও আসা শুরু হলো চিঠির পর চিঠি। অবশেষে মাতৃস্নেহে বিগলিত মাতৃদেবী ছেলেকে শিক্ষানবিসি হিসেবে ভর্তি করে দিলেন বিখ্যাত মোটর তৈরির কারখানা রোলস্ রয়েস কোম্পানীতে।

মৌলিক প্রতিভা দেখাবার 'সুযোগ পেয়ে ছেলে আনন্দে একেবারে উছলে উঠতে লাগলেন। প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে 'শিক্ষানবিসি' চালিয়ে গেলেন, তার সাথে অবসর সময়ে 'চারশোবিশি' ব্যাপারটাও রপ্ত করে নিলেন।

এবার এলো দেশে ফেরার পালা। রটনা করা হলো, সঞ্জয় তাঁর শিক্ষানবিসিকাল শেষ করে দেশে ফিরে আসছেন। কিন্তু আসল সত্যটা ছিলো অন্য। সঞ্জয়জীকে রোলস্ রয়েস কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ 'শিক্ষা গ্রহণের অযোগ্য' ঘোষণা করে কোম্পানী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে বাধ্য হয়েই দেশে ফিরে আসতে হচ্ছিলো।

দেশে ফিরে সঞ্জয়জীর প্রথম কীর্তি কি তা জানার জন্য পাঠকদের মনে নিশ্চয় খুব কৌতূহল হচ্ছে। তাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এখানে সেই কীর্তি কাহিনীটি বর্ণনা করা প্রয়োজন বলে বোধ করছি।

দেশে ফিরে 'দেশ গৌরব' প্রথম যে গৌরবজনক কাজটি করলেন তা হলো একটি মোটর গাড়ি চুরি। পাঠক হয়তো ভাবতে পারেন মোটর গাড়ি তৈরি করার জন্য একটি মোটর গাড়ির নমুনা দরকার ছিলো বলেই হয়তো ভদ্রলোক গাড়িটি চুরি করেছিলেন। কিন্তু না, আমি দুঃখিত, সদাশয় পাঠককে এক্ষেত্রে আমাকে নিরাশ করতেই হচ্ছে।

ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে :

জনৈক ভদ্রলোক দিল্লীর একটি জনবহুল এলাকায় নিজের গাড়িটি রেখে কিছুক্ষণের জন্য কোনো কাজে গিয়েছিলেন। সেই এলাকাতেই তখন একটি 'বার'-এ বসে সঞ্জয়জী তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ভগবান শ্রী রামের নামাঙ্কিত 'রাম' নামক কারণসুধা পান করছিলেন। চরিত্রগত শিথিলতার কারণে সুধাপানটা সেদিন একটু বেশি হয়ে গিয়েছিলো। তাই পানকারীদের মধ্যে কেউই নিজেকে সংযত রাখতে পারছিলেন না, প্রত্যেকেরই পা টলমল করছিলো।

'বার' থেকে রাস্তায় বার হয়ে এসে একজন আর একজনের কাঁধে ভর রেখে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সময় তখন পড়ন্ত সন্ধ্যা, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকেরই চোখের সামনে সর্ষে ফুল দুলতে লাগলো।

বর্তমান প্রতিবেদকের 'রাম' পানের 'আরাম' সম্পর্কে কোনোরকম বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকাতে সম্ভবতঃ পরিস্থিতির 'উচ্ছল বর্ণনা' দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণে প্রতিবেদক পাঠকের কাছে ক্ষমা চাইছেন। যারা এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ, আশা করি তাদের মধ্য থেকে কেউ সেই সময়টুকুর অভিজ্ঞতা এবং আনন্দোপলব্ধির যথাযথ বর্ণনা দিয়ে পত্রান্তরে প্রবন্ধ লিখে কৌতূহলী পাঠকদের কৌতূহল মেটাতে সক্ষম হবেন।

জানিনা, 'রাম' পান করলেই লোকের গাড়ি চুরির নেশা হয় কিনা, কিংবা গাড়ি চুরির নেশা জাগলেই লোকে 'রাম' পান করে কিনা, অথবা গাড়ি চুরি করার জন্য সাহস সঞ্চয়ের নিমিত্ত 'রাম' পান করাটা একান্ত জরুরী কিনা। কারণ, অতি বিনয়ের সঙ্গেই আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, এই ক্ষুদ্র জীবনটুকুকে ধন্য করে তোলার জন্য 'কারো গাড়ি চুরি করাটা দরকার' বলে কখনো আমার মনে হয়নি। সুতরাং ঠিক কি পরিস্থিতিতে লোক গাড়ি চুরি করে, কিংবা অন্য কোনো সামান্য বস্তু চুরি করার চিন্তা মাথায় আসে তা আমার পক্ষে যথাযথ বলা সম্ভব নয়।

সঞ্জয়জীরও মাথায় সেদিন গাড়ি চুরি করার পরিকল্পনাটা কেন এলো কিংবা কি পদ্ধতিতে তিনি গাড়িটি চুরি করলেন তা বলতে পারবো না, তবে গাড়ি চুরি করে তিনি কি করলেন সেটা বলতে পারি।

গাড়িটি চুরি করে তিনি যাত্রা করলেন প্রমোদ বিহারে। সঙ্গে তিনজন 'রামাক্রান্ত' বন্ধু। কিছুটা পথ যাওয়ার পর দেখা গেলো গাড়িতে পেট্রোল নেই তেমন। সুতরাং নিকটবর্তী পেট্রোল পাম্পে গিয়ে হাজির হলেন প্রধানমন্ত্রী-তনয়। হুকুম দিলেন গাড়িতে পেট্রোল ভরে দেবার।

নির্দেশ পেয়ে পেট্রোল ভরে দিলো পেট্রোল-বয়। তারপর বিল এগিয়ে ধরলো সঞ্জয়জীর সামনে।

মায়ের মতোই হঠাৎ হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার ব্যারাম আছে পুত্রের। বিল দেখে তিনি রেগে গেলেন। বললেন, 'বদতমিজি মাত করো।'

অবাক হলো পেট্রোল বয়। বললো, 'ইসমে বদতমিজি ক্যা হুয়া জী?'

শুরু হলো তর্ক। মালিক বেরিয়ে এলেন গুমটি থেকে। সঞ্জয়জীর

চাঁদবদনটি দেখেই চিনতে পারলেন তিনি—আর কিছু বললেন না। গণতন্ত্রের নতুন সম্রাজ্ঞীর পুত্র সগর্বে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন প্রমোদ বিহারে। পেছনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন পেট্রোল পাম্পের মালিক আর তার কর্মচারীটি।

এ খবর কেউ জানতে পারতো না, যদি না আর একটি ঘটনা ঘটতো।

রামের আক্রমণে চার বন্ধুই এমন কাহিল হয়ে পড়েছিলেন যে কেউ-ই নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না। সঞ্জয়জীরও সেই অবস্থা। গাড়ি ছুটে চলেছে দ্রুতগতিতে কিন্তু স্টিয়ারিংকে কিছুতেই স্বস্থানে রাখা যাচ্ছে না। ক্রমাগত সেটা কাঁপছে, কিংবা আর একটু পরিষ্কার করে বললে বলা যায় চালকের শিথিল হাতের অবাধ্য স্খলনে সে বাধ্য হচ্ছে কেঁপে কেঁপে উঠতে।

প্রথম প্রথম কম্পন ছিলো মৃদু, তারপর হলো দ্রুত, শেষে দ্রুততর। আর তখনি ঘটলো সেই ঘটনাটি—যার ফলে পাঠক এ কাহিনী জানার সুযোগ পেলেন। গাড়িটি গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো আর একটি গাড়ির ওপর; সংঘটিত হলো একটি বড়ো রকমের দুর্ঘটনা।

পুলিশ এলো, এলো ব্রেক ভ্যান। গাড়ির চালক ও সওয়ারি—সবশুদ্ধ নিয়ে যাওয়া হলো থানায়। ডাইরী লেখা হলো: 'মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছে।' তারপর চালকের লাইসেন্স দেখতে চাওয়া হলো। জবাব এলো: 'নেই।' বলা হলো: 'গাড়ির ব্লু বুক দেখান।' তখনো জবাব এলো: 'নেই।'

অবাক হলেন অফিসার। জানতে চাইলেন: 'গাড়ির মালিক কে?'

জবাব সেই এক: 'জানিনা।'

'জানেন না মানে! গাড়িটা চালাচ্ছেন আপনি, অথচ গাড়ির মালিক কে তা বলতে পারছেন না?'

'না।'

ব্যাপারটা বুঝলেন অফিসার। ডায়রীতে লিখলেন: 'গাড়িটি চুরি করা হয়েছে।'

ততোক্ষণে খবর পৌঁছে গেছে যথাযথ জায়গায়। ফোন এলো: 'ছেড়ে দিন।'

ছাড়া পেয়ে রাজকুমার ফিরে গেলেন নন্দন কাননে।

কেলেঙ্কারির কথা যাতে বাইরে জানাজানি না হয় তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করা হলো। পরদিনই সঞ্জয়কে বিশেষ বিমানযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হলো কাশ্মীরে।

তা সত্ত্বেও সবকিছু জানাজানি হয়ে গেলো। বিরোধীপক্ষ থেকে নোটিশ দেওয়া হলো লোকসভায় ঘটনার ব্যাপারে আলোচনার দাবি জানিয়ে।

ততোক্ষণে 'কেস' সাজিয়ে ফেলা হয়েছে। সরকারী তরফে বলা হলো: এ শুধু চরিত্র হননের চেষ্টা। সঞ্জয় ঘটনার দিন দিল্লীতেই ছিলো না। অন্য কারো দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপাবার প্রচেষ্টা চলেছে।

এই হচ্ছেন সঞ্জয় গান্ধী, এই হচ্ছেন ইন্দিরাজীর 'দুঃসাহসী সংগ্রামী যুবক।'

যুবকটি কেলেঙ্কারির বাজারে ছোটোবেলা থেকেই ঘোরাফেরা করে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিলেন ইতিমধ্যে। তাই ঠিক করলেন, এবার বড়ো কোনো কেলেঙ্কারি শুরু করবেন!

এই বড়ো কেলেঙ্কারির হাতেখড়ি শুরু হলো উনিশ শো সত্তর সালে, দিল্লীর এক কুখ্যাত এলাকায়, এক কুখ্যাত গুণ্ডার হাতে।

গুণ্ডাটির নাম অর্জন দাশ। পেশা ছিলো চোরাই জিনিসের কেনা বেচা, বাইরে ভড়ং ছিলো মোটর গাড়ির মেরামতি। সে কারণে একটা গ্যারেজও বানিয়েছিলো, তবে সেখানে সাধারণত কোনো ভদ্রলোকের গাড়ি মেরামতির জন্য আসতো না। যা আসতো, তাকে স্থানীয় লোকে বলতো 'দু নম্বরী ব্যাপার।'

কথায় আছে রতনে রতন চেনে। এক্ষেত্রেও হয়েছিলো তাই। সঞ্জয় গান্ধীর মনে নাকি ছোটোবেলা থেকেই মোটর গাড়ি তৈরির সখ জেগেছিলো; সে উদ্দেশ্যে তিনি একটা মোটর তৈরির কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাও মনে মনে ছকে রেখেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে

তা আর হয়ে উঠছিলো না। তাই মনের দুঃখে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। সব সময় তাঁর মন ছটফট করতো কারখানা খোলার চিন্তায়।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখা হয়ে গেলো অর্জন দাসের সঙ্গে ; কিংবা বলা যেতে পারে খুঁজতে খুঁজতে তিনি আবিষ্কার করলেন অর্জন দাশকে। প্রস্তাব দিলেন, 'তুমি যদি আমাকে তোমার কারখানায় কাজ করার স্বাধীন সুযোগ দাও তবে আমিও তোমাকে কোনো কোনো ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি।'

অর্জন দাশের সামনে যেন আকাশ থেকে পূর্ণিমার ভরা চাঁদটা তরতর করে নেমে এলো। সে যা স্বপ্নেও ভাবেনি, তাই বাস্তবে ঘটলো। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর পুত্র এসে তার কাছে সাহায্য চাইছে !

আর কোনো কথা বলতে হলো না, এক কথায় রাজি হয়ে গেলো অর্জন দাশ। শুরু হলো সঞ্জয়ের নতুন জীবন—তিনি সেই টিনের চালের তলে বসে ভবিষ্যতের জনতা গাড়ির নকশা বানাতে আরম্ভ করলেন।

নকশা বানাবার কাজ, কিংবা নকশা দেখাবার কাজ চললো প্রায় বছরখানেক ধরে। তারপর ঘোষণা করা হলো সঞ্জয়জী একটি মোটর গাড়ি তৈরির কারখানা খুলবেন।

তাঁর সারা বছরের আয়ের হিসাব দাখিল করেছিলেন ৭৪৮ টাকা। পরের বছর সেই লোকটিই ঘোষণা করে বললেন অচিরেই তিনি একটি মোটর গাড়ি তৈরির কারখানা খুলবেন ! কী করে যে এ ভেল্কি সম্ভব হলো তা তখন কারো মাথায়-ই এলো না।

অর্জন দাস সঞ্জয় গান্ধীকে যে 'সেবা' করেছিলো তার প্রতিদান সে ততোদিনে পেতে শুরু করেছে। যে লোকটি চিরদিন নিষিদ্ধ পল্লীতে নিষিদ্ধ লোকেদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতো, দেখা গেলো সে-ই রাতারাতি নেতা হয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস দলে একটার পর একটা উচ্চপদে তার অধিষ্ঠান ঘটছে। শেষে সে দিল্লী মেট্রোপলিটন কাউন্সিলের সদস্য-পদেও মনোনীত হলো।

অনেককে আজ বলতে শুনি সঞ্জয় গান্ধী যে-সব কুকর্ম করেছেন

তার জন্য তার মা দায়ী নন—তিনি সে সব ব্যাপার জানতেনই না। অনেকেই ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন এই বলে যে, ছেলের পাপে মা ডুবলেন। তাদের কাছে শুধু একটি বিনীত প্রশ্ন : অর্জন দাশকে নিয়ে এই যে ছোট্ট ঘটনাটুক—এটা সেদিন কিভাবে সম্ভব হয়েছিলো? সেদিন তো জরুরী অবস্থা ছিলো না, সেদিন তো অন্তত সঞ্জয় দেশনেতা ছিলেন না। কিংবা তখনো তো তিনি কংগ্রেসের 'পালের হাওয়া' কেড়ে নেননি। তাহলে সেদিন কে তাঁর পেছনে থেকে কলকাঠি নেড়েছিলেন? কে অর্জন দাশের মতো একজন গুণ্ডাকে দিল্লী মেট্রোপলিটন কাউন্সিলের সদস্যপদ পর্যন্ত পৌঁছোতে সাহায্য করেছিলেন?

সবই কি ছেলের দোষ? তখন তো সঞ্জয়ের বয়স মাত্র তেইশ। তাঁর তখন কি এমন ক্ষমতা ছিলো যার জোরে তিনি অর্জন দাশকে 'গুণ্ডা' থেকে 'নেতা' বানিয়ে দিলেন? কে ছিলো তাঁর খুঁটি? কে তাঁকে পেছন থেকে মদদ যোগাচ্ছিলেন? বাবুজী ঠিকই বলেছেন, 'আই ডোণ্ট হোল্ড সঞ্জয় রেসপনসিবল। দ্যা রেসপনসিবিলিটি উইল সার্টেনলি হ্যাব টু বি ফিক্সড্।'

যে লোকটি সারা বছরের চেষ্টায় মাত্র ৭৪৮ টাকার বেশি রোজগার করতে পারেননি, অর্থাৎ যার যোগ্যতা ছিলো মাসে মাত্র ৬০ টাকা কামাবার, তিনি যে কোন সাহসে এবং কী ভরসায় একটা মোটর গাড়ির কারখানা খোলার কথা চিন্তা করতে পারেন তা কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষে ভেবে বের করা সম্ভব নয়।

ইন্দিরাজী পার্লামেণ্টে অন্তত পঞ্চাশবার বলেছেন যে তাঁর ছেলের যোগ্যতা আছে বলেই সে মোটর গাড়ির কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কথাটা যে কতো দূর সত্যি, তা, ইতিমধ্যে সামান্য যে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি তা থেকেই সম্ভবতঃ পাঠকেরা বুঝে ফেলেছেন। এবার, এই 'যোগ্যতা' কিভাবে বাস্তবায়িত হলো তার কিছু নমুনা দাখিল করি।

মারুতি লিমিটেড আইনগতভাবে স্থাপিত হয় ১৯৭১ সালের ৪ জুন। রেজিস্টার অব কোম্পানিজের কাছে যে এফিডেভিট দাখিল করা হয়

তাতে স্পষ্ট করে এ কথা বলা হয়েছিলো, 'যে-কাউকে কোম্পানীর ডাইরেক্টর হতে হলে কমপক্ষে ২৫টি শেয়ার কিনতেই হবে।' কিন্তু কয়েকদিন পরেই ডাইরেক্টররা একটি বিশেষ সভায় মিলিত হয়ে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, 'এই কোম্পানীর ডাইরেক্টর হতে হলে ২৫টি শেয়ার কেনার কোনো দরকার নেই, যে কেউ শেয়ার না কিনেই কোম্পানীর ডাইরেক্টর হতে পারবে।' প্রথম সিদ্ধান্ত এবং দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র ১ মাস ১৩ দিন। হঠাৎ এই সময়টুকুর মধ্যে কি এমন কাণ্ড ঘটলো যার জন্য কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের সভায় 'একটি শেয়ার কিনেও যে-লোক কোম্পানীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নন' তাকেও কোম্পানীর ডাইরেক্টরমণ্ডলীতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলো? এখানে শুধু এটুকুই উল্লেখনীয় যে শ্রীমান সঞ্জয় গান্ধী ১০০ টাকা দিয়ে কোম্পানীর মাত্র একটি শেয়ারই কিনেছিলেন।

আইনগতভাবে কোম্পানী স্থাপিত হওয়ার অনেক আগেই মারুতি লিমিটেড কারখানা স্থাপনের জন্য সরকারের কাছ থেকে 'লেটার অব ইনটেন্ট' পেয়ে গিয়েছিলো। 'লেটার অব ইনটেন্ট' জারির তারিখ ১৯১৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ আইনতঃ কোম্পানী স্থাপিত হওয়ার ৮ মাস ৫ দিন আগেই কোম্পানীর নামে 'লেটার অব ইনটেন্ট' দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। এ যেন অনেকটা রাম না জন্মাতেই রামের কাহিনীর মতো।

'লেটার অব ইনটেন্ট' জারির ব্যাপারটা নিয়েও বেশ ঝামেলা পাকিয়ে গিয়েছিলো। মারুতিকে অনুমতি দেবার প্রস্তাব আসার অনেক আগেই শ্রীমতী গান্ধীর সরকার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, 'রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগে "জনতা গাড়ি" তৈরির একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।' এ সম্পর্কে সে-বছরই, অর্থাৎ ১৯১৩ সালেই মন্ত্রীসভার বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো। কিন্তু সে প্রস্তাবকে লঙ্ঘন করে শ্রীমতী গান্ধী মারুতি লিমিটেডকে ছোটো গাড়ি তৈরির লাইসেন্স দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেন দুজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এন. ভি. গ্যাডগিল এবং মৌনুল হক চৌধুরী। ফলস্বরূপ কিছুদিন পরে

এঁরা মন্ত্রীসভা থেকে ছাঁটাই হয়ে গেলেন'।

'লেটার অব ইনটেণ্ট' পাওয়ার পর শুরু হলো কারখানা স্থাপনের জায়গা খোঁজা। এ ব্যাপারে সঞ্জয়জীকে খুব একটা কষ্ট করতে হলো না—তাঁর মুশকিল আসান করতে এগিয়ে এলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল।

বংশীলাল অনেকদিন ধরেই মওকা খুঁজছিলেন ইন্দিরাজীর একটু কাছে ঘেঁষার; কিন্তু তেমন সুযোগ আর যোগাযোগ কিছুতেই ঘটে উঠছিলো না। অবশেষে নেহেরু পরিবারের অনেকদিনের বন্ধু মহম্মদ ইউনুস একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। সোজাসুজি মায়ের সাথে যোগাযোগ না হলেও 'বেটা'র সাথে বংশীলালের যোগাযোগ ঘটলো। বংশীলাল 'বেটা'কে আশ্বাস দিলেন, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই, আমি তোমাকে সব ব্যবস্থা করে দেবো।'

যে কথা সেই কাজ। দিল্লী থেকে চণ্ডীগড় ফিরেই বংশীলালজী হুকুম দিলেন জায়গা খোঁজার। চ্যালা-চামুণ্ডা-মোসায়েবের দল আদা নুন খেয়ে নেমে পড়লো জায়গা খুঁজতে। শেষে একটা পছন্দসই জায়গা তারা খুঁজে বেরও করলো।

জায়গাটা দিল্লীর পালাম বিমানঘাঁটি থেকে কিছুটা দূরে, দিল্লী গুরগাঁও রোডের ওপর। প্রধানমন্ত্রী তনয়ের পছন্দ হলো সেটা; তিনি বংশীলালকে গ্রীন সিগন্যাল দিলেন।

সিগন্যাল পেয়ে বংশীলাল গাড়ি চালু করার হুকুম দিলেন। কিন্তু ঝামেলা বাঁধলো প্রতিরক্ষা দপ্তরের একটি নির্দেশ নিয়ে। তাতে বলা হলো, ঐ জমির খুব কাছেই রয়েছে এয়ার ফোর্সের একটি ডিপো। সুতরাং সামরিক বিভাগের এতো কাছে কোনো বেসামরিক সংস্থার কারখানা স্থাপন করতে দেওয়া সম্ভব নয়।

চিঠি চালাচালি চললো বেশ কিছুদিন। ডিপোর কমাণ্ডার তার জোরালো আপত্তিকে এতোটুকু শিথিল করতে রাজি হলেন না। রাজ্য সরকারকে স্পষ্ট বললেন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো কাজে তিনি সম্মতি দিতে পারবেন না।

যাদের খুঁটির জোর আছে তাদের কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব হতে পারেনা। এক্ষেত্রেও তাই হলো। প্রধানমন্ত্রীর পুত্রকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন বিদ্যাচরণ শুক্লা।

শুক্লাজী তখন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তরের মন্ত্রী। যারা ওখানে অসামরিক সংস্থার কারখানা স্থাপনে আপত্তি জানাচ্ছিলো তিনি ছিলেন তাদের ওপরওয়ালা। ফলে যা হবার তাই হলো; জমি অধিগ্রহণের আদেশ জারি হয়ে গেলো।

যে জমি অধিগ্রহণের আদেশ জারি হলো সে জমির উপর দেড় হাজার চাষী পরিবার ঘর বানিয়ে বসবাস করতো। তাদেরকে বলা হলো জায়গা ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু তারা যেতে অস্বীকার করলো, এবং এই বে-আইনী অধিগ্রহণ নোটিশের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে আদালতে মামলা ঠুকে দিলো।

মামলা দায়ের করার চারদিন পর ১৯১৩ সালের ১৫ মার্চ হরিয়ানা রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতে হাজির হয়ে বললেন, 'সরকার তার আদেশ ফেরৎ নিয়ে নিচ্ছে। সুতরাং অনুগ্রহ করে এই মামলা খারিজ করে দিন।'

এভাবে হঠাৎ সরকারের আত্মসমর্পণের পেছনে দুটো কারণ ছিলো। এক, সরকার যে জমি অধিগ্রহণের নোটিশ দিয়েছিলো সেটা বৈধ পদ্ধতিতে দেওয়া হয়নি। সুতরাং তারা বুঝেছিলো, মামলায় তারা হারবেই। কারণ, যে যে কারণে ১৮৯৪ সালের সেনট্রাল একুই-জিশন অ্যাক্টের প্রয়োগ করা চলে তার কোনো কারণই গুরগাঁওয়ের জমি দখলের ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলোনা। অতএব মামলায় হেরে বেইজ্জত হওয়ার আগেই মামলা চুকিয়ে ফেলার জন্য তারা আগ্রহী হয়ে পড়েছিলো।

দুই, সরকার যে মামলায় হারবেই সে ব্যাপারে তারা নিশ্চিন্ত ছিলো, তাই অন্য পথ ধরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঠিক হয়, আকস্মিক-ভাবে চাষীদের ওপর হামলা করে তাদেরকে উঠিয়ে দিয়ে জমি দখল করে নেওয়া হবে। এবং একবার যদি তাদেরকে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়

তাহলে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে—সেক্ষেত্রে সংঘবদ্ধভাবে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা লড়ার ক্ষমতাই তাদের থাকবে না।

যা পরিকল্পনা করা হয়েছিলো, তাই করা হলো।

২৩ মার্চ আকস্মিকভাবে এক সাথে দেড় হাজার চাষীর ঘরে অধিগ্রহণের নোটিশ পৌঁছে দেওয়া হলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হলো তাদের ওপর। জোর করে গুণ্ডারা চাষীদের ভিটে-মাটি ছাড়া করে দিলো। অবশেষে কাজ যখন সম্পূর্ণ হয়ে এলো তখন সরকারী গেজেটে অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হলো। তখন আর অধিগ্রহণ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাবার মতো একটি চাষীও গুরগাঁও রোডের ধারে-কাছে নেই।

অধিগ্রহণপর্ব সমাধা হয়ে গেলে গরিব চাষীদের মন খুশ্ করার জন্য ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলো। বলা হলো, যাদের জমি গেছে তারা একর প্রতি ১১৭৭৬ টাকা ৩২ পয়সা হিসেবে ক্ষতিপূরণ পাবে। সে অনুযায়ী যার যতোটুকু জমি ছিলো তাকে সেই আনুপাতিক পয়সা দেওয়া হবে।

যে জমির দাম একরপ্রতি ১১৭৭৬ টাকা ৩২ পয়সা ধরা হলো তার তখন বাজার মুল্য ৫০ হাজার টাকা। ওই জমি অধিগ্রহণের কিছুদিন আগেই যারা ওই এলাকায় জমি হস্তান্তরিত করেছিলো তারা কেউ কেউ একর প্রতি ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত দর পেয়েছিলো। অথচ হতভাগ্য গরিব চাষীর দল প্রধানমন্ত্রীর পুত্রকে সেই ৬০ হাজার টাকার জমি ১২ হাজার টাকায় বিকিয়ে দিতে বাধ্য হলো।

চাষীদের উচ্ছেদ করে যে জমি দখল করা হয়েছিলো তার মোট পরিমাণ ছিলো ৪২০ একর। অর্থাৎ এক ধাক্কায় বংশীলাল গরিব চাষীদের কাছ থেকে প্রায় ২ কোটি টাকা ছিনিয়ে নিলেন। আর সে ছিনিয়ে নেওয়া টাকার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী-তনয়ের ভাগ্যে জুটলো ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। কারণ দখলীকৃত ৪২০ একর জমির মধ্যে মারুতি লিমিটেড পেলো ২৯৬ একর।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়, আরো অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাহিনী আছে।

গরিব চাষীদের যে সামান্য টাকা দেওয়া হবে হলে আশ্বাস দেওয়া হলো, তাও কিন্তু সাথে সাথে দেওয়ার ব্যবস্থা হলোনা। বলা হলো, দু বছর পরে যে-যার ক্ষতিপূরণের টাকা পাবে। এবং সে টাকাটাও একবারে দেওয়া হবেনা, দেওয়া হবে মোট আঠারোটি কিস্তিতে। 'শিক্ষানবিসি' করতে করতে ভদ্রমহিলাদের ছেলেরা যে কিভাবে 'চারশোবিশি'ও রপ্ত করে ফেলে এ ঘটনাটা তারই একটা উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে চিরকাল ভারতীয় জনতার স্মৃতিপটে জাগরুক থাকবে।

এতো কিছু যখন ঘটে গেলো তখনো কিন্তু মারুতি লিমিটেড স্থাপিতই হয়নি। সুতরাং, চাষীদের দু বছর পরে টাকা দেওয়া হবে বলা ছাড়া তখন আঁর কীর্তিমানদের সামনে কোন পথটাই বা খোলা ছিলো? দেশে সমাজতন্ত্র আনবার ঠিকেদারি নিয়েছিলো যেসব পাগলা-পাগলীর দল, কংগ্রেসকে ভাগ করার সময়, উৎসাহের আতিশয্যে যারা মোরারজীর ছেলে কান্তিভাই শুধুমাত্র একটি কোম্পানীর উচ্চপদে সমাসীন আছেন এই অপরাধে মোরারজীকে ফাঁসি দেবার দাবি জানিয়েছিলো তারাও কিন্তু তখন এতোবড়ো একটা অন্যায় স্বচক্ষে দেখেও সে সম্পর্কে টু শব্দটি পর্যন্ত করলো না। প্রগতির ধ্বজা উড়িয়ে লাল হেডিং ছেপে তিন ভাষায় অগ্নিবর্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন যে বোম্বেওয়ালা ঝানু সাংবাদিক তিনিও কিন্তু সেদিন একবারের জন্যও তাঁর সাপ্তাহিকে এই বিরাট 'ডাকাতি'র নামমাত্র উল্লেখও করেননি। বরং পরবর্তীকালে যখন পার্লামেন্টে বিরোধী পক্ষ ব্যাপারটাকে উত্থাপন করলো তখন 'আই ডোণ্ট নো সন' কলমে সেটাকে নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ তামাসা করতে ভুললেন না।

আগেই বলেছি, বংশীলাল ইন্দিরাজীর এক নম্বর দালালদের একজন হওয়ার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে চলেছিলেন। তাই, সেরকম একটা সুযোগ আসাতে তিনি আর সেটাকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি হলেননা।

প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের জমির সমস্যা মিটিয়ে দেবার পর বংশীলালজী তাঁর অর্থের সমস্যা মেটাবার মহান কর্তব্যে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। শুরু হলো যোগাযোগ।

যোগাযোগের ফল ফলতে দেরী হলোনা। মোহন মেকিনের মালিক ভি. আর. মোহন এবং তস্যপুত্র কপিল মোহন, ন্যাশনাল রেয়নের সুধীর কাপাডিয়া এবং সাগর পুরী, অটোমোবাইল প্রডাক্টস অব ইণ্ডিয়ার এম. এ. চিদাম্বরম, ভারত স্টিল টিউবের রৌণক সিং, সরণ ট্রেডিং কোম্পানীর সি. বি. সরণ এবং বিড়লা, জৈন ও লোহিয়ারা এগিয়ে এলেন প্রধানমন্ত্রীর পুত্রকে টাকা যোগাতে।

দেখতে দেখতে প্রায় দু কোটি টাকার ইকুইটি শেয়ার বিক্রি হয়ে গেলো। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করলেন মাত্র ৯০ জন শেয়ার হোল্ডার। এছাড়া আরো প্রায় ৩ কোটি টাকা আদায় হলো বিভিন্ন ডিলারদের কাছ থেকে।

ইকুইটি শেয়ার যারা কিনেছিলেন তাদের ব্যাপারটা নয় বোধগম্য হয়, কিন্তু যারা ডিলারশীপ নিয়েছিলেন তাদের ব্যাপারটা কি? বলা হয়েছে, ডিলারশীপ গ্রহণে ইচ্ছুক বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকে তিন লক্ষ টাকা করে কোম্পানীকে অগ্রিম দিয়েছিলো।

কথায় আছে, সব লোককে কিছুক্ষণের জন্য বোকা বানানো চলে, কিছু লোককে সর্বক্ষণের জন্য বোকা বানানো যেতে পারে, কিন্তু সব লোককে চিরকালের জন্য বোকা বানানো সম্ভব নয়। অথচ এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সঞ্জয় গান্ধী এবং তাঁর দলবলেরা সব লোককে চিরকালের জন্য বোকা বানাবার মতলব করেছে।

দুনিয়ায় কোন ব্যবসায়ী এমন নির্বোধ আছেন যিনি কোনো বস্তুর অস্তিত্ব বিনাই সে বস্তু বিক্রির উদ্দেশ্যে ঘর থেকে তিন লাখ টাকা বের করে দিয়ে দেবেন? তাদের টাকা কি গাছে ফলে? টাকা কি ঘরে তৈরি হয়?

যে গাড়ির মডেল পর্যন্ত কেউ চোখে দেখেনি, যে গাড়ি তৈরির কারখানা পর্যন্ত তখনো গড়ে ওঠেনি, যে গাড়ির গুণাগুণ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানেনা, যে গাড়ির দাম কি হবে তাও কেউ বলতে পারছেনা, সে গাড়ি বিক্রির ডিলারশীপ নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে এতোই হুড়োহুরি পড়ে গেলো যে তারা ঘর থেকে কড়কড়ে তিন কোটি টাকার

নোট বের করে তুলে দিলেন সঞ্জয়জীর হাতে! এ কি মামদোবাজি?

আসলে ব্যাপারটা তা নয়, অন্য। সারা দেশে চোরাইচালানদার, মুনাফাবাজ, কালোবাজারীর দল কংগ্রেসকে নিয়মিত যে চাঁদা দিতো তারই একটা অংশকে তারা প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের হাতে তুলে দেয় মোটর গাড়ির ডিলারশীপ নেবার নামে। এ কথা হলফ করে বলতে পারি, আজ যদি ঠিক মতো তদন্ত করা হয় তাহলে ওই একশো জন ডিলারের মধ্যে এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে যে-কিনা সরকারকে খুশি করার জন্য কিংবা সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স পারমিট ইত্যাদির সুযোগ পাওয়ার আশা ছাড়া সেদিন সঞ্জয়জীকে একটি পয়সাও দিয়েছিলো। আসলে কংগ্রেসের সুভেনিরে বিজ্ঞাপন ছাপার নাম করে যেভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে, সেভাবেই ডিলারশীপ দেওয়ার নাম করে সঞ্জয়জীও কোটি কোটি টাকা উশুল করে নিয়েছেন। এবং তার পরিবর্তে যাকে যতোটা সুযোগ দেওয়া যায়, দিয়েছেন।

কাদের টাকায় মারুতি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো তার দু একটা ছোটোখাটো নমুনা হাজির করার লোভ সামলাতে পারছিনা। পাঠক এ থেকেই বুঝে নিতে পারবেন ইদানীংকার ভারত ইতিহাসের সব চেয়ে দুর্লভ রত্নটিকে কী-সব রত্নের দল চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছিলো।

বাইরে থেকে উপমা টানবো না, যে ৯০ জন শেয়ার হোল্ডার কোম্পানীর সব ইকুইটি শেয়ার কিনে নিয়েছেন, তাদের মধ্য থেকেই কয়েকজনকে স্যাম্পেল হিসেবে হাজির করবো।

প্রথম স্যাম্পেলটি হচ্ছেন শ্রী বাসুদেও কানোরিয়া। ১৯১৩ সালের ১৮ আগস্ট সি. বি. আই এই রত্নটির বিরুদ্ধে একটি কেস শুরু করে। অভিযোগ, ইনি আমদানিকৃত কিছু দ্রব্যসামগ্রী চোরাবাজারে বিক্রি করে দেন।

দ্বিতীয় নমুনা: শ্রী অরবিন্দ কুমার কিলাচাঁদ। শ্রী কিলাচাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ইনি বিদেশী মুদ্রা আইন লঙ্ঘন করে গোপন পথে প্রচুর টাকা কামিয়েছেন। ১৯১৩ সালের ৯ মে সি. বি. আই এর বিরুদ্ধে

মামলা দাখিল করে। তারপর থেকে ১৯১৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত তার ওপরে মোট ৫৪টি শো-কজ নোটিশ জারি হয়। এর মধ্যে ১৬টি শো-কজ নোটিশের বিচার নিষ্পত্তি ঘটেছে এবং কিলাচাঁদজীকে মোট ২৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫০০ টাকার জরিমানা করা হয়েছে।

তৃতীয় নমুনা : শ্রী রামনিবাস রুইয়া। ইনিও একজন বিদেশী মুদ্রা বিধি লঙ্ঘনকারী। সি. বি. আই ১৯১৩ সালের ২৫ মার্চ এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

চতুর্থ নমুনা : মহম্মদ সৌকত। এর বিরুদ্ধেও অভিযোগ বিদেশী মুদ্রা সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের। সি. বি. আই ১৯১৩ সালের ১৮ অক্টোবর এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করে, এবং সেই মামলার নিষ্পত্তি ঘটে ১৯১৩ সালের ১ জানুয়ারি। বিচারে সৌকত সাহেবকে দেড় হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

পঞ্চম নমুনা : শ্রী প্রহ্লাদারী আগরওয়াল। ১৯১৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ এর বিরুদ্ধে ভারতীয় অপরাধ বিধির বিভিন্ন ধারার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করে। তার মধ্যে ৪২০ ধারাটিও ছিলো।

ষষ্ঠ নমুনা : শ্রী সন্তোষকুমার তুলসান। ১৯১৩ সালের ২৮ জানুয়ারি এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ এর বিরুদ্ধে অপরাধ বিধির বিভিন্ন ধারাসহ মামলা রুজু করে। তাছাড়াও পৃথকভাবে আর একটি মামলা দায়ের করা হয় তহবিল তছরূপের অভিযোগ জানিয়ে।

সপ্তম নমুনা : শ্রী নরেশকুমার তুলসান। ইনিও শ্রী সন্তোষকুমারের সঙ্গে একই মামলায় অভিযুক্ত হন। এর ওপরও তহবিল তছরূপের মামলা দায়ের করা হয়।

অষ্টম নমুনা : শ্রী রাজকুমার শর্মা। ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে এই রাজকুমারটির বিরুদ্ধে ভারতীয় অপরাধ বিধির বিভিন্ন ধারার অভিযোগ এনে আদালতে মামলা দাখিল করে এনফোর্সমেণ্ট ডাইরেক্টরেট।

নবম নমুনা : শ্রী বি. সি. ঝিন্দল। আয়কর বিভাগের অফিসাররা এর ঘরে হানা দিয়ে ৩৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭ শো ৭০ টাকা নগদ এবং

সম্পত্তিতে হস্তগত করেন। এছাড়াও তার গোপন সম্পত্তির পরিমাণ হচ্ছে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ইনি মারুতি কোম্পানীর ১২ হাজার ৫০০টি ইকুইটি শেয়ারের মালিক।

দশম নমুনা : ভারতবর্ষের স্বনামধন্য চোরাচালানকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু বখিয়া। হাজি মস্তান এবং বখিয়ার নাম জানে না এমন লোক আজ ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। চোরাচালান করে এককালের কুলির সর্দার আজ বেশ কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর কোম্পানীর মালিক। বখিয়ার মালিকানাধীন দুটি কোম্পানীর নাম : সুদর্শন ট্রেডিং কোম্পানী এবং প্রেমভাই মঙ্গলবাই তানদে। এই দুটি কোম্পানী মারুতি লিমিটেডের ৪৫ হাজারটি শেয়ার কিনেছে। প্রথমটির নামে কেনা হয়েছে ৩০ হাজার এবং দ্বিতীয়টির নামে কেনা হয়েছে ১৫ হাজার শেয়ার।

এ তো গেলো সব চুনোপুঁটিদের কথা, এবার শুনুন রাঘব-বোয়ালদের কাহিনী।

যতোদূর জানা গেছে মারুতি লিমিটেডের ডাইরেক্টর বোর্ডে ছিলেন মোট আটজন। এদের মধ্যে সঞ্জয় গান্ধী হচ্ছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান। অন্য সাতজন হলেন শ্রী ভি. আর. মোহন, শ্রী রৌণক সিং, শ্রী সি. বি. সরণ, শ্রী এম. এ. চিদাম্বরম, শ্রী এস. এন. কাপাদিয়া, শ্রী বি. সি. ঝিন্দল এবং শ্রী জগদীশ প্রসাদ।

১৯১৩ সালে যে লোকটি রোজগার করেছিলেন মোট ৭৪৮ টাকা, সেই লোকটিই তিন বছর পর ১৯১৩ সালে মারুতি লিমিটেডের পরিচালক হিসেবে কতো টাকা মাইনে পেয়েছিলেন অনুমান করতে পারেন? ৪৮ হাজার টাকা। তার সঙ্গে 'পার্কস' নামের ফাউ হিসেবে পেয়েছিলেন অতিরিক্ত ৩ হাজার টাকা।

ডাইরেক্টরদের মধ্যে কে কি করেন তার পরিচয় পাঠকদের সামনে আগেই রেখেছি। কিন্তু কি কারণে তারা মারুতি লিমিটেডের সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িত করলেন সে সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কিছু বলা হয়নি।

শেয়ার হোল্ডার এবং ডাইরেক্টর—যারা যারাই মারুতির সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িত করেছিলেন তাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা

উদ্দেশ্য ছিলো ; প্রত্যেকেই কিছু না কিছু গুছিয়ে নেবার মতলবে সঞ্জয়জীর সাথে ভাব জমাতে এসেছিলেন। এদের সবার কীর্তিকাহিনী এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গেলে এ-বই মহাভারত হয়ে যাবে। সুতরাং সংক্ষেপে কয়েকজনের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপের বর্ণনা করবো মাত্র।

ভি. আর. মোহনের নাম অনেকেই শুনেছেন আশা করি। ভদ্রলোক ছিলেন মোহন মেকিন ব্রেওয়ারিজের মালিক। মারুতি লিমিটেডে টাকা ঢালার পেছনে তাঁর যে উদ্দেশ্য ছিলো, তা হলো, মোহন মেকিনের মুনাফা বাড়াবার ব্যাপারে সঞ্জয়ের মারফত তাঁর মাতৃদেবীর আশীর্বাদ লাভ। আশার কথা, তিনি সে আশীর্বাদ পেয়েও ছিলেন। মারুতি লিমিটেডে তিনি যতো টাকা লগ্নী করেছিলেন তার থেকে অনেক বেশি টাকা কামিয়ে নিয়েছিলেন নিজের কারখানায় লাইসেন্স নির্ধারিত পরিমাণের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে মদ উৎপাদন করে। তার জন্য তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয়নি, কেউ এসে তাঁকে কোনো প্রশ্নও করেনি। বরং তিনি 'সেবার পুরস্কার স্বরূপ' পদ্মশ্রী উপাধিতে সম্মানিত হয়েছেন।

ভারত স্টিল টিউবসের মালিক রৌণক সিং ভাগ্যবানদের মধ্যে আর একজন। ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ ১৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে। তাছাড়া তাঁর কোম্পানীও তখন বিভিন্ন নিয়মবিরুদ্ধ কাজের জন্য সরকারের কালো তালিকায় নথিভুক্ত হয়। কিন্তু স্বয়ং সঞ্জয়জী যার সহায় তার টিকিটিও ছুঁতে পারে এমন কোনো অফিসারের খোঁজ অন্তত দিল্লীতে পাওয়া যাবেনা। কালো তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও রৌণক সিংয়ের কোম্পানী বিভিন্নসূত্রে অর্ডার পেতে থাকে, এবং কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় ২ কোটি টাকা মুনাফা লুটে নিতে সক্ষম হয়।

ভাগ্যবানদের আর একজন হলেন শ্রী সি. বি. সরণ। তিনি যখন দেখলেন চট করে সরকারী সাহায্য এবং সুযোগ পাওয়ার রাস্তা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর ছেলের সঙ্গে ভিড়ে পড়া তখন তিনিও আর বসে রইলেন না, মারুতি লিমিটেডে কিছু টাকা লগ্নী করে কোম্পানীর ডাইরেক্টরের একটা

পদ বাগিয়ে নিলেন। তারপরই শুরু হলো তাঁর আসল কাজ—গোছানোর পালা। তিনি উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় জেলায় সরকারী সাহায্যে একটি ট্রাক্টর তৈরির কারখানা খোলার পরিকল্পনা করলেন। সেজন্য সরকারের কাছে লাইসেন্স এবং আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানালেন। সরকার তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলো—তিনি রাতারাতি বিনা মেহনতে বেশ কিছু কামিয়ে নিলেন।

মারুতি লিমিটেডের পত্তনকালে যারা টাকার যোগান দিয়েছিলো এ হলো তাদেরই কীর্তিকলাপের এক ভগ্নাংশ কাহিনী। এর বাইরেও যা আছে তা বলে শেষ করা যাবেনা। তবে তারই মধ্য থেকে মাঝে মাঝে উপমার প্রয়োজনে কিছু কিছু উদ্ধৃতি শোনাবো—আপাততঃ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা যোগাড়ের ব্যাপারে যেসব কাণ্ডকারখানা ঘটেছিলো সে সম্পর্কে কিছু বলি।

মোটর গাড়ি তৈরির মতো একটি শিল্প-কারখানা যে মাত্র ৫ কোটি টাকা যোগাড় করে স্থাপন করা সম্ভব নয়, তা সাধারণ লোকও জানে—সুতরাং সঞ্জয় গান্ধীও জানতেন। তাই প্রথম থেকেই তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন, কোম্পানীর নামে কিছু ক্যাপিটাল দেখিয়ে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে যতো বেশি সম্ভব লোন আদায় করবেন।

কিন্তু ব্যাঙ্কের লোন আনতে গিয়ে প্রথম অসুবিধে দেখা দিলো, তখন পর্যন্ত কাগজে কলমে ছাড়া মারুতি কোম্পানীর আর কোনো অস্তিত্বই নেই। কিছু জমি তার রয়েছে ঠিকই কিন্তু তা হরিয়ানা সরকারের দেওয়া—সে বাবদ কোম্পানীর তরফ থেকে কোনোরকম মূল্য পরিশোধ করা হয়নি। অতএব তার বিনিময়ে ব্যাঙ্ক থেকে ধার পাওয়া সম্ভব নয়। তবু বিভিন্ন ব্যাঙ্ক নিয়ম বহির্ভূত পদ্ধতিতেই মারুতি লিমিটেডকে বেশ কিছু টাকা ওভার ড্রাফট দিলো—তবে সেটা মারুতি লিমিটেডকে দেখে নয়, প্রধানমন্ত্রীর পুত্রকে দেখেই দেওয়া হলো। যে যতো ভালো পদেই চাকরি করুন না কেন, এই দুর্দিনের বাজারে কেউই ক্ষমতাশালীর কোপদৃষ্টিতে পড়ে চাকরি হারাতে রাজি নন।

একটি মোটর গাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপনের জন্য কমপক্ষেও

৫০ থেকে ১০০ কোটি টাকার প্রয়োজন। শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর ছেলে — এই সুবাদে অতো টাকা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সঞ্জয় গান্ধী বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারদের ওপর চাপ দিয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে আরো কিছু লোন আদায় হলো।

অস্তিত্ববিহীন একটি কোম্পানীর নামে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক বিনা জামিনেই এতো টাকা অগ্রিম দেওয়াতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনি প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে সতর্ক করে দিলেন এই বলে যে, এভাবে নীতিবহির্ভূত কাজ করলে অচিরেই ব্যাঙ্কগুলির সামনে ঘোরতর দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে।

কথাটা কানে গেলো সঞ্জয়ের। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যেভাবেই হোক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরকে ঠাণ্ডা করতেই হবে।

শুরু হয়ে গেলো কাজ। অর্থমন্ত্রী সুব্রহ্মনিয়মের কাছে দাবি রাখা হলো: অবিলম্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরকে সরিয়ে সেখানে অন্য কাউকে বসান। এবং কাকে বসাতে হবে তা-ও বলে দেওয়া হলো। ভদ্রলোকটির নাম শ্রী কে. আর. পুরী।

সুব্রহ্মনিয়ম আপত্তি জানালেন, 'পুরী চিরকাল ইনসিওরেন্সের কাজ করে এসেছেন, তার পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর পদের দায়িত্ব সামলানো সম্ভব হবে না।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। দাবি বহাল রইল: পুরীকেই গভর্ণর করতে হবে।

অবশেষে তাই হলো। সুব্রহ্মনিয়ম প্রধানমন্ত্রীর ছেলের জেদের কাছে পরাজিত হলেন। কে. আর. পুরী হলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নতুন গভর্ণর।

এবার সঞ্জয়জীর আবদার আর একটু বাড়লো। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন ডক্টর আর. কে. হাজারী। তিনিই উদ্যোগী হয়ে মারুতিকে আর যাতে নতুন ওভার ড্রাফট দেওয়া না হয়, তার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে খবর সঞ্জয় সময় মতোই পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই ওতে ওতে ছিলেন প্রথম সুযোগেই কোপটা মারবেন।

এবার সে সুযোগ এলো। সঞ্জয় দাবি জানালেন হাজারীকেও সরাতে হবে। সুব্রহ্মনিয়ম মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও বাধ্য হলেন হাজারীকে সরিয়ে দিতে। কারণ, ছেলের দাবির পেছনে মারও যে মৌন সম্মতি আছে সেটা তাঁর মতো বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে না বোঝার কোনো কারণ ছিলো না।

সুব্রহ্মনিয়ম তাঁর অসন্তুষ্টি সব সময় গোপন করে রাখতে সক্ষম হননি, মাঝে মাঝে কারো কারো কাছে সে-কথা প্রকাশ করে ফেলতেন। ফলে ইন্দিরা গান্ধীও জেনে গিয়েছিলেন ব্যাপারটা। তাই তিনিও অপেক্ষা করছিলেন উপযুক্ত সময়ের।

সেই উপযুক্ত সময় এলো জরুরী অবস্থা ঘোষণার শুভ মুহূর্তে। ইন্দিরাজী মনের রাগকে আর চেপে রাখতে পারলেন না, প্রথম সুযোগেই প্রতিশোধ নিলেন। সুব্রহ্মনিয়মকে জানাবারও তিনি প্রয়োজন বোধ করলেন না, শুধু একটা ঘোষণার সাহায্যে তাঁর হাত থেকে ব্যাঙ্কিং দপ্তর নিয়ে দিয়ে দিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়কে। এবং তাঁকে অর্থ দপ্তরের উপমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদমর্যাদার উন্নীত করে দিলেন। ফলে ব্যাঙ্কিং দপ্তরের পূর্ণ কর্তৃত্ব তাঁর হাতেই বর্তালো।

পাঠক হয়তো প্রণব মুখোপাধ্যায়ের এমন আকস্মিক উত্থানে কিছুটা আশ্চর্যান্বিত হবেন, হয়তো তারা এর কারণ কি, তার অনুসন্ধানে লেগে পড়বেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি শুধু একটা অনুরোধ করবো, কারণ অনুসন্ধান করে অযথা সময় ব্যয় করবেন না। কারণ কি তা এ লেখাতেই বর্ণিত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, কী পরিস্থিতিতে শ্রী প্রণব মুখো-পাধ্যায় ও শ্রী দেবী চট্টোপাধ্যায় সঞ্জয়জীর সামনে গিয়ে নাকে খত দিয়েছিলেন! এবং সেই নাকে খত দেওয়ার পুরস্কারই হচ্ছে 'ব্যাকিং দপ্তর।'

ব্যাঙ্কের টাকা লুটে খাওয়ার ব্যবস্থা যখন পাকা হলো ততোদিনে দেশে জরুরী অবস্থা চালু হয়ে গেছে। সুতরাং আপাতত তার পরবর্তী কাহিনী বলা মুলতুবি থাক, বরং জরুরী অবস্থা জারির আগে আর যেসব 'কীর্তি' সাধিত হয়েছিলো এখন সে কথাই বলি।

প্রথম দিকে আশানুযায়ী ব্যাঙ্ক লোন না পাওয়াতে সঞ্জয় গান্ধী বেশ একটু বেকায়দায় পড়ে যান। তিনি বিভিন্ন বড়ো বড়ো ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই চেষ্টা করতে করতেই একদিন তাঁর সাথে যোগাযোগ ঘটে গেলো বিড়লাদের; তাদের প্রতিনিধি হয়ে সঞ্জয়জীর সাথে কথা বলতে এলেন শ্রী কে. কে. বিড়লা।

বিভিন্ন কারণে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বিড়লাদের সম্পর্ক মাঝখানে বেশ খারাপ হয়ে পড়েছিলো। বিড়লাদের তরফে ভালো চেষ্টা সত্ত্বেও সে সম্পর্কে কিছুতেই স্বাভাবিক হচ্ছিলো না। ফলে বিড়লারা ব্যবসায়িক দিক থেকে বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিলো। ইন্দিরাজীর নির্দেশে তাঁদের ওপর মোট চল্লিশটি বিভিন্ন ধরনের মামলা চলছিলো।

বিড়লারা চাইছিলো ঝগড়াটকে মিটিয়ে ফেলতে। সে কারণে সঞ্জয় যখন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তখন তারা এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে এগিয়ে এলো। কে. কে. বিড়লা সঞ্জয়কে আশ্বাস দিলেন টাকার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন, তবে তার বিনিময়ে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে তাদের যে তিক্ত সম্পর্ক চলেছে সেটা তাঁকে মিটিয়ে দিতে হবে। সঞ্জয় এই সুবর্ণ সুযোগকে হাতছাড়া করতে চাইলেন না; কথা দিলেন, তাঁর মার সঙ্গে তাদের সম্পর্কটাকে তিনি স্বাভাবিক করে দেবেন।

অচিরেই সম্পর্ক 'স্বাভাবিক' হওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেলো। বিড়লাদের ওপর যে চল্লিশটি মামলা চলছিলো, কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেলো, সরকার সে মামলা চালাবার ব্যাপারে আর খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে না। শেষে একদিন সব কটা মামলাই বন্ধ হয়ে গেলো।

মামলা ছাড়াও আরো বহু ব্যাপার ছিলো বিড়লাদের। আয়কর ফাঁকি থেকে শুরু করে বিদেশী মুদ্রা আইন লঙ্ঘন পর্যন্ত কোনো ব্যাপারেই তারা কারো থেকে পেছনে পড়ে থাকেনি কোনোদিন। তাদের সেইসব অবৈধ কাজকর্ম সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেছিলো। সেই তদন্ত কমিটি তাদের তদন্ত কার্যে এতোদূর এগিয়ে গিয়েছিলো যে সেই কমিটির রিপোর্ট

:বের হলে বিড়লাদের মুখোশ একেবারে খুলে পড়তো। এটা বিড়লারা মোটেই পছন্দ করছিলো না। তাই বারবার চাপ দিচ্ছিলো ব্যাপারটাকে বন্ধ করার জন্য।

ততোদিনে সঞ্জয় গান্ধীর মারুতি লিমিটেডে বিড়লাদের টাকা ঢোকা শুরু হয়ে গেছে। অতএব প্রতিদান তাদেরকে দিতেই হবে। কিন্তু মুশকিল বাঁধলো আয়কর দপ্তরকে নিয়ে। তারা এতোদূর এগোবার পর আর কিছুতেই পিছিয়ে আসতে রাজি নয়। সুতরাং শুরু হলো চিঠি চালাচালি। খোদ বোর্ড অব রেভেনিউর চেয়ারম্যান বললেন, তিনি কিছুতেই এ ব্যাপারটাকে এখানে এসে খতম হতে দেবেন না।

ইন্দিরাজীর পদ্ধতি হচ্ছে, কেউ যদি কোনো বিষয়কে খতম করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তাহলে তিনি তাকেই খতম করে দেন। এক্ষেত্রেও তাই হলো, পুরোনো বোর্ড অব রেভেনিউর চেয়ারম্যান খতম হয়ে গেলেন, সেখানে এলেন নতুন চেয়ারম্যান।

নতুন চেয়ারম্যান তাঁর কাজে যোগ দিয়েই নতুন পদ্ধতিতে কাজ শুরু করে দিলেন। যে তদন্ত কমিশনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিলো তার কাজ আস্তে আস্তে শ্লথ হয়ে যেতে লাগলো। শেষে একদিন দেখা গেলো, কাম একেবারে 'বনধ্।'

এই 'কাম বনধ্'-এর যথাযথ পুরস্কার পেলেন নতুন চেয়ারম্যান ভদ্রলোকটি। তাঁকে রাষ্ট্রপতি 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে গলায় পরিয়ে দিলেন বিজয়মাল্য।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই 'পদ্মভূষণ'টি জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পরদিনই ছাঁটাই হয়ে গেছেন। পাঠক নিশ্চয়ই জানতে আগ্রহী হয়ে পড়েছেন লোকটির নাম কি? কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বলছি, সেই করিতকর্মা ভদ্রলোকটির নাম শ্রী এস. আর. মেহতা।

বিড়লা সাহেবরা যা চাইছিলেন তা তারা পেয়ে গেলেন। ইন্দিরাজীর সাথে তাদের দোস্তি হয়ে গেলো, সঞ্জয়জী হলেন তাদের ইয়ার। ফলে মারুতিকে যতোভাবে সাহায্য করা সম্ভব তারা তাই করতে লাগলেন। কিন্তু মুশকিল বাঁধলো স্বয়ং সঞ্জয়কে নিয়েই।

নেহরু পরিবারের পুরোনো বন্ধু মহম্মদ ইউনুস। তিনি বহুদিন ধরেই রটিয়ে আসছিলেন, সঞ্জয়ের মতো এমন প্রতিভাবান ছেলে তিনি ইহজন্মে দেখেননি। সে যে-জিনিসটা একবার দেখে তা আর তাঁর দ্বিতীয়বার দেখার প্রয়োজন পড়েনা। সেই ছোটোবেলায় যখন খেলনা গাড়িতে চড়ে সে ঘুরতো তখন থেকেই তাঁর মনে সখ জেগেছিলো সে বড়ো হলে গাড়ি বানাবে। আর সেই প্রতিজ্ঞা নিয়েই সে গিয়েছিলো লণ্ডনে রোলস্ রয়েস কারখানায় শিক্ষানবিসি করতে। সেখান থেকে সে যা শিখে এসেছে, তার সাথে নিজের মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে সে যে গাড়ি তৈরি করবে তা দেখে সারা দুনিয়ার লোকের চোখে ধাঁধা লেগে যাবে।

মহম্মদ ইউনুস সঞ্জয়ের সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলেন, কিন্তু সব থেকে দামী যে কথাটা বলেছিলেন, তা হলো, তাঁর তৈরি গাড়ি দেখে দুনিয়ার লোকের চোখে 'ধাঁধা' লেগে যাবে। কথাটা এক অর্থে হুবহু সত্য।

সঞ্জয়জীকে যখন রোলস্ রয়েস কোম্পানী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন তাঁর শিক্ষা অর্ধেকও সমাপ্ত হয়নি। তিনি তখন একটা সম্পূর্ণ গাড়ি তৈরি করা তো দূরের কথা, একটা ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেলে সেটাকে কি করে সারাতে হয় তা-ও শিখে উঠতে পারেননি। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি যে বংশে জন্মেছেন সে বংশের প্রতিটি লোকের প্রচার নৈপুণ্য এতো বেশি যে প্রচারের চোটেই লোককে প্রথম প্রথম বিশ্বাস করিয়ে দেওয়া হয়েছিলো যে তিনি বোধহয় সত্যি সত্যিই একজন ফোর্ড কিংবা ক্রাইসলার।

ভারতীয় ফোর্ডের ক্যারামতি কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়া শুরু হলো। প্রথমে রটানো হয়েছিলো, অর্জন দাশের কারখানায় বসে প্রধানমন্ত্রী-তনয় তাঁর 'জনতা গাড়ি'র প্রথম মডেলটি তৈরি করেছেন। কিন্তু যখন সবাই সেটা দেখার জন্য ভিড় করতে লাগলো তখন বলা হলো মডেলটা তৈরি করে আবার খুলে ফেলা হয়েছে। দ্বিতীয়বার বলা হলো, গুরগাঁওয়ের কারখানায় একটি মডেল তৈরি হয়েছে, সেটি 'এশিয়া ৭২'

মেলায় প্রদর্শিত হবে।

বর্তমান প্রতিবেদক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করছেন, ১৯৭২ সালে দিল্লীতে 'এশিয়া বাহাত্তর' মেলায় সঞ্জয় আবিষ্কৃত ও পরিকল্পিত 'জনতা গাড়ি' মারুতির একটি মডেল দেখার সৌভাগ্য তার হয়েছিলো। মডেলটি বাইরে থেকে দেখতে বেশ ভালোই লাগছিলো, এবং মনে মনে সেদিন আশাও করেছিলাম হয়তো অচিরেই এই গাড়ি বাজারে চালু হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, তা হলোনা; এবং পরে জানা গেলো মডেলটিতে শুধু বাইরের কাঠামোই ছিলো, ভেতরে কোনো ইঞ্জিন ছিলো না। সেই কাঠামোটিকে একটি ট্রাকে করে একজিবিশন গ্রাউণ্ডে নিয়ে আসা হয়েছিলো, এবং মেলা শেষে সেটিকে আবার ট্রাকে করেই নিয়ে যাওয়া হয় গুরগাঁওয়ে।

একটি লোক কী দুঃসাহসিক প্রতারক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হলে এমন কাজ করতে পারেন তা পাঠকরাই বিচার করুন, এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করে আমি নিজেকে খাটো করতে চাইনা।

অন্যান্য সবার আবেদন অগ্রাহ্য করে মারুতি লিমিটেডকে যখন লেটার অব ইনটেণ্ট দেওয়া হয়েছিলো তখন তাতে একথা স্পষ্ট করে লিখে দেওয়া হয়েছিলো, 'মারুতি লিমিটেডকে অতি অবশ্যই দেশীয় মালমশলা দিয়ে কম দামের গাড়ি উৎপাদন করতে হবে; এবং কোনো অবস্থাতেই সে বিদেশী মুদ্রা চাইতে পারবেনা।'

প্রথম লেটার অব ইনটেণ্ট দেওয়া হয়েছিলো এক বছরের জন্য, তারপর দ্বিতীয় বছরের জন্য, তারপর তৃতীয় বছরের জন্য। কিন্তু এই তিন বছরের মধ্যেও চলনসই গোছের একটা মোটর গাড়ি তৈরি করে সঞ্জয়জী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির করতে পারেননি। যা-ও একটা করেছিলেন তার ইঞ্জিন প্রথম পরীক্ষাতেই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। ফলে ইউনুস কথিত 'প্রতিভাবান' ছেলেটির 'প্রতিভা' সম্পর্কে লোকে হাসাহাসি করছিলো!

কিন্তু লোকের হাসাহাসিকে গ্রাহ্য করার মতো লোকই নন সঞ্জয়জী। কে কোথায় হাসলো তাতে তাঁর কি এলো গেলো? তাই

তিন বছর ধরে একটি 'অশ্বডিম্ব'-ও তৈরি করতে না পারা সত্ত্বেও তিনি তিয়াত্তর সালে আবার একবার আবেদন জানালেন লেটার অব ইনটেন্টের মেয়াদ চতুর্থ বারের জন্য বাড়িয়ে দিতে।

আবেদন করার সাথে সাথেই আবেদন মঞ্জুর হলো। সঞ্জয়জীও সম্ভবতঃ আদা নুন খেয়ে লেগে গেলেন এবার একটা কিছু করার জন্য। শেষে চুয়াত্তরের পঁচিশে জুন ঘোষণা করলেন, 'যদি খুব তাড়াতাড়ি উৎপাদন লাইসেন্স পেয়ে যাই তবে আগামী অক্টোবর মাসেই মারুতি বাজারে আসবে বিক্রির জন্য।'

ঘোষণাটা এমন কায়দায় করা হলো যে যারা নতুন শুনলো, তারা ভাবলো সত্যিই বোধহয় এবার কিছু একটা হতে যাচ্ছে। কিন্তু যাদের স্মৃতিশক্তি দু তিন বছরের ঘটনা মনে রাখার পক্ষে যথেষ্ট সবল তারা এ ঘোষণায় মনে মনে হাসা ছাড়া আর কিছুই করলো না। কারণ ইতিপূর্বেও সঞ্জয়জী আরো কয়েকবার ঘোষণা করেছিলেন যে মারুতি গাড়ি আর কিছুদিনের মধ্যেই বাজারে এসে গেলো বলে।

একবার তো একেবারে সময়-তিথি-নক্ষত্র পর্যন্ত ঘোষিত হয়ে গিয়েছিলো। উনিশ শো বাহাত্তর সালে তিনি সাংবাদিকদের ডেকে বলেছিলেন, 'আগামী বছরই মারুতি বাজারে বের হচ্ছে। তিয়াত্তরের পয়লা অক্টোবরের আগেই ১০ হাজার গাড়ি বিক্রির জন্য তৈরি হয়ে যাবে। এবং আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, চুয়াত্তরের পয়লা অক্টোবরের মধ্যে ২৫ হাজার মারুতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তায় চলাচল শুরু করবে।'

তিয়াত্তর কেটে গেলো, চুয়াত্তর কেটে গেলো, এলো পঁচাত্তর। পথে ঘাটে লোকে হাসাহাসি শুরু করলো। মারুতি নিয়ে বিভিন্ন ব্যঙ্গ রসিকতা চালু হয়ে গেলো মুখে মুখে। গুজব রটলো, কোনোরকম পরীক্ষা ছাড়াই মারুতিকে বাজারে ছাড়ার লাইসেন্স দেওয়া হবে। কারণ আহমেদনগরে হেভি ভেহিকেলস ডিপোতে পরীক্ষার জন্য পাঠালে কোনোদিনই ও গাড়ি ও. কে. সার্টিফিকেট পাবে না।

গুজব তখন এতো প্রবল আকার ধারণ করেছে যে পার্লামেন্টেও

তার ঢেউ গিয়ে লাগলো। তিয়াত্তরের বর্ষাকালীন অধিবেশনে বিরোধী পক্ষ প্রশ্ন তুললো, বাজারে যে গুজব রটেছে তা সত্য কিনা? বিরোধীপক্ষের চাপের কাছে সরকার কথা দিতে বাধ্য হলো, এ ধরনের কোনো অবৈধ কাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হবেনা; হেভি ভেহিকেলস ডিপোতে যথাযথ পরীক্ষার পরেই গাড়ি বাজারে ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হবে।

এই প্রতিশ্রুতিদানের কিছুদিনের মধ্যেই খবর এলো, আহমেদনগর হেভি ভেহিকেলস ডিপোতে প্রতিরক্ষা দপ্তরের অফিসাররা মারুতিকে যথাযথ পরীক্ষা করে ও. কে. সার্টিফিকেট দিয়েছে।

খবর শুনে অনেকেই আশান্বিত হলো, আবার অনেকে অনেক কথা বলাবলিও শুরু করলো। কিন্তু সঞ্জয়জী কারো কথায় কান না দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন। ঘোষণা করা হলো 'জনতা গাড়ি' বাজারে বের হচ্ছে; প্রতিটির মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ২৫ হাজার টাকা। ঘোষণা শুনে 'জনতা'র চোখ ছানাবড়া। যারা ভেবেছিলেন, আট-দশ হাজার টাকা কোনোরকমে ধার দেনা করেও একটা গাড়ির মালিক হওয়ার আত্মতৃপ্তি অনুভব করবেন তাদের মাথায় হাত। একটা গাড়ির দাম ২৫ হাজার টাকা রাখা হবে এবং সেটাকেই বলা হবে জনতা গাড়ি—এটা এর আগে কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি। তাই স্বপ্নাতীত ঘোষণা যখন জারি হলো, তখন অনেকেই বিমর্ষ হলেন। তবু আশায় আশায় রইলেন, আর কিছু না হোক, গাড়িটা বের হলে অন্তত মরার আগে একবার চাক্ষুষ দেখে তো নেওয়া যাবে। একি আর যে সে গাড়ি—স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ছেলে তৈরি করেছেন বলে কথা।

কিন্তু কৈ, গাড়ি তো আর রাস্তায় বের হয় না। তাহলে এই যে ঘোষণা করা হলো গাড়ির টেস্ট সার্টিফিকেট পাওয়া গেছে, ২৫ হাজার গাড়ি পয়লা অক্টোবরের মধ্যেই বাজারে বের হচ্ছে—এসবের অর্থ কি? পয়লা অক্টোবর তো সেই কবে পার হয়ে গেছে—এখনো তো একটা গাড়িও কোথাও কারো নজরে আসছে না। তাহলে কি আবারও একটা নতুন ধোঁকা দেওয়া হলো!

হ্যাঁ, তাই। না দিয়ে আর শ্রীমানের তখন উপায়টাই বা ছিলো

কি ? লেটার অব ইনটেণ্টে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছিলো, 'মারুতি লিমিটেডকে অতি অবশ্যই দেশীয় মালমশলা দিয়ে কম দামের গাড়ি উৎপাদন করতে হবে, এবং কোনো অবস্থাতেই সে বিদেশী মুদ্রা চাইতে পারবে না।' সেই শর্তেই বিড়লা, টাটা, সিংহানিয়া, গোয়েঙ্কা, জয়পুরিয়া, বাজোরিয়া, হিম্মৎসিঙ্কাদের দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পুত্র লেটার অব ইনটেণ্ট আদায় করেছিলেন। তাঁর 'ফোর্ড ক্রাইসলার সুলভ প্রতিভা' যাতে সারাটা জগতের সামনে জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠতে পারে সে কারণে সরকার নিজেই জনতা গাড়ি তৈরি করবে ঘোষণা করেও শেষ পর্যন্ত মারুতিকেই সে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলো। কিন্তু যে যা-নয় তাকে তাই বলে চালাতে গেলে বিপত্তি তো ঘটবেই। রামছাগলকে যদি শুধু 'রাম' নামে ডাকা হয় তাহলেই সে ভগবান শ্রীরাম হয়ে যায় না। বীজ না থাকলে তা থেকে ফুলের আশা করা যেমন বৃথা, তেমনি প্রতিভাবিহীন মানুষেব কাছ থেকে নতুন কিছু উদ্ভাবনের প্রত্যাশাও দুরাশা।

সঞ্জয় গান্ধী প্রথম থেকেই 'ফাঁকি দিয়ে' কিছু করার মতলবে ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর সে চালাকি কেউ ধরতে পারবে না। তাই ইঞ্জিনবিহীন কাঠামোকে সম্পূর্ণ মোটর গাড়ি বলে প্রচার করে লক্ষ লক্ষ লোককে মেলায় টেনে নিয়ে গিয়ে বোকা বানাবার চেষ্টা করেছিলেন, পুরোনো ইঞ্জিনকে নতুন বডির মধ্যে বসিযে দিয়ে সেটাকেই হেভি ভেহিকেলস ডিপোয় পাঠিয়ে সার্টিফিকেট আদায়ের মতলব ফেঁদেছিলেন। কিন্তু তাঁর সব ছলচাতুরীই শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞ লোকদের চোখে ধরা পড়ে যায়। তারা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

আহমেদ নগরের হেভি ভেহিকেলস ডিপোয় প্রথমবার মারুতি লিমিটেড যে গাড়িটি টেস্ট করার জন্য পাঠিয়েছিলো সেটাকে 'রাস্তায় চলার অযোগ্য' মন্তব্য করে পরীক্ষাকারী অফিসাররা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার বেশ কিছুদিন পরে মারুতি লিমিটেড আর একটি গাড়ি তাদের কাছে পাঠায় পরীক্ষার জন্য। গাড়িটি সব দিক থেকে সত্যি সত্যিই ভালো ছিলো। তার ইঞ্জিনটি ছিলো একেবারে নতুন মডেলের, কর্মক্ষম এবং শক্তিশালী। ফলে পরীক্ষাকারী অফিসারদের

পক্ষে আপত্তি করার কিছুই ছিলো না, তাই তারা গাড়িটিকে ও. কে. সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছিলেন।

গাড়িটির ইঞ্জিন এতো মজবুত, কর্মক্ষম এবং শক্তিশালী দেখে সেদিন হেভি ভেহিকেলস ডিপোর অনেক অফিসারের মনেই সন্দেহের উদ্ভব হয়েছিলো, কিন্তু আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নেওয়াটা উচিত নয় মনে করে কেউই সেদিন সে ব্যাপারে কোনো উচ্যবাচ্য করেননি।

কিন্তু কথায় আছে আগুন কখনো ছাইচাপা থাকে না। যতোই লুকিয়ে রাখাব চেষ্টা করা হোক না কেন একদিন না একদিন মিথ্যের আবরণ খুলে ফেলে সে, সর্বসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করবেই। মারুতির ব্যাপারেও তাই হলো। জানা গেলো, যে ইঞ্জিনটি বসিয়ে মারুতিকে হেভি ভেহিকেলস ডিপোতে পাঠানো হয়েছিলো টেস্ট সার্টিফিকেট আদায় করে আনার জন্য সেটি ছিলো একটি আমদানিকৃত ইঞ্জিন। আনা হয়েছিলো ইংল্যাণ্ড থেকে। ডব্লু. এইচ. এফ. মুলার নামে জনৈক বিদেশী, যিনি মারুতির সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন, তিনিই ইঞ্জিনটিকে বিমানে করে নিয়ে এসেছিলেন দিল্লীতে। ইঞ্জিনটি দিল্লীতে এসে পৌঁছোবার পর মারুতি লিমিটেডের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার প্রাক্তন উইং কমাণ্ডার আর. এইচ. চৌধুরী সেটিকে কাস্টম থেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। এবং তারপর সেই ইঞ্জিনটিকেই মারুতির মডেলের মধ্যে বসিয়ে আহমেদ নগরে পাঠানো হয় টেস্ট-সার্টিফিকেট যোগাড় করে আনার জন্য। চিটিং-বাজির টেম্পারেচার বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিলো এ ঘটনা থেকে পাঠক সেটা নিশ্চয় ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারছেন।

লেটার অব ইনটেণ্টের কম দাম রাখার শর্ত অনেক আগেই লঙ্ঘন করা হয়েছিলো গাড়ির দাম ২৫ হাজার টাকা ঘোষণা করে। এবার তার দ্বিতীয় শর্ত, কোনোরকম বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করা চলবে না—সেটাও লঙ্ঘন করা হলো। তবে চক্রান্ত চলতে লাগলো বাইরে থেকে কিছু ইঞ্জিন আমদানি করে অন্তত আপাতত কিছু গাড়ি বাজারে ছাড়ার। কেন না ততোদিনে সারা দেশ জুড়ে আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে, পথে ঘাটে লোকে

মা এবং ছেলের নামে 'ছিঃ ছিঃ' করছে।

মায়ের নির্দোষিতার গুণকীর্তনে যে-সব ভাবাবেগসম্পন্ন মানুষেরা এখনো ব্যস্ত তাদের মনের ভাবাবেগের প্রাবল্য কমাবার উদ্দেশ্যে এখানে একটা ছোট্ট খবর পরিবেশ করছি।

পি. এন. হাকসারের নাম নিশ্চয় সকলেই শুনেছেন; তবু যারা এই মুহূর্তে নামটা ঠিক স্মরণ করে উঠতে পারছেন না তাদের অবগতির জন্য জানাই, ভদ্রলোক ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান উপদেষ্টা। সারা দেশ জুড়ে যখন মারুতি কেলেঙ্কারি নিয়ে হৈ হৈ শুরু হয়ে গিয়েছে, তখন শ্রীমতী গান্ধীকে তিনি বললেন, মারুতির ব্যাপারটা যতোদূর এগিয়েছে সেখানেই বন্ধ করুন, এটাকে আর আগে বাড়তে দেবেন না; কারণ তাতে আপনারও বদনাম বাড়বে।

শ্রীমতী গান্ধীকে সুবুদ্ধি দেওয়ার ফল ফলতে দেরি হলো না। শ্রী হাকসার বিভিন্নভাবে হেনস্তা হতে লাগলেন। অবশেষে তাঁকে বাধ্য করা হলো চাকরি থেকে পদত্যাগ করতে। সুতরাং এরপরও যারা প্রধানমন্ত্রীকে ধোয়া তুলসীপাতা হিসাবে চিহ্নিত করতে চান তাদের প্রতি আমাদের করুণা প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

বিদেশ থেকে ইঞ্জিন এনে গাড়ি তৈরির পরিকল্পনা যখন ভেস্তে গেলো তখন সঞ্জয় সত্যি সত্যিই বিপদে পড়লেন। কি করবেন তা যেন ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। অথচ একটা কিছু না করলেও চলছিলো না। কারণ, যে সব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক মারুতি লিমিটেডকে বিপুল অর্থ অগ্রিম দিয়েছিলো তারা ইতিমধ্যে বারবার তাগাদা শুরু করে দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ত্রাণকর্তার রূপ নিয়ে উদিত হলেন একজন স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁর নাম শ্রী ওয়াই. এম. ওয়াহি। ভদ্রলোকের সঙ্গে নেহরুজীর যথেষ্ট পরিচয় ছিলো। তিনি নেহরুজী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীনই 'ইউ. পি. সি. সি.' নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছিলেন। সরকারী অনুগ্রহে তাঁর ব্যবসা দেখতে দেখতে এমন ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো যে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো। খোঁজখবর শুরু হলো কিভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে। জানা গেলো সামরিক

দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তর নীতি বহির্ভূতভাবে এই কোম্পানীটিকে প্রচুর অর্ডার দিচ্ছে, এবং তার সবই বাজারছাড়া দরে।

ফলে বিষয়টা উঠলো পার্লামেণ্টে। বিরোধীপক্ষ দাবি জানালো এ ব্যাপারে তদন্ত করতে হবে। কিছুদিন টালবাহানা করার পর অবশেষে সরকার তদন্ত কমিটি বসাতে বাধ্য হলো। সেই তদন্তে প্রমাণিত হলো, শ্রী ওয়াহি বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্তত দু কোটি টাকা ঠকিয়েছেন।

আগেই বলেছি, প্রতারক এবং অপরাধী মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকজনদের প্রতি সঞ্জয় গান্ধী চিরকালই একটু বেশি টান বোধ করেন। তাই শ্রী ওয়াহি যখন তাঁর সাথে এসে দেখা করলেন তখন তিনি তাঁকে অতি সমাদরে আপ্যায়িত করে বসালেন। শুরু হলো কাজের কথাবার্তা। ওয়াহি বললেন, তাঁর কারখানায় রোড রোলার তৈরি হয়; যদি শ্রী গান্ধী চান তবে সেগুলোকে তিনি গুরগাওঁয়ের কারখানায় 'রি এসেম্বল' করে মারুতি লিমিটেডের নামে বাজারে ছাড়তে পারেন।

সঞ্জয়জী একেবারে তৈরি জিনিস পেয়ে গেলেন হাতের কাছে। অনেকদিন ধরে তিনি এরকমই একটা কিছু খুঁজছিলেন—তাই প্রস্তাব আসা মাত্র সেটাকে লুফে নিলেন। সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত হলো: মারুতি রোড রোলারস্।

বংশীলালের হরিয়ানা সরকার তৈরি হয়েই বসেছিলো। কোনো-রকম বিশেষজ্ঞের মতামতের দরকার হলো না, কোনোরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রয়োজন হলো না, শুধু পি. ডব্লু. ডি. বিভাগ একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিলো: এমন উত্তম রোড রোলার আর বাজারে নেই, সুতরাং যাদেরই রোড রোলারের দরকার হবে তারাই যেন মারুতি রোড রোলার কেনেন। এক একটি রোড রোলারের দাম নির্ধারিত হলো দেড় লক্ষ টাকা।

হরিয়ানা সরকারের পি. ডব্লু. ডি. বিভাগ এক কথায় যাকে 'উত্তম' বলে ঘোষণা করে দিলো, ভারত সরকারের ডাইরেক্টর জেনারেল অব সাপ্লাইজ অ্যাণ্ড ডিজপোজালস কিন্তু তাকে 'মোটামুটি চলনসই'

সার্টিফিকেটটুকু দিতেও রাজি হলো না। তারা মন্তব্য করলো : 'স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যা যা থাকার কথা এ রোড রোলারে তা নেই।' এ ধরনের মন্তব্য সত্ত্বেও কিন্তু মারুতি কোম্পানীর পক্ষে রোড রোলার বাজারে ছাড়া এবং তা বিক্রির ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধেই হলো না। ক্রেতাও জুটে গেলো প্রচুর। এরা হলো বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং প্রতিরক্ষা দপ্তর।

রোড রোলার কোম্পানীর কাজ যখন পুরোদমে চালু হলো তখন সঞ্জয়জী নতুন আর কিছু একটা করার কথা চিন্তা করতে শুরু করলেন। কারণ, ব্যাঙ্ক থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ অগ্রিম নেওয়া হয়েছিলো তার সুদ দিতে হলেও শুধু রোড রোলারের টাকাতেই কুলোবে না, আরো কিছু করতে হবে। সেই অনুযায়ী তৈরি হলো নতুন পরিকল্পনা। যে কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো মোটর গাড়ি তৈরির উদ্দেশ্যে সেই কোম্পানী ঠিক করলো এবার তারা বাসের বডি তৈরির কাজ শুরু করবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে গেলো অচিরেই। অর্ডার তৈরিই ছিলো। উত্তর ও মধ্য ভারতের রাজ্যসরকারগুলি ঢালাও অর্ডার পাঠাতে লাগলো মারুতি লিমিটেডের নামে। কোনোরকম টেণ্ডারের ধার ধারা হলো না, কোনোরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার বালাই রইলো না—শুধু সরকারী প্যাডে অর্ডার পাঠিয়ে দেওয়া হলো অমুক জায়গায় অতোগুলি বাসের বডি পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। ব্যস।

সরকারী টাকা যেন খোলামকুচি হয়ে গেলো। প্রয়োজন-অপ্রয়োজন দেখা হলো না, উপযুক্ততা-অনুপযুক্ততা বিচার করা হলো না, শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর ছেলের মুনাফা লোটার ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য ঢালাও অর্ডার দিয়ে যেতে লাগলো উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান সরকার। এখন জানা যাচ্ছে শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশ সরকার একাই এক বছরে পনেরো লক্ষ টাকা লোকসান দিয়েছে মারুতির তৈরি বাসের বডি কিনে।

এবার শুরু হলো তহবিল তছরূপের বিভিন্ন কলাকৌশল। 'মারুতি টেকনিকাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড' নামে একটি নতুন

কোম্পানীর পত্তন হলো। বলা হলো এই কোম্পানী এবার থেকে মোটর গাড়ির ডিজাইন, উৎপাদন এবং সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের কাজ করবে। সে বাবদ মূলধন হিসেবে মারুতি লিমিটেডের ৫ লক্ষ টাকা এই কোম্পানীর নামে হস্তান্তর করা হলো। ঠিক হলো, এ ছাড়া মারুতি লিমিটেড যতো গাড়ি উৎপাদন করবে তার বিক্রির ওপর এই কোম্পানী শতকরা দু টাকা কমিশন পাবে। অবশ্য কুল বিক্রির হিসেবে কমিশন বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকার কম হলে চলবে না; সেক্ষেত্রে মারুতি লিমিটেডকে বাকি টাকা 'মারুতি টেকনিকাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড'কে দিয়ে দিতে হবে। এ চুক্তি কুড়ি বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।

যে লোকটি মোটর গাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হলে সারাতে হয় কি করে তা জানেন না তিনি একটি বিশেষজ্ঞ কোম্পানী খুলে বসলেন! তার থেকেও বড়ো কথা সেই বিশেষজ্ঞ কোম্পানীতে 'বিশেষজ্ঞ' হিসেবে নিয়োগ করা হলো শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীকে। ঠিক হলো তিনি প্রতি মাসে মাহিনা হিসেবে পাবেন আড়াই হাজার টাকা; তাছাড়া কোম্পানীর লাভের এক শতাংশ তাঁকে দেওয়া হবে কমিশন হিসেবে। এ ছাড়া বোনাস, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, চিকিৎসা ভাতা, ভ্রমণ ভাতা এবং বিনা পয়সায় বাংলো, টেলিফোন, গাড়ি ও ড্রাইভারও তিনি পাবেন। শুধু তাই নয় যেসব ক্লাবে শ্রীমতী সদস্য হতে চাইবেন সেসব ক্লাবের সদস্য চাঁদা এবং অন্যান্য খরচ-খরচা মারুতি টেকনিকাল সার্ভিসেসই বহন করবে।

অদ্যাবধি, কোম্পানীর ৩ বছর আয়ুষ্কালের যে চিত্র পাওয়া গেছে, তাতে জানা যাচ্ছে কোম্পানী প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকার মতো লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সে টাকা ডিভিডেণ্ট হিসেবে শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়নি, কারণ, তাহলে শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী ও সঞ্জয় গান্ধী উভয়কেই অনেক টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিতে হতো। তাই কায়দা করে লাভের ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে আড়াই লক্ষ টাকা সঞ্জয় গান্ধীর নামে লোন দেখানো হয়েছে।

যে কোম্পানীকে মারুতি লিমিটেড ৫ লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ করেছিলো সেই কোম্পানীর সম্পত্তির বিবরণ শুনলে যে-কারো হাস্যোদ্রেক হতে বাধ্য। জানা গেছে, মারুতি টেকনিকাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের মোট দুটি সম্পত্তি আছে: একটি ছাপার মেসিন, যার মূল্য ৪ হাজার টাকা; অন্যটি কয়েকটি মাপজোকের যন্ত্রপতি, যার মূল্য ১২ শো টাকা। অর্থাৎ মারুতি লিমিটেডের কাছ থেকে পাওয়া ৫ লক্ষ টাকাই উধাও হয়ে গেছে।

মারুতি লিমিটেড থেকে মারুতি রোলারস্ হয়ে মারুতি টেকনিকাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড পর্যন্ত পৌঁছোতে সঞ্জয় গান্ধীকে অনেকটা পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। এই চলার পথে তিনি প্রতিদিনই নতুন নতুন বন্ধু পেয়েছেন, প্রতিদিনই কিছু না কিছু আমদানির ব্যবস্থা হয়েছে। এক শো টাকা নিয়ে যিনি একটি ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার কাজে হাত লাগিয়েছিলেন, চার বছর পরে সেই সাম্রাজ্য কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে।

প্রথম প্রথম যে গতিতে টাকা আসছিলো পরের দিকে দেখা গেলো সে গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। যদিও বাজারে একটি গাড়িও বের হয়নি তবু বড়ো বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এই কোম্পানীর শেয়ার কেনার ব্যাপারে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিলো। এস. মধুসূদন লিমিটেড কিনলো ৬৩ হাজার শেয়ার, রেইনবো স্টিল কিনলো ৬০ হাজার, মোহন মেকিন ৫৬ হাজার, ট্রেড লিঙ্কস ৫৩ হাজার, অটোমোবাইল প্রডাক্টস অব ইণ্ডিয়া, পুরুষোত্তম দাশ এবং বনোয়ারী লাল—প্রত্যেকে কিনলো ৫০ হাজার করে। এ ছাড়া বিড়লাদের চারটে কোম্পানী কিনলো মোট চার লক্ষ শেয়ার। এর প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০ টাকা। সুতরাং এই কয়েকটি কোম্পানীর ক্রীত শেয়ারের হিসেব থেকেই আন্দাজ করে নেওয়া যায় কী বিপুল পরিমাণ অর্থ একটি অচল কোম্পানীর পেছনে ঢালা হয়েছিলো। এরপরও কি কেউ এ কথা বলতে সাহস পাবেন যে, কোনোরকম পুষিয়ে দেওয়ার গ্যারান্টি না পেয়েই বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীর দল এভাবে টাকা ঢেলে দিয়েছিলো।

তিন তিনটে কোম্পানী চালু করার পর সঞ্জয় গান্ধীর মাথায় যেন নতুন নতুন কোম্পানী খোলার একটা নেশা চেপে গেলো। ঘোষণা করা হলো মারুতি হেভি ভেহিকেলস নামে একটি নতুন কোম্পানী খোলা হচ্ছে। এই কোম্পানীর ডাইরেক্টর বোর্ড গঠিত হলো চারজনকে নিয়ে। এঁরা চারজন হলেন : সঞ্জয় গান্ধী, বৌদি সোনিয়া গান্ধী, জালান ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের শ্রী কিষণ লাল জালান এবং মোদি গ্রুপের শ্রী ওম প্রকাশ মোদি।

প্রতিষ্ঠানটি চালাবার জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন তাও এঁরাই জুগিয়ে দিলেন। গান্ধী পরিবারের তরফে মারুতি টেকনিকাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার শেয়ার কেনা হলো, আর মোদি পরিবারের তরফে ওম প্রকাশ মোদি, দ্বারকা প্রকাশ মোদি এবং সত্য নারায়ণ মোদি প্রত্যেকে এক লাখ করে মোট তিন লাখ টাকার শেয়ার কিনলেন। ফলে শুরু হলো চার নম্বর মারুতির জয়যাত্রা।

ভারত সরকার বেশ কিছুদিন ধরে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে একটি হারভেস্টিং মেশিন তৈরির কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে পোল্যাণ্ড সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলো, এবং এটা প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিলো যে ভারত-পোল্যাণ্ড সহযোগিতায় উত্তর প্রদেশে একটি হারভেস্টিং মেসিন ফ্যাক্টরী স্থাপিত হবে। এই কথাবার্তা চলাকালীনই খবর পাওয়া গেলো শ্রী সঞ্জয় গান্ধী বিড়লা পরিবারের জনৈক বন্ধুর মারফত আমেরিকার ইণ্টার-ন্যাশনাল হারভেস্টার কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন যাতে তারা ভারতবর্ষে তাদের হারভেস্টিং মেশিন বেচার জন্য মারুতি কোম্পানীকে সোল সেলিং এজেণ্ট নিযুক্ত করে। আমেরিকায় হারভেস্টিং কোম্পানীর সঙ্গে মারুতির কথাবার্তা যতোই এগোতে লাগলো ততোই দেখা গেলো দিল্লীতে পোল্যাণ্ড সরকারের প্রতিনিধিদের আসা যাওয়া কমে যাচ্ছে। অবশেষে একদিন সেটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেলো। কারণ ততোক্ষণে মারুতি লিমিটেডের সঙ্গে ইণ্টারন্যাশনাল হারভেস্টার কোম্পানীর চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে। মারুতি লিমিটেড ভারতবর্ষে

তাঁদের সোল সেলিং এজেণ্ট নিযুক্ত হয়েছে।

জনতা মোটর গাড়ি তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে যার যাত্রা শুরু হয়েছিলো হারভেস্টিং মেশিন পর্যন্ত পোঁছেও কিন্তু তাঁর লোভের ইতি হলো না, এ লোভ আরো বেড়ে যেতে লাগলো। সঞ্জয় গান্ধী একটার পর একটা কোম্পানী সৃষ্টি এবং তার ডাইরেক্টর হয়ে বসতে লাগলেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনটি কোম্পানী হলো : ড্রিলিং ইকুইপমেণ্ট প্রাইভেট লিমিটেড, আনন্দ মেসিন টুলস্ লিমিটেড এবং মোহন রকি স্প্রিংওয়াটার প্রাইভেট লিমিটেড।

সঞ্জয়জী যতো কোম্পানীর ডাইরেক্টর হয়েই বসুন না কেন, জনতা কিন্তু 'জনতা গাড়ি'র কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলো না। ঘুরে ফিরে সে প্রশ্ন উঠছিলোই। ফলে মাঝে মাঝে তাঁকেও কিছু আশার বাণী শোনাতে হচ্ছিলো।

উনিশ শো পঁচাত্তরের পয়লা এপ্রিল তিনি শেষবারের মতো ঘোষণা করলেন, 'আগামী জুলাই মাস থেকেই "মারুতি" বাজারে ছাড়া হবে। প্রতিদিন উৎপাদিত হবে ছুশোটি করে গাড়ি।' অর্থাৎ এক বছরে বের হবে ৭৩ হাজার মারুতি।

ঘোষণাটা শুনে সারা দেশ যেন একসাথে হো হো করে হেসে উঠলো। সে হাসি সঞ্জয়ের কানে গেলো কিনা বলতে পারবো না, তবে এই সময় থেকে বেশ সিরিয়াসভাবে তিনি ব্যাপারটাকে চিন্তা করতে লাগলেন।

আগেই বলেছি বিড়লাদের সঙ্গে তাঁর দান প্রতিদানের দোস্তি ইতিমধ্যে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলো। ইন্দিরাজীও আর বিড়লাদের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন না, এবং বিড়লারাও সঞ্জয়ের প্রতি 'সেবা' বাবদ যা পাওয়ার তা পেয়ে গিয়েছিলো। তাদের ওপর যেসব মামলা চলছিলো সেগুলো ঝিমিয়ে পড়েছিলো এবং তদন্ত কমিশনের কাজকর্মও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। সুতরাং এবার ইন্দিরাজীর পক্ষে তাঁদের কাছে কিছু চাওয়াটা তেমন অন্যায় বলে মনে হলো না।

ইন্দিরাজী সোজাসুজি ঘনশ্যাম দাসকেই কথাটা বললেন। কারণ,

তিনিই হচ্ছেন বিড়লা পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। সুতরাং যা-কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা তিনিই চট করে নিতে পারবেন, অন্যদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাব দিলেন, মারুতি কারখানার পরিচালন ভার বিড়লারা নিয়ে নিক। এরপর যা কিছু করার তা তাঁরাই করবে, সে ব্যাপারে তিনি কিংবা তাঁর পুত্র কেউই কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবেন না।

প্রস্তাবে ঘনশ্যাম দাস সম্মতি জানালেন। তবে তার সঙ্গে একটি শর্তও জুড়ে দিলেন। বললেন, 'মারুতির দাযিত্ব নিতে রাজি আছি, কিন্তু তার আগে কোলকাতার হিন্দুস্থান মোটরের কারখানাটা বন্ধ করে দেবার অনুমতি চাই। অবশ্য কথা দিচ্ছি, কোলকাতার কারখানায় যারা কাজ করছে তাদেরকে বদলি করে গুরগাঁওয়ের কারখানায় নিয়ে আসবো, এবং মেশিনপত্রও এখানে এনেই বসানো হবে।'

ইন্দিরাজী প্রস্তাবটা শুনে বললেন, 'আচ্ছা দেখি, পরে ভেবে বলবো।'

বিড়লাজী চলে আসার সময় আরো একটা টোপ দিয়ে এলেন, 'যদি অনুমতি দেন তবে সঞ্জয়জীকে আমাদের কোম্পানীতে টেকনিকাল ডাইরেক্টরের পদটায় বসাতে চাই।'

কথাটার ইঙ্গিত বুঝলেন ইন্দিরাজী, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

হিন্দুস্থান মোটর একেবারে বন্ধ করে দেবার প্রস্তাবে সায় দেওয়া তখন তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। কারণ তখনো এলাহাবাদ হাইকোর্টের মামলা চলেছে, এবং তার দেখাশোনা করছেন সিদ্ধার্থ রায়। সুতরাং সে অবস্থায় হিন্দুস্থান মোটর বন্ধ করে দেবার প্রস্তাবে সম্মতি জানানো মানেই সিদ্ধার্থ রায়ের বিরাগভাজন হওয়া। ইন্দিরাজীর পক্ষে সেই পরিস্থিতিতে এতোটা রিস্ক নেওয়া সম্ভব ছিলো না। ফলে প্রস্তাবটা সেখানেই ধামাচাপা পড়ে যায়।

এর কিছুদিন পরে, পঁচাত্তরের এগারোই মে লোকসভায় ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ওঠে। সেদিন মারুতি নিয়ে অবার তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়। বিরোধী সদস্যরা সরকারের বিরুদ্ধে মারুতি

কেলেঙ্কারিতে সহযোগিতার অভিযোগ জানিয়ে সভায় বেশ কিছু প্রমাণপত্র দাখিল করেন। এদের মধ্যে একটি ছিলো বিদেশ থেকে মারুতির ইঞ্জিন ক্রয় সংক্রান্ত চিঠি।

এছাড়া কারখানা তৈরির মালমশলা নিয়ে যে কেলেঙ্কারি করা হয়েছে তার কোনো নজির এদেশে কেন, সারা তুনিয়াতে আর একটিও খুঁজে পাওয়া ভার। গুরগাঁওয়ে কারখানা তৈরির জন্য যতোটা সিমেণ্ট ও ইস্পাতের প্রয়োজন ছিলো তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে সিমেণ্ট ও ইস্পাতের কোটা দেওয়া হয়েছিলো মারুতি লিমিটেডকে। কাজটা করেছিলেন তৎকালীন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল স্বয়ং।

মারুতি লিমিটেড তার কোটায় যে সিমেণ্ট তুলেছিলো তার থেকে একবারে এক লটে ৩২ হাজার ব্যাগ সিমেণ্ট পাচার করে দেওয়া হয়েছিলো দিল্লীর কালোবাজারে। দিল্লীর ইমারতি দোকানগুলো বেশ কিছুদিন শুধু এই চোরাই সিমেণ্ট বেচেই চলেছিলো।

তখন কণ্ট্রোলে সিমেণ্ট পাওয়া যেতো প্রতি ব্যাগ ৩০ টাকা দরে, কালোবাজারে সেই সিমেণ্টই বিক্রি হতো ৬০ টাকা হিসেবে। সুতরাং ৩২ হাজার ব্যাগ সিমেণ্ট বিক্রি করে প্রধানমন্ত্রীর তুলাল একদিনে আয় করেছিলেন ৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। তা থেকে দোকানদারদের কমিশন বাবদ তাকে যদি খুব বেশি দিতে হয়ে থাকে তো বড়োজোর ৬০ হাজার টাকাই দিয়েছেন—তার বেশি তো নয় নিশ্চয়।

ইস্পাতের ব্যাপারেও সেই একই কীর্তি করা হয়েছে। শুধু মাত্র একটি দিনের ঘটনা উল্লেখ করলেই পাঠক অনুমান করতে পারবেন যে এই কেলেঙ্কারির সীমা কোন সুদূরের আকাশকে ছুঁয়েছিলো। একদিন সরকারী টেলেক্স মারফৎ হিন্দুস্থান স্টিলের সদর দপ্তরে জরুরী বার্তা পাঠানো হলো, 'অবিলম্বে ৬ হাজার টন ইস্পাত মারুতি লিমিটেডের নামে পাঠান।' টেলেক্স পেয়ে সদর দপ্তর সাথে সাথে ইস্পাত পাঠাবার ব্যবস্থা করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ইস্পাতের গতি কি হলো জানেন? তার শতকরা ৫০ ভাগই চলে গেলো দিল্লীর কালোবাজারে। তখন প্রতি টন ইস্পাতের কণ্ট্রোল দর এবং কালোবাজারী দরের মধ্যে তফাৎ ৩০০

টাকার। এভাবে বিভিন্ন খেপে মারুতি লিমিটেডের নামে ইস্পাত কিনে কালোবাজারে বেচে দেওয়া হয়েছে, এবং তা থেকে কম করেও পঁচিশ লক্ষ টাকা মুনাফা লুটেছেন গণতান্ত্রিক ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পুত্র।

যতোবার অভিযোগ তোলা হয়েছে পার্লামেণ্টে ততোবারই প্রধানমন্ত্রী তাঁর পুত্রের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। বারবার বলেছেন, 'সঞ্জয় গান্ধী এতো অল্প বয়সে এতো উন্নতি করে ফেলায় অনেকেই সেটাকে সুনজরে দেখতে পারছেন না, তাই ক্রমাগত তার গায়ে কাদা ছিটোবার চেষ্টা চলেছে।' এমনকি তিনি মাঝে মাঝে শাসানিও দিয়েছেন সদস্যদের উদ্দেশ্য করে, 'এভাবে চলতে পারে না ; এভাবে একজন নিরীহ লোকের বিরুদ্ধে কুৎসা রটালে তা সহ্য করা সম্ভব নয়।'

মার আশকারায ছেলের মধ্যে দিনকে দিন কুকর্মের প্রবণতা বেড়েই যেতে থাকে, তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান শুরু করে দেন। মা-ও তাঁকে পেছন থেকে যতোটা মদদ দেওয়া যায় দিয়ে চলেন।

ব্যাঙ্কের লোন পাওয়ার ব্যাপারে যারা যারা তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের প্রত্যেককেই তিনি এক এক করে খতম করে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কিত কিছুটা কাহিনী ইতিমধ্যেই বর্ণিত হয়েছে, বাকিটুকু এবার শুরু করছি।

ইন্দিরা গান্ধী ছেলের স্বার্থে জরুরী অবস্থার সুযোগে সুব্রহ্মনিয়মের কাছ থেকে শুধু যে ব্যাঙ্কিং দপ্তরটাই কেড়ে নিয়ে সেটাকে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাতে [illegible]ল দিলেন তা নয়, তার সাথে প্রণববাবু আয়কর ও শুল্ক বিভাগেরও ভার পেলেন। ফলে ছেলের জন্য ব্যাঙ্কের টাকা পাওয়ার রাস্তা যেমন পরিষ্কার হয়ে গেলো, তেমনি ছেলে যে সব ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধে পাচ্ছে তাদেরও যাতে সে কিছু প্রতিদান দিতে পারে তারও ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের ঝামেলায় ফেলে থাকে যে-দুটো দপ্তর, সেই আয়কর ও শুল্ক বিভাগ, ছেলেরই একজনই পছন্দসই মানুষের হাতে সমর্পিত হলো।

প্রণব মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েই প্রভু-সেবায় প্রাণ মন ঢেলে

দিলেন। ঠিক হলো স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে মারুতি লিমিটেডকে বিপুল পরিমাণ লোন দেওয়া হবে। কিন্তু এই অন্যায় কাজে অসম্মতি জানালেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রী তলোয়ার। তিনি বললেন, যতোক্ষণ তিনি চেয়ারম্যানের পদে আছেন ততোক্ষণ এই বেআইনী কাজ কিছুতেই হতে দেবেন না।

সঞ্জয়ের স্বভাবই হলো তিনি কোনো অধস্তন কর্মচারীর বেআদবি সহ্য করেন না। সুতরাং পার্লামেণ্টে বিল এলো, সরকার প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির যে-কোনো চেয়ারম্যানকে তিন মাসের নোটিশ দিয়ে বরখাস্ত করে দিতে পারবে। বিল আসার সাথে সাথেই জো-হুজুরের দল হাত তুলে সেটাকে আইন বানিয়ে দিলো। তলোয়ার সাহেবের তলোয়ার এক মুহূর্তে ভোঁতা হয়ে গেলো। তাঁকে নোটিশ দেওয়া হলো : তিন মাসের মধ্যে বিদায় হোন। অতীতের ঘটনা থেকে শিক্ষা না নেওয়ায় একজন সুদক্ষ আপোসহীন মানুষকে চিরকালের জন্য ব্যাঙ্কিং জগত থেকে বিদায় নিতে হলো।

এ ধরনের ঘটনা ইতিপুর্বে আরো ঘটেছিলো। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক থেকে বিভিন্ন দফায় সঞ্জয় গান্ধী লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার পরও বার বার আরো টাকার জন্য তাগাদা দিচ্ছিলেন। অথচ ওদিকে তাঁর মারুতির গাড়ি তৈরি হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিলো না। তাছাড়া ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া টাকার সুদও ব্যাঙ্কের ঘরে জমা পড়ছিলো না। সুতরাং সে অবস্থায় যে-কোনো ব্যাঙ্কের পক্ষে আরো ঋণ দিতে অস্বীকার করাটাই ছিলো স্বাভাবিক, এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কও তাই করলো।

ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত শুনে রেগে লাল হয়ে গেলেন গণতন্ত্রের রাজকুমার। মার কাছে আবদার ধরলেন, এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিতেই হবে।

ছেলের কথায় ‘বিগলিত করুণা, জাহ্নবী যমুনা’ হয়ে গেলেন মা। তখন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রী তানেজা। তাঁর ওপর নোটিশ জারি হয়ে গেলো ছাঁটাইয়ের ; বেআদবির শাস্তি পেলেন একজন সৎ প্রশাসক—মাথা নিচু করে চলে যেতে বাধ্য হলেন ব্যাঙ্কের সদর দপ্তর ছেড়ে।

ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর বোর্ডের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে অনুরোধ জানালেন এ আদেশ ফিরিয়ে নেবার জন্য। কর্মীরা ডেপুটেশন নিয়ে গেলো তাঁর কাছে, দাবি জানালো তানেজাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। যিনি তাঁর পুত্রের ইচ্ছাপুরণে বাধা দিয়েছেন তাঁকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে রাজি হলেন না। অতএব সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সদর দপ্তরে সেদিন থেকে একজন নতুন চেয়ারম্যানের বসা শুরু হলো—যাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হলো অতঃপর তিনি সঞ্জয় গান্ধীর স্বার্থ রক্ষা করেই চলবেন।

জরুরী অবস্থা ঘোষণা করাতে সঞ্জয় গান্ধীর হাতে যেন আকাশের চাঁদ নেমে এলো। প্রণব মুখোপাধ্যায়কে তিনি ব্যাঙ্কিং, আয়কর ও শুল্ক বিভাগের মন্ত্রী তো করেছিলেনই, তাছাড়াও শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, ক্রেডিট পলিসি ইত্যাদি বিভাগের ভারও তাঁকেই দেওয়া হলো। সুতরাং বাংলায় যাকে বলা হয় 'সোনায় সোহাগা' ব্যাপারটা ঘটলো তাই। আর প্রণব-বাবুও প্রভুর দয়াকে মনে রেখে নিজেকে একেবারে সমর্পণ করলেন প্রভুর শ্রীচরণে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে হুড়হুড় করে লোন বেরোতে লাগলো মারুতি লিমিটেডের নামে।

জরুরী অবস্থা শুরু হওয়ার আগেই মারুতি লিমিটেড একটার পর একটা নতুন কোম্পানী প্রসব করে চলেছিলো। সঞ্জয় গান্ধীও মোটর গাড়ি তৈরিতে ব্যর্থ হয়ে কখনো 'বিশেষজ্ঞ' সাজছিলেন, কখনো '[illegible] এসেম্বল' করছিলেন, আবার কখনো বা বাসের বডি তৈরির জন্য ছুতোর মিস্ত্রির ভূমিকায় নামছিলেন। কিন্তু জরুরী অবস্থা চালু হয়ে যাওয়াতে তাঁর আর ওসব ছোটোখাটো কাজে মন লাগলো না। তিনি ঠিক করলেন, এবার এমন কিছু করবেন যাতে একটা দাঁও মারলেই টাকার পাহাড় জমে উঠবে।

ইণ্টারন্যাশনাল হারভেস্টার কোম্পানীর সঙ্গে ইতিপূর্বে মারুতী লিমিটেডের চুক্তি হয়েছিলো হারভেস্টিং মেসিন বিক্রির, এবার কথাবার্তা শুরু হলো প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ভারী ট্রাক তৈরির। কারণ ততোদিনে 'জরুরী অবস্থা জারির ব্যাপারে পুর্ণ সম্মতি না থাকার কারণে' প্রতিরক্ষা

মন্ত্রী স্বর্ণ সিংয়ের চাকরি চলে গেছে, সেখানে এসেছেন স্বনামধন্য বংশীলাল। সুতরাং এরপর আর মারুতি লিমিটেডের তৈরি সামগ্রী প্রতিরক্ষা দপ্তরে বেচার ব্যাপার কোনো অসুবিধেই থাকতে পারে না। স্পেসিফিকেশন, অনুযায়ী মাল তৈরি হয়নি বলে কেউ আর এরপর আপত্তি জানাতে আসবে না—কারণ প্রত্যেকেই কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সংসার করে ; এ বাজারে চাকরি চলে যাক এটা কেউই চায় না। অতএব ট্রাক তৈরির আলোচনা পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চললো।

মারুতির প্রস্তাব নিয়ে ইণ্টারন্যাশনাল হারভেস্টার অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দেখলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে সঞ্জয়জীর শর্তে বনলো না। তখন কথাবার্তা শুরু হলো অন্য ছ একটি ইউরোপীয় ফার্মের সঙ্গে। এবার ট্রাকের সাথে ক্রেনও জুড়ে গেলো। ঠিক হলো ট্রাক তৈরিই শুধু নয় মারুতি ক্রেনও তৈরি করবে। সে অনুযায়ী আলাপ আলোচনা চলতে লাগলো ; অবশেষে চুক্তি সাক্ষরিত হলো দুটি জার্মান সংস্থার সঙ্গে। এদের একটি হচ্ছে এম. এ. এন আর অন্যটি ডেমাস।

ট্রাক ও ক্রেন তৈরির ব্যবস্থা তো হলো, এবার বিমানের ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখলে হয় না? বামন লম্বা হতে হতে এতোদিনে প্রায় চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন, সুতরাং বিমান ছাড়া তাঁর এরপর আর চলবে কি করে! অতএব লোক গেলো আমেরিকায়, ইউরোপে। আলোচনা শুরু হলো দ্যা পাইপার এয়ারক্রাফট লিমিটেড, বোয়িং এয়ারক্রাফট কোম্পানী ও অন্যান্য কয়েকটি বিমান উৎপাদক-সংস্থার সাথে।

শেষ পর্যন্ত একটা চুক্তি সম্পাদিত হলো দ্যা পাইপার এয়ারক্রাফট লিমিটেড এবং মারুতি টেকনিকাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের মধ্যে। ঠিক হলো মারুতি ভারতবর্ষে পাইপারের তৈরি বিমানের একমাত্র সেলিং এজেণ্ট হবে। সে আপাতত যে বিমানগুলো আমদানি করবে সেগুলো সাইজে খুবই ছোটো। মোট আসন সংখ্যা সাত। এক একটার দাম পড়বে ৫০ লক্ষ টাকা।

বিমানগুলোর নাম 'নাভাজো চিফটান।' অবশ্য 'পাইপার কাব' হিসেবেই সেগুলো সবিশেষ পরিচিত। চুক্তি অনুযায়ী প্রথম একটি

স্যাম্পেল বিমান ইতিমধ্যে আনানো হয়েছে, সেটি আপাতত আছে দিল্লীর এয়ারো ক্লাবের হেফাজতে।

চুক্তি সম্পাদনের পরই খদ্দের যোগাড়ের কাজ শুরু হয়ে যায়। ঠিক হয় প্রথম দফায় মহারাষ্ট্র সরকার ১টি, পাঞ্জাব সরকার ২টি, উত্তর প্রদেশ সরকার ১টি, হরিয়ানা সরকার ১টি, এবং রাজস্থান সরকার ১টি— মোট ৭টি বিমান কিনবে। এছাড়া বেশ কয়েকটি প্রাইভেট পার্টিও প্রধানমন্ত্রীর ছেলের আমদানি করা বিমান কিনতে রাজি হন। এঁরা হলেন বিড়লা ব্রাদার্সের কে. কে. বিড়লা, মোহন মেকিন ব্রেওয়ারিজের কপিল মোহন, কোকাকোলা লিমিটেডের চন্দ্রজিৎ সিং, ভারত স্টিল টিউবসের রৌণক সিং, অটোমোবাইল প্রডাক্টস্ অব ইণ্ডিয়ার সাগর সুরী এবং ইলেকট্রিকাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর কমল নাথ। ঠিক হয় সাতাত্তরের সেপ্টেম্বর নাগাদ 'পাইপার' ডেলিভারির কাজ শুরু হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার আগেই হঠাৎ ঘাড়ের ওপর সাধারণ নির্বাচন এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এক ধাক্কায় রানী এবং রাজকুমার দুজনেই কাৎ। সুতরাং এরপরও আর ভারতের আকাশে 'নাভাজো চিফটান'-এর সর্দারি চলতে দেওয়া হবে কিনা সেটাই প্রশ্ন।

মারুতির কাহিনী অনেক বলেছি। এ নব-মহাভরতের কথা শেষ হবার নয়। বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, অনুমান করি শুনতে শুনতে পাঠকও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সুতরাং এবার অন্য কথা শুরু করা যাক।

কংগ্রেসের মধ্যে বিন্দুমাত্র মাথা তুলে দাঁড়াবার সম্ভাবনা যাদের ছিলো জরুরী অবস্থা জারি করে তাদের প্রত্যেকের মাথা একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়। শুধু ওপরের দিকে জেগে উঠতে থাকে দুটি মাথা: একটি ইন্দিরাজীর অন্যটি সঞ্জয়ের।

এই দুজনের আশেপাশে উঁকিঝুঁকি দেওয়া শুরু হয় আরো দু চারটি মাথার। তবে সেগুলোর সবকটিই সাম্রাজ্ঞী এবং রাজকুমারের কাছ

থেকে আগে থাকতে অনুমতিপ্রদত্ত ছিলো ; বিনা অনুমতিতে কারো উঁকিঝুঁকি মারাটাও তখন আইনতঃ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

এদেরই একজন বংশীলাল। হরিয়ানাতে কেলেঙ্কারির এভারেস্টে চড়ে যাওয়ার পর তাঁর ডাক আসে দিল্লী থেকে। সর্দার স্বরণ সিং মাঝে মাঝে জরুরী অবস্থা নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে একটু আধটু বেফাঁস মন্তব্য করে ফেলছিলেন, ফলে তাঁকে অপারেশন টেবিলে পাঠিয়ে দেবার কথা প্রায়ই ইন্দিরাজীর মনে জাগছিলো। শেষে একদিন সত্যি সত্যিই তিনি প্রেসক্রিপশন দিলেন সর্দারজীকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাবার জন্য। হাজার আপত্তি এবং চিৎকার চেঁচামেচি সত্ত্বেও সর্দারজীকে প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো বাইরে। সেখানে বীর বিক্রমে প্রবেশ করলেন কেলেঙ্কারির এভারেস্ট-জয়ী নায়ক শ্রী বংশীলাল। তাঁর সঙ্গে জয়েণ্ট সেক্রেটারি হয়ে এলেন মিশ্র নামে এক অফিসার। ইনি হরিয়ানায় থাকতেই অনেক কীর্তি করেছিলেন, এবার দিল্লীতে এসে উঠে পড়ে লেগে গেলেন নতুন নতুন কীর্তি স্থাপনে।

তখন প্রতিরক্ষা সচিব ছিলেন গোবিন্দ নারায়ণ। ভদ্রলোকের সৎ প্রশাসক হিসেবে কর্মচারী মহলে সুনাম ছিলো। তিনি অনেকদিন ধরেই প্র তরক্ষা দপ্তরে মাল কেনার ব্যাপারে কমিশন এজেণ্টদের অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করে আসছিলেন। ফলে আঁতে ঘা লাগছিলো সঞ্জয়ের। কেননা, তথাকথিত এজেণ্টদের বেশির ভাগই ছিলো তাঁর বেনামদার। তাই, যখন নারায়ণের কার্যকাল শেষ হয়ে গেলো তখন সার্ভিস রেকর্ড ভালো থাকা সত্ত্বেও তাঁকে আর এক্সটেনসন দেওয়া হলো না।

কথায় আছে রতনে রতন চেনে। প্রতিরক্ষা দপ্তরে বংশীলাল এসে বসার পরই সেখানে লুটপাটের রাজত্ব শুরু হয়ে গেলো। বংশীলালজী হরিয়ানা থেকে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিলেন জয়েণ্ট সেক্রেটারি মিশ্রকে ; তার সাথে অতিরিক্ত সংযোজন ঘটালেন সঞ্জয়জী। উপমন্ত্রী পদে সর্বসময়ের জন্য জুড়ে দেওয়া হলো উড়িষ্যার নন্দিনী শতপথী বিরোধী গ্রুপের নেতা জে. বি. পট্টনায়ককে।

প্রতিরক্ষা দপ্তরে নিজের লোক বসাবার আগেই ব্যাঙ্কিং, আয়কর, শুল্ক, শিল্প উন্নয়ণ ব্যাঙ্ক ও ক্রেডিট পলিসি দপ্তরে বসে গেছেন শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁর সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে আর. কে. পুরী এবং এস. আর. মেহতাকে। একজনকে বসানো হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্য-জনকে ভার দেওয়া হয়েছে আয়কর দপ্তরের।

বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় একটু বেগরবাই করছিলেন, তাঁকে ডেকে একদিন ধমকে দেওয়াতেই তিনি একেবারে কেঁচো হয়ে গেলেন। তাঁকে সবসময় সামলে রাখার ভার পড়লো তাঁর বিশেষ ব্যক্তিগত সচিব এন. কে. সিংয়ের হাতে। দুর্নীতির ব্যাপারে ভদ্রলোকের বাজারে অনেক আগে থাকতেই সুনাম ছিলো, এবার সে সুনাম আরো বাড়া শুরু করলো।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার ছিলো ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির হাতে, কিন্তু অর্ডার যা দেওয়ার সেটা দিতেন সঞ্জয়ের নিজস্ব লোক ওম মেহতা। জরুরী অবস্থা ঘোষনার কয়েকদিন আগেই হঠাৎ কোনোরকম পূর্ব নোটিশ ছাড়াই একদিন বরখাস্ত হয়ে গেলেন হোম সেক্রেটারি শ্রী এন. কে. মুখার্জী। কি কারণে তাঁকে বরখাস্ত করা হলো তা জানার সুযোগটুকুও তিনি পেলেন না। শুধু বলা হলো, আপনার আর অফিসে আসার দরকার নেই।

শ্রী মুখার্জীর জায়গায় এসে বসলেন একেবারে নতুন একটি মানুষ। তাঁর নাম খুরানা। ভদ্রলোক রাজস্থান সরকারের অধীনে কাজ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর ডাক পড়লো দিল্লীতে। ডাক পাঠিয়েছেন তাঁর বাড়ির জামাই সঞ্জয় গান্ধী।

জামাইয়ের সাথে দেখা করে তিনি জানতে পারলেন এবার থেকে তাঁকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হোম সেক্রেটারির পদটা সামলাতে হবে। খুশিতে ডগমগ করে উঠলেন খুরানা সাহেব ; পরদিনই যোগ দিলেন নতুন পদে। তাঁকে সব ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য হরিয়ানা থেকে ভিনদার নামে একটি অমূল্য রত্নকে সাপ্লাই করলেন বংশীলাল। এই ভিনদারই প্রকৃত পক্ষে সেদিন থেকে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের যা কিছু ক্ষমতা উপভোগ করতে লাগলেন। এরপর থেকে তাঁর হুকুমেই সব কিছু

চলতে লাগলো।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার দিন থেকেই যে দপ্তরটি দখল করার জন্য সঞ্জয় গান্ধী উঠে পড়ে লেগেছিলেন সেটি হচ্ছে তথ্য ও বেতার দপ্তর। এই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন শ্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল। ভদ্রলোক এককালে ইন্দিরা গান্ধীর যথেষ্ট সেবা করেছিলেন। বলতে কি 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'কে 'অল ইন্দিরা রেডিও'তে পরিণত করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছিলো তাঁরই। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তিনি ছিলেন সামান্য সি. পি. আই ঘেঁষা, কিংবা আর একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় ছিলেন 'মস্কোপন্থী।'

এই 'মস্কোপন্থী' হওয়াটাই হলো তাঁর কাল। তাঁকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দেওয়া হলো তথ্য দপ্তর থেকে প্ল্যানিং-এ। পরে সেখান থেকেও ছুটি হয়ে গেলো। তখন তিনি ইন্দিরাজীর হাতে পায়ে ধরে বললেন, 'এভাবে বেইজ্জত করবেন না, আমি তো চিরটা কাল আপনারই সেবা করে এলাম।'

এককালের সেবকের আবেদনে মনটা নরম হলো সম্রাজ্ঞীর। বললেন, 'ঠিক আছে, আপনাকে মস্কোতে রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

কথায় আছে, 'নেই মামার থেকে কানা মামাও ভালো।' সুতরাং কিছু না পাওয়ার থেকে মস্কোতে রাষ্ট্রদূতের কাজটাও যে পাওয়া গেছে এতেই খুশি হয়ে বাক্স পেটরা বেঁধে মস্কোর পথে দিল্লী ছাড়লেন গুজরালজী। তবে সেখান থেকে প্রতিমুহূর্তে যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের সাথে। বহুগুণা, রজনী প্যাটেল, চন্দ্রজিৎ যাদব কিংবা নন্দিনী শতপথী—এঁদের কাউকেই তিনি কখনো ভুলে যাননি। তাই জনতা পার্টি জেতার সাথে সাথেই দিল্লী চলে এসেছেন প্রগতিশীল বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে 'যোগাযোগ' করতে।

গুজরালকে হটিয়ে সেখানে বসানো হলো সঞ্জয়ের একান্ত কাছের মানুষ বিদ্যাচরণ শুক্লাকে। তথ্য ও বেতার দপ্তর হাতে পেয়েই শুক্লাজী গোয়েবলসের ডায়রীটা পড়ে নিলেন একবার। কিভাবে জার্মানরা প্রচারের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে হিটলারের প্রতি নেশাগ্রস্ত করে তুলেছিলো সেটা জেনে নিয়ে তিনি লেগে পড়লেন কাজে। দিনরাত ধরে মাতৃবন্দনা এবং

পুত্র-প্রশস্তি চলতে লাগলো রেডিওতে। তারপর শুরু হলো চলচ্চিত্র জগতের ওপর হামলা। প্রচারে প্রচারে আতঙ্কিত করে ফেলা হলো সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তো হরণ করা হয়েছিলোই, এবার চেষ্টা চললো তাকে পুরোপুরি ক্রীতদাসে পরিণত করার। সঞ্জয় প্রশস্তিতে কোনো কাগজ যদি বিন্দুমাত্র ভাঁটা দিয়েছে তো অমনি তার মালিককে ডেকে হুমকি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যাবে, কিংবা নিউজপ্রিন্টের কোটা কমিয়ে দেওয়া হবে।

আগে যে সব বেসরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ছিলো তাদের জোর করে বন্ধ করে দিয়ে তৈরি করা হলো সমাচার নামে একটি মাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান। তার মাথায় বসিয়ে দেওয়া হলো আর. কে. নিগম নামে একজন অকর্মণ্য লোককে যাঁর সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে আগে কোনো জ্ঞানই ছিলো না।

সঞ্জয়ের গাড়ি চুরির পরিকল্পনার সঙ্গী আদিলের পিতা মহম্মদ ইউনুস, যিনি সঞ্জয়ের মধ্যে ছোটোবেলা থেকেই ফোর্ড কিংবা ক্রাইসলার হবার মতো মৌলিক প্রতিভা আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি এবার এগিয়ে এলেন প্রচারের সাহায্যে সঞ্জয়কে মগডালে চড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা নিয়ে। তৈরি হলো 'দ্যা কমিউনিকেশন সেণ্টার অব ইণ্ডিয়া' নামে একটি প্রচার সংস্থা। সাথে সাথে সরকারী টাকার স্রোত বইতে লাগলো। যে সব পত্রিকা খেয়ে না খেয়ে সঞ্জয়ের গুণকীর্তনে নেমে পড়লো তাদেরকে পেছন থেকে টাকা যোগাতে লাগলো এই সংস্থা। তাছাড়া বিদেশে সঞ্জয় এবং তাঁর মার বাণী পৌঁছে দেবার জন্য ট্রেনিং দেওয়া লোকজনদের পাঠাবার বিধি ব্যবস্থাও এই সংস্থার ওপরেই বর্তালো। একের পর এক দালালকে পয়সা খরচ করে ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় পাঠানো হতে লাগলো জরুরী অবস্থার গুনকীর্তন করতে।

মন্ত্রীসভায় যে দুজন প্রথম শ্রেণীর মস্কোপন্থী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে তাত্ত্বিক বলে প্রচারিত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনেক আগেই প্রভুপদে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, বাকি ছিলেন চন্দ্রজিৎ যাদব। তাঁকে একদিন ডেকে পাঠালেন সঞ্জয়জী, জানতে চাইলেন তিনি আর মন্ত্রী থাকতে চান

কিনা। এককালের উঁচু জাতের কম্যুনিস্ট বিপদ আন্দাজ করতে পেরেই বললেন, আপনি যা বললেন তাই করবো, কোনোরকম বেয়াদবি দেখলে তখন নয় শাস্তি দেবেন।

ইস্পাত মন্ত্রণালয়ে নিজের লোক থাকা দরকার ছিলো সঞ্জয়ের; কারণ ইস্পাতের দর চোরাবাজারে চিরকালই চড়া, তাই চন্দ্রজিতের কাছ থেকে তিনি ইঙ্গিতে জেনে নিতে চেয়েছিলেন, তাঁর অভিপ্রেত লোকজনেরা ইস্পাতের কোটা পাবে কিনা? তাদেরকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে গন্য করা হবে কিনা?

চন্দ্রজিতের সম্মতি পেয়ে তিনি আর তাঁকে হাড়িকাঠে চড়ালেন না, নিজের দু একজন বিশ্বস্ত লোককে তাঁর দপ্তরে ঢুকিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন। এরপর ইস্পাতের কোটা পাওয়ার ব্যাপারে তাঁর লোকজনদের কোনো অসুবিধে হয়েছে বলে কখনো শোনা যায়নি। কারণ তা যদি হতো তাহলে আর চন্দ্রজিতজীকে মার্চ মাসের ২২ তারিখ পর্যন্ত ইস্পাত দপ্তরে থাকতে হতো না—তার অনেক আগেই তাঁকে বিদায় করে দেওয়া হতো ইস্পাত ভবন থেকে। সেক্ষেত্রে তখন তাঁর পক্ষে বহুগুণার সাথে ফোনে যোগাযোগ করে স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কোনো পথ থাকতো না।

আনুগত্য প্রকাশের প্রতিযোগিতায় সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলেন যিনি তিনি অন্ধ্রের কে. রঘুরামাইয়া। ইনি গুন্টুরের এক জনসভায় প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'আমি আমার সারাজীবন ধরে নেহরু পরিবারের দু পুরুষের সেবা করে এসেছি। আজ এই বিশাল জনসভায় উপস্থিত জনতার সামনে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, বাকি জীবনটা এই পরিবারেরই তৃতীয় পুরুষের সেবায় নিয়োজিত করবো।'

কুকুরের মতো পদলেহনকারী এই লোকটি, যিনি নিজেকে ক্রীতদাস প্রমাণ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, তিনি নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত যতোভাবে পেরেছেন 'তৃতীয় পুরুষের' সেবা করার কাজ দ্রুত গতিতে চালিয়ে গেছেন। তাঁকে সঞ্জয় যেদিকে কান ধরে টেনেছেন, তিনি সেদিকেই মাথা ঘুরিয়েছেন। তবে ইদানীং শোনা যাচ্ছে, সেই কান আর সঞ্জয়ের হাতের মুঠোয় নেই, সেটাকে তিনি জোর করে টেনে

ছাড়িয়ে এনেছেন। কারণ এতোদিনে তাঁর খেয়াল হয়েছে নির্বাচনে তিনি বিজয়ী, আর সঞ্জয় পরাজিত। একজন বিজয়ী বীরের সঙ্গে একজন পরাজিত সৈনিকের কোনো সম্পর্কই থাকতে পারে না, সুতরাং ক্রীতদাসত্বের যে অঙ্গীকার তা-ও এখন 'ইনভ্যালিড।'

এই সব কোয়ালিটির মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সঞ্জয় দেশ জয়ের অভিযানে বেরিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন বোকা বানাবার খেলায় দেশের জনতাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ তাদের মনটাকে তাদেরই অজান্তে চুরি করে এনে ভরে ফেলবেন এক নম্বর সফদরজঙ্গ রোডের চোর-কুঠুরিতে। কেউ সে কথা জানতে পারবে না, কেউ তা বুঝতেও পারবে না। মাঝখান থেকে কোটি কোটি মানুষের হৃদয় হারিয়ে যাবে ; কোটি কোটি মানুষ হৃদয়হীন হয়ে ঘুরে বেড়াবে পথে পথে।

হৃদয়হীন মানুষ তৈরি করতে হলে তাদেরকে আগে গৃহহীন করা দরকার—এটা সঞ্জয় জানতেন, জানতেন তার মা-ও। তাই পরিকল্পনা করা হলো, প্রথমে যতো বেশি মানুষকে পারা যায় গৃহহীন করা হবে, তারপর আপনিই শুরু হয়ে যাবে হৃদয়হীন করার কাজ। কারণ, যে মানুষের ঘর নেই, ঘরের টান নেই সে মানুষ এমনিতেই হৃদয়হীন হয়ে ওঠে। দুনিয়ার অনেক ব্যাপারেই সে উদাসী হয়ে পড়ে, অনেক ব্যাপারকেই সে মনে করে ফালতু। ঘরের টান না থাকলে বিবেকের টানও বেশ ঝিমিয়ে আসে, তখন আর তার পক্ষে অনেক অন্যায় কাজকেও অন্যায় বলে মনে হয় না। তার পক্ষে তখন নীতি আর দুর্নীতির তফাৎ করাটা সত্যিই কঠিন হয়ে ওঠে।

সোজাসুজি 'হৃদয়হীন করার জন্যই আপনাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে' বললে যে অনেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আগে থাকতে সতর্ক হয়ে যাবে—সেটা মা-ছেলে দুজনেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই পরিকল্পনাটার কায়দা করে নাম দেওয়া হলো 'শহর সৌন্দর্যকরণ' পরিকল্পনা। অর্থাৎ কিনা শহরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলার জন্যই মানুষকে গৃহহীন করা হচ্ছে।

বাইরে কোথায় কি হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার দরকার

মনে করি না, শুধুমাত্র খাস দিল্লীতেই যে তুঘলঘী কাণ্ড ঘটেছে তার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিলেই পাঠকরা স্তম্ভিত হয়ে যাবেন।

সেটা বর্ষাকাল, অবিরাম আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি পড়ছে, মানুষজন রাস্তায় বের হচ্ছে না ভয়ে, কী জানি, যদি রাস্তা ঘাটে জল জমে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায় তখন বাড়ি ফিরবো কি করে। লরেন্স রোডের দিকে, অশোক বিহারে যাবার রাস্তার আশপাশের বস্তিগুলোতে তখন অবর্ণনীয় দুর্দশা। খাটা পায়খানা ভর্তি হয়ে গেছে, বস্তিতে ঢোকার পথগুলো চেনার উপায় নেই, জলের তলে সেগুলো কোথায় যে লুকিয়ে রয়েছে তা খুঁজে বের করাও এক ঝকমারি! সারা বস্তির লোক জল নিতো যে কলটা থেকে সে কলটাও যে কখন খারাপ হয়ে গেছে তা একমাত্র ওপরওলাই জানেন; আবার তাতে কখন জল আসবে সেটাও সেই ওপরওলারই হাতে।

ওপরওলা বলতে এখানকার লোকেরা ভগবানকে নির্দেশ করেন না, তাদের কাছে ওপরওলা হলো ডি. ডি. এ. অর্থাৎ দিল্লী ডেভেলভমেণ্ট অথরিটি। তারা যদি দয়া করে জল ছাড়ে তবেই এখানকার মানুষ জল পাবে; তারা যদি দয়া করে লোক পাঠান কল সারাবার জন্য তবেই এ মহল্লার লোকে তৃষ্ণায় একটু পিপাসা মেটাতে পারবে।

কল সারাবার আবেদন নিয়ে কিছু লোক আগের দিনই গিয়েছিলো ডি. ডি. এ-র সদর দপ্তরে। সেখান থেকে বলা হয়েছিলো, 'ঠিক আছে, দেখছি; কাল লোক যাবে।'

অফিস থেকে আশ্বাসবাণী শুনে ফিরে এসেছিলো গরিব মানুষগুলো। বস্তিতে এসে বলেছিলো কালই অফিস থেকে 'বাবু' আসবেন জলের ব্যবস্থা করে দিতে। সাথে সাথে এ-ও ঠিক হয়েছিলো, বাবু এলে খাটা পায়খানাটার একটা ব্যবস্থা করে দেবার জন্য অনুরোধ জানানো হবে।

পরদিন কথা মতো 'বাবু' এলেন। তখন রাত দশটা। বাইরে বেশ জোরেই বৃষ্টি পড়ছে; তবে বিকেলের দিকে যেমন মুষলধারায় পড়ছিলো এখন আর সেরকম নেই, গতিটা অনেকটা কমেছে; হাওয়ার তেজও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

'বাবু'কে দেখেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলো বস্তিবাসীরা। এ লোক যে কখনো তাদের বস্তিতে পায়ের ধূলো দিতে আসবেন তা সমবেত মানুষের মেলার একটি প্রাণীও কোনোদিন কল্পনা করেনি। আজ তাই তাকে নিয়ে তারা কি যে করবে তা ঠিকই করে উঠতে পারলো না।

একজন সাহস করে এগিয়ে এসে বললো, 'ভিতরে আসুন না স্যার, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে বৃষ্টিতে ভিজে যাবেন।'

আর একজন বললো, 'পায়খানার ময়লা সব জলে মিশে গেছে; এ নোংরা জলের মধ্যে আপনার দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক নয়—'

তৃতীয় একজন, দ্বিতীয়ের কথা শেষ না হতেই সোৎসাহে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ স্যার, এতে অসুখ করবে।'

'চুপ করো বদতমিজ, বেশি বাজে বোকো না।' হঠাৎ বাজখাঁই গলায় ধমকে উঠলেন 'বাবু'টি। তার ধমকে সারাটা এলাকায় যেন কারফিউ লেগে গেলো, একটি লোকের মুখেও আর 'রা' শব্দটি নেই—সবাই চুপচাপ, নিশ্চল, বোবা।

বাবুটির নাম জগমোহন। দিল্লী ডেভেলপমেণ্ট অথরিটির ইনিই হচ্ছেন সর্বেসর্বা। সেটা তিনি হতে পেরেছেন সঞ্জয়ের দয়ায়। সুতরাং সেই দয়ার গতি অব্যাহত রাখার চেষ্টায় সঞ্জয়জী যখন তাঁকে যা বলেন তিনি সে কাজেই নিজেকে সঁপে দেন। তাঁর নিজস্ব কোনো মতামত নেই, নিজস্ব কোনো চিন্তা নেই, নিজস্ব কোনো ধ্যান-ধারণা নেই। তিনি প্রভুর ইচ্ছাতেই চলেন, প্রভুর ইচ্ছাতেই বলেন, প্রভুর ইচ্ছাতেই দেখেন। তাঁর কান আছে, তবে সে কান শুধু প্রভুর হুকুম শোনার জন্য; তাঁর চোখ আছে, সে চোখ শুধু প্রভু নির্দেশিত বস্তু দেখার জন্য; তার নাক আছে, সে নাক শুধু প্রভুর পদযুগলের ঘ্রাণ নেবার জন্য; আর আছে একটি মস্তক যেটি সংরক্ষিত রয়েছে শুধু প্রভুর সামনে ঝুঁকে পড়ার জন্য।

এই লোকটির ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর একজন কীর্তিমান; ইনি হচ্ছেন শ্রী বি. আর. টামটা। পদমর্যাদায় ইনি দিল্লীর মেট্রোপলিটন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। জনসাধারণ এর কাজের জন্য একে 'বি. আর. চামচা' বলে ডাকে। ইনিও চরিত্রগতভাবে জগমোহনেরই

স্বগোত্রজ।

ধমক খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নিশ্চুপ জনতা এবার একটু আধটু নড়াচড়া শুরু করলো। ফিস্‌ফিস্‌ গুঞ্জন শোনা যেতে লাগলো বাতাসে। কিন্তু কে কি বলছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

জগমোহন এবার গলাটাকে আরো চড়িয়ে উপস্থিত ভীতচকিত মানুষগুলোকে সম্বোধন করে বললেন, 'শোনো, আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে যার যা নেবার গুছিয়ে নিয়ে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাও।'

আগেই বলেছি, বৃষ্টি পড়ছিলো, হাওয়ার তেজ কিছুটা কমে গেলেও একেবারে থেমে যায়নি, তবে বজ্রপাত ছিলো না। সে কথা আমি উল্লেখও করিনি। কিন্তু এবার করতে হচ্ছে, কারণ এবার সত্যি সত্যিই বজ্রপাত ঘটেছে।

সারাটা আকাশ মাথায় ভেঙে পড়লেও বোধহয় মানুষ এতোটা বিচলিত হতো না, যতোটা বিচলিত হলো জগমোহনের কথা শুনে। মনে হলো যেন হাজারটা বজ্রপাত ঘটেছে একসাথে; যেন বজ্রের আঘাতে একসাথে সমগ্র এলাকাটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

ফিস্‌ফিসানি আস্তে আস্তে গুঞ্জনে পরিণত হলো; গুঞ্জন ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হলো শব্দ তরঙ্গে, তারপর প্রবল আক্রোশে সেই শব্দের ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো জগমোহনের মুখের ওপর। একসাথে কয়েক হাজার স্ত্রী-পুরুষের জিজ্ঞাসা উত্থিত হলো: 'কেন, কেন যাবো এখান ছেড়ে? এ ঘর আমরা তৈরি করেছি, শরীরের মেহনত দিয়েছি। রোদে জলে ঝড়ে দিনরাত খেটে এটুকু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছি নিজেরা আর আপনি কিনা আজকে বলছেন সেটাকে ছেড়ে দিয়ে যেতে! বললেই হলো? আপনি আপনার নিজের ঘর ছেড়ে একবার ছেলে বউকে নিয়ে দাঁড়ান তো গিয়ে ফুটপাথে; তারপর আমাদের এসে বলবেন, দেখবেন তখন বের হই কিনা।'

'অতো বড়ো বড়ো লেকচার শুনতে চাই না,' জগমোহন শাসানির সুরে বললেন, 'যা বলেছি তাই করো। না হলে পিটিয়ে বের করে দেবো।'

'পেটাবেন? পেটান কিন্তু ঘর থেকে বের করতে পারবেন না।

এ-ঘর আমাদের, আমরা এ-ঘর ছেড়ে যাবো না।'

অশিক্ষিত, খেতে না পাওয়া মানুষের মুখে এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আস্ফালন শুনে জগমোহনের 'ভদ্দরলোকি' রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠলো; তবু নিজেকে তিনি সামলে নিলেন। ইচ্ছে হচ্ছিলো, এখনি বুলডোজার চালিয়ে এই লোকগুলোকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেন; কিন্তু না, তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, 'ভদ্রলোকদের এভাবে হঠাৎ উত্তেজিত হলে চলে না। উত্তেজনাটা ছোটোলোকদের ব্যাপার, ওটা ছোটোলোকদেরই মানায় ভালো। আমাদের যা-কিছু করতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়। মেরে ঠাণ্ডা করে দেবার জন্যও মাথা ঠাণ্ডা রাখাটা একান্ত দরকার।'

কিছুক্ষণের মধ্যে সোরগোল এমন পর্যায়ে উঠলো যে কানে তালা লাগার যোগাড়। ওদিকে মাইক চালু হয়ে গেছে। মাইকে টামটা ঘোষণা করে চলেছেন, 'আপনাদের আধ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিলো, তার মধ্যে পনেরো মিনিট কেটে গেছে, হাতে আর সময় আছে মাত্র পনেরো মিনিট। যে যার জিনিসপত্র নিয়ে ঘরের বাইরে চলে আসুন, না হলে বুলডোজারের তলায় সব গুঁড়িয়ে যাবে। মনে রাখবেন, এ কাজ আপনাদের ভালোর জন্যই করা হচ্ছে। যুব নেতা সঞ্জয় গান্ধীর নির্দেশেই আমরা এসেছি। ভবিষ্যতের সুখী জীবন গড়ে তোলার জন্য, ভবিষ্যতের সুন্দর ভারত গড়ে তোলার জন্য, গরিবী হটাবার জন্য—'

কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে পড়লো। দারিদ্রের যাতনায় অস্থির মানুষগুলো 'গরিবী হটাবার' নাম শুনেই জ্বলে উঠলো। প্রচণ্ড আক্রোশে চিৎকার শুরু করে দিলো, 'গরিবী হটাবার নাম করে গরিব মারা চলবে না, চলবে না। সঞ্জয় গান্ধী মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ।'

সঞ্জয় গান্ধী মুর্দাবাদ! বলে কী লোকগুলো!

'শালা কুত্তার বাচ্চা—' একজন পুলিশ অফিসার আর সংযত রাখতে পারলো না নিজেকে, ব্যাটন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর ওপর। এলোপাতারি ব্যাটনের বাড়ি পড়তে লাগলো নারী পুরুষ নির্বিশেষে অর্দ্ধনগ্ন সিক্ত দেহগুলোর মাংসবিহীন কাঠামোর খাঁজে খাঁজে।

মুহূর্তে শুরু হয়ে গেলো তুলকালাম কাণ্ড। ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি, আর্তনাদ, ক্রন্দনের শব্দে ভরে উঠলো সারাটা এলাকা। পুলিশ যাকেই হাতের সামনে পেলো তাকেই পেটাতে লাগলো; বুড়ো, বাচ্চা, অথর্ব, অসুস্থ কোনো কিছুর বাছবিচার করলো না। ঘরের মধ্যে ঢুকে ঢুকে জিনিসপত্র ফেলে দেওয়া হতে লাগলো বাইরে। যাদের যা কিছু সম্বল ছিলো—কাঁথা, কম্বল, সায়া, সেমিজ, ফ্রক, ব্লাউজ, হাফপ্যান্ট, গেঞ্জি, ঘটি, বাটি, গেলাস, থালা—সব কাঁদায় মাখামাখি হয়ে গেলো, শক্ত জিনিস দুমড়ে মুচড়ে গেলো পায়ের চাপে। হাজার হাজার খেটে খাওয়া মানুষ একজন পাগলা তুঘলঘের হুকুমে একরাতে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলো। কাল সকালে তারা কি খাবে, কি পরবে, কোথায় থাকবে এ প্রশ্নের উত্তর সম্ভবতঃ তখন স্বয়ং ভগবানের পক্ষেও দেওয়া সম্ভব ছিলো না।

ইতিহাসে পড়েছি, প্রাচীন আমলে রোমানরা এক একটা এলাকা জয় করে সেখানকার লোকজনকে গরু ভেড়ার মতো খেদিয়ে নিয়ে যেতো অন্য এলাকায় ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। তখন তাদেরকে কেউ মানুষ বলে গন্য করতো না, ফলে তাদের সাথে মানুষের মতো ব্যবহার করাটাও কারো প্রয়োজন বলে মনে হতো না।

আজ অশোক বিহারে যাবার পথের দুধারের লোকজনদের সাথেও সে ধরনেরই ব্যবহার করা হতে লাগলো। হাজার হাজার মানুষকে বৃষ্টির মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের তলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। তাদেরই চোখের সামনে, তাদেরই মেহনত দিয়ে গড়া ঘরগুলো বুলডো-জারের চাকায় পিষে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হতে লাগলো। ক্ষমতা মদগর্বী দেড়জন মানুষের ঔদ্ধত্যের প্রতীক হয়ে বুলডোজার ক্রমাগত সামনে পেছনে-ডানে-বায়ে তার থাবা বাড়িয়ে একটার পর একটা পরিবারের সুখ স্বপ্নের রঙিন বেলুনগুলোকে ফাটিয়ে দিতে লাগলো।

তারপর শুরু হলো যাত্রা। হাজার হাজার উদ্বাস্তু মানুষকে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো মিছিলে। পরাজিত স্পার্টাকাসের মতো মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বন্দী মানুষের দল। এবার হুকুম হলো, 'আগে বাড়ো।'

মিছিল চলতে লাগলো। নীরব, মৌন, মুক মানুষের মিছিল। এ যুগের স্পার্টাকাসরা বন্দী হয়েছে, তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ক্রুশি-ফিকেশনের জন্য। রাতের অন্ধকারে সকলকে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে ক্রুশে; তুনিয়ার মানুষ জানতেও পারবে না ঝড় বৃষ্টির কালরাত্রিতে কতো যিশু ঘরছাড়া হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য, কতোজনকে নির্বাসিত করা হয়েছে জেরুজালেম থেকে।

ঠিক একই ঘটনা ঘটলো তার কদিন পরে তুর্কমান গেটে। সেখানকার মানুষ অতো সহজে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলো না; তারা রুখে দাঁড়ালো স্বৈরাচারী 'কাতিল'দের বিরুদ্ধে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো লড়াই। লড়াইতে হেরে পালিয়ে গেলো পুলিশের দল। তখন তলব পড়লো সামান্ত নিরাপত্তা বাহিনার। দিল্লীর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য দলে দলে ছুটে এলো তারা। গুলি চললো, লাঠি চললো, চললো বেয়নেট। দস্যুদের হাতে নিহত হলো নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে তুশো জন মানুষ। তাদের কারো কারো কাফন উঠলো, কেউ গেলো শ্মশানে। হিন্দু মুসলিমের বুকের রক্ত মিশে একাকার হয়ে গেলো তুর্কমান গেট। সেকুলার ভারতবর্ষ প্রমাণ করলো শোষকের বিরুদ্ধে এখনো এখানকার মানুষ সেকুলার।

অত্যাচারের নমুনা দেওয়া শুরু হলে তার আর শেষ হবে না। কিন্তু পরিসর অত্যন্ত অল্প, তাই কলমকে সংযত করতে হচ্ছে।

মানুষকে গৃহহীন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে 'মায়ের ছেলের' যে অভিজ্ঞতা হলো সেটা মোটেই সুখকর নয়। গাড়ি-চোর রাজপুত্র মানুষের হৃদয়-চুরি করার যে মতলব এঁটেছিলেন, দেখলেন, সে পথে তুস্তর বাঁধা। আর সে বাঁধাটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আসছে 'গরিব ছোটোলোক'দের কাছ থেকেই। তাঁর মনে হলো এই সব ছোটলোকেরা যেন একটু বেশি রকমের উদ্ধত, যেন এরা একটু বেশি মাত্রায় পৌরুষ-শালী। আর সেই পৌরুষত্বের গরিমাতেই এরা বারবার রুখে উঠছে, বারবার 'হৃদয়-চুরি'র চেষ্টাকে প্রতিহত করছে। অতএব ঠিক হলো পৌরুষওয়ালাদের পৌরুষত্বের দফারফা করে দেওয়া হবে।

সেই অনুযায়ী হুকুম জারি হয়ে গেলো দরবার থেকে। পৌরুষত্ব

খতম করো, নাশবন্দী চালু করো।

হরিয়ানার বংশীলালের স্বভাবই হচ্ছে তিনি কোনো দুষ্কর্ম না করে একটা মিনিটও চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। যেভাবেই হোক কোনো না কোনো দুষ্কর্ম তাঁকে করতেই হবে। তাই সঞ্জয় যখন তাঁকে ডেকে পাঠালেন তখন তিনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলেন। কারণ তিনি জানতেন সঞ্জয় তাঁকে ডেকে পাঠাবার আগে তাঁর জন্য কোনো না কোনো দুষ্কর্মের পরিকল্পনা তৈরি করে রাখবেন-ই।

ডাক পেয়ে গদ্‌গদ্‌ ভঙ্গিতে এসে হাজির হলেন বংশীলাল। এসে দেখলেন, তিনি আসার আগেই আরো কয়েকজন এসে বসে গেছেন সোফাতে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নারায়ণ দত্ত তেওয়ারি, বিদ্যাচরণ শুক্লা, ওম মেহতা, ভেঙ্গল রাও এবং হরদেও যোশী।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, রাজকুমার অম্বিকা সোনিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। যারা সোফায় বসেছিলেন, তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। রাজকুমার তাঁদেরকে ইশারা করলেন বসে পড়তে, নিজেও একটা সোফায় বসলেন, পাশের সোফায় বসতে বললেন শ্রীমতী সোনিকে।

রাজকুমার ঘরে ঢোকার সময় অন্যান্য সবার উঠে দাঁড়ানোর খবর পড়ে পাঠক নিশ্চয় বিস্মিত হচ্ছেন। কিন্তু এটাই হচ্ছে ঘটনা। জরুরী অবস্থা চালু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই এই ব্যবস্থাটাও চালু হয়ে যায়। তখন থেকে বুড়ো-বাচ্চা, নেতা-কর্মী, মন্ত্রী-সেক্রেটারি, যে-ই সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন তাঁকেই ওভাবে উঠে দাঁড়িয়ে 'ভবিষ্যতের প্রধান-মন্ত্রী'কে অভিবাদন জানাতে হতো।

যাইহোক, যা বলছিলাম। সবাই নিজের নিজের আসনে বসে গেলে পর সঞ্জয়জী তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করলেন। বললেন, 'আমি একটা নতুন পরিকল্পনার কথা চিন্তা করেছি। অনেকদিন ধরেই আমরা বলে আসছি, "দো ইয়া তিন, ব্যস্‌।" কিন্তু কৈ, আজ পর্যন্ত তো আমাদের কথায় কেউ কান দেয়নি। শহরের শিক্ষিত সমাজ ছাড়া আর কেউ কি তিনে পৌঁছে "ব্যস" করছেন? সুতরাং আমি মনে করি, ওসব শ্লোগান অনেক চালানো হয়েছে—ওতে কোনো কাজ হবার নয়, এবার বাস্তবক্ষেত্রে

"অ্যাকশন" শুরু করতে হবে। আমি তো আমার পাঁচ দফা কর্মসূচিতে বলেইছি, যেভাবেই হোক পরিবার পরিকল্পনা করা চাই-ই চাই। সুতরাং জনসাধারণ যদি স্বেচ্ছায় তা না করে তাহলে আমাদের সামনে জোর জবরদস্তির রাস্তা ধরা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।'

ডি. এন. তেওয়ারী একটু আমতা আমতা করে বললেন, 'এ ব্যাপারে মানুষের ওপর জোর জবরদস্তি করাটা কি ঠিক হবে?'

'চুপ করুন, ঠিক হবে কিনা সেটা আমি বুঝবো।' সঞ্জয় ধমকে উঠলেন তেওয়ারিকে, 'যে জনতা সোজা পথে চলতে শেখেনি তাদেরকে কি করে সোজা পথে চালাতে হয় তা আমি জানি।'

আর কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না; কারণ সকলেই জানেন, একটু এদিক ওদিক বেফাঁস কিছু বলে ফেললেই গিলোটিনের ছুরিটা ধপ্ করে নেমে আসবে গলার ওপর।

সঞ্জয় বললেন, 'আমাদের বেছে নিতে হবে এমন কয়েকটি মাধ্যম, যে মাধ্যমের মারফত আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারবো। যেমন শিক্ষক। আমরা যদি শিক্ষকদের বলি মাসে দুটো করে "কেস" এনে দিতে হবে, না হলে মাইনে পাবেন না, তাহলেই প্রতিমাসে লক্ষ লক্ষ লোককে অপারেশন করে ফেলা যাবে। তারপর সরকারী কর্মচারীদের যদি বলা হয় বছরে দুটি কি তিনটি কেস না দিতে পারলে চাকরিতে প্রমোশন দেওয়া হবে না তাহলেও বছরে বহু লক্ষ লোককে পাওয়া যাবে অপারেশনের জন্য। এছাড়া পুলিশকেও আমরা এ ব্যাপারে কাজে লাগাতে পারি। শহরের রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার ভবঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরকে ধরে এনে প্রথম চোটেই অপারেশন করে দিলে সেটাও একটা বিরাট রেকর্ড হবে। তাছাড়া রেলে যারা বিনে টিকিটে যাতায়াত করে তাদেরকে ধরেও অপারেশন করা যেতে পারে।'

প্রোগ্রাম শুনে আনন্দে উপস্থিত সবার চোখই বেশ জ্বলজ্বলে করে উঠলো। প্রত্যেকেই মনে মনে ভাবলো: ছোটোলোকদের ছেলেমেয়ে হওয়া বন্ধ হলে দেশে ঝামেলাও অনেক কমে যাবে। বিরোধী পক্ষরাও আর তখন চেঁচামেচি করতে পারবে না, মিটিং মিছিলের হুজ্জোতিও যাবে বন্ধ

হয়ে। কারণ এইসব ছোটোলোকদের গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলেরাই তো ওদের দলে ভিড়ে গিয়ে সারা দেশ জুড়ে গোলমাল পাকাচ্ছে, দাবি জানাচ্ছে এটা চাই, ওটা চাই—শিক্ষা চাই, খাদ্য চাই, বাসস্থান চাই, পরিধান চাই। যদি ব্যাটাদের জন্মানোটাই বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে আর দাবি জানাবার সুযোগটা থাকছে কোথায়? অনেকে প্রস্তাবটা শুনে মনে মনে আপসোস করলেন এই ভেবে, হায়, সঞ্জয় যদি তাঁর জন্মের বিশ বছর আছে কোনোরকমে জন্মে যেতে পারতো তাহলে আজ এই যে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে আমাদেরকে এটা আর পোহাতে হতো না। বিশ বছর আগেই তাঁর পরিকল্পনা চালু হয়ে গেলে জয়প্রকাশজীও আর তাঁর আন্দোলনের জন্য লোক খুঁজে পেতেন না, তাঁকে তখন বাড়িতে বসে সেতার বাজিয়ে সময় কাটাতে হতো।

মিটিং হওয়ার পরের দিনই কাজ শুরু হয়ে গেলো। প্রচারে নেমে পড়লো আকাশবাণী আর দূরদর্শন। যেন তিনি হাইড্রোজেন বোমার থেকেও শক্তিশালী কিছু একটা আবিষ্কার করেছেন এমনভাবে তাঁর নির্বীজকরণ কর্মসূচির প্রশংসাব্যঞ্জক সব কথাবার্তা বলা হতে লাগলো। খবরের কাগজগুলো ট্রাম গাড়ির মতো লাইন ধরে চলা শুরু করে দিলো। সেখানে প্রতিদিন 'সঞ্জয়-উবাচ' ছাড়া আর কিছুই রইলো না।

আগেই বলেছি দুষ্কর্ম করার কোনোরকম সুযোগ পেলে বংশীলাল আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেন না, কখন সেই পরিকল্পিত দুষ্কর্ম শুরু করবেন তার জন্য ছটফট করতে থাকেন। এবারও তাই হলো। লোককে পৌরুষত্বহীন করে দেওয়ার এমন একটা সুযোগ হঠাৎ হাতের মুঠোয় এসে যাওয়াতে তিনি আনন্দে স্নান খাওয়া ত্যাগ করে নেমে পড়লেন ময়দানে। শিক্ষকদের কাছে হুকুম গেলো মাসে দুটো 'কেস' চাই, নাহলে তনখা বনধ্। সরকারী কর্মচারীদের ফরমান দেওয়া হলো বছরে দুটো 'কেস' চাই, নাহলে প্রমোশন বনধ্। অফিসে নির্দেশ গেলো, সরকারী দপ্তরে যিনি যে কাজই করাতে আসুন না কেন তাকে অবশ্যই সাথে একটা 'কেস' নিয়ে আসতে হবে, নাহলে যেন তার কাজ করা না হয়।

অপকর্ম করার ব্যাপারে বংশীলালের উৎসাহটা অন্যদের তুলনায় একটু বেশি ছিলো বলে তিনি দিল্লী মিটিংয়ের পরদিনই ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু করে দিয়েছিলেন; বাকি সবার সেটা করতে দু চারদিন দেরি হয়ে গিয়েছিলো।

নারায়ণ দত্ত তেওয়ারির কাজ শুরু করতে দেরি হয়েছিলো বলে, বংশীলাল যাতে সব কৃতিত্বটা না পেয়ে যান সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রথম থেকেই তিনি ফুল গিয়ারে মোটর চালু করে দিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশে নির্বীজকরণের নামে সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তার কাহিনী যদি কোনোদিন সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় তাহলে দুনিয়ার সামনে লজ্জায় আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো না।

একটি ছোটো ঘটনা বলি:

রায়বেরেলী জেলায় সেরো নামে একটি মহকুমা শহর আছে। সেখানে একদিন গিয়েছিলাম এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। বন্ধুটি পেশায় ডাক্তার। নিজের বাড়িতে ছোটোখাটো একটা হাসপাতালের মতো খুলে নিয়েছে। যখনি সেখানে গেছি, দেখেছি, সব কটা বেডেই রোগী রয়েছে। এবারও গিয়ে তাই দেখলাম।

যেতেই বন্ধুটি আপ্যায়ণ করলো যথারীতি, তারপর অপেক্ষা করতে বলে চলে গেলো ভেতরে।

প্রায় মিনিট পনেরো বসে রইলাম, কিন্তু বন্ধুটি আর আসছে না; ফলে বেশ অস্বস্তি লাগতে লাগলো। একবার ভাবলাম উঠে চলে যাই; আবার ভাবলাম না, সেটা অভদ্রতা হবে, বরং কিছুটা বসেই যাই। এভাবে দোনামনায় কেটে গেলো আধঘণ্টা। এবার ঠিক করলাম উঠবো। সত্যি বলতে কি, মনে মনে একটু রাগও হলো বন্ধুটির ওপর। এ কী রকম ভদ্রতা! আমাকে 'আসছি' বলে বসিয়ে রেখে আধঘণ্টা হলো ঘরে ঢুকেছে, একবার বেরোবার নামও করছে না!

প্রায় উঠে পড়েছি চেয়ার ছেড়ে, এমন সময় বন্ধুটি ফিরে এলো। দেরি হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইলো। তারপর দেরি হওয়ার কারণ যা বললো তা শুনে আমার চক্ষু ছানাবড়া।

বন্ধুটি বললো, 'একজন রোগীকে নিয়ে বড়ো বিপদে পড়েছি। রোগীটির বয়স সত্তর বাহাত্তর বছর, এই বয়সে তিনি নাশবন্দী করিয়েছেন।'

'নাশবন্দী' কথাটা হিন্দী, বাংলা করলে দাঁড়ায় 'নির্বীজকরণ।'

বন্ধুর কথা শুনে আমি হা করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। তারপর বললাম, 'কি বলছো পাগলের মতো!'

'কেসটা যখন আমার কাছে প্রথম এলো তখন আমিও ঠিক এ কথাই বলেছিলাম বুড়োকে।' বন্ধুটি বলে চললো, 'মানুষকে কী ভয়ঙ্কর রকমের অসহায় করে ফেলা হয়েছে এ কেসটা তারই এক উজ্জ্বল নিদর্শন। বুড়োর ছোটো ছেলে, বয়স বিশ বাইশ বছর, অনেকদিন ধরেই পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলো। কিছুদিন আগে ধরা পড়লো, একিউট আলসার। অপারেশন ছাড়া সারার কোনো রাস্তা নেই। তাই তাকে নিয়ে যেতে হলো জেলা সদর হাসপাতালে। সেখানকার ডাক্তাররা দেখে বললেন, অবস্থা খুবই খারাপ, অবিলম্বে অপারেশন করা দরকার।

'বুড়ো অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়ে গেলো। কিন্তু বিপত্তি বাঁধলো অন্য জায়গায়। হাসপাতাল থেকে বলা হলো ছেলের অপারেশন করাতে হলে অন্তত দুটো নাশবন্দীর কেস নিয়ে আসতে হবে। কথা শুনে বুড়ো তো আকাশ থেকে পড়লো। সে গরিব লোক, নাশবন্দীর কেস আনবে কোথা থেকে? পয়সা থাকলে না হয় কথা ছিলো। পয়সা দিলে বাজারে লোক পাওয়া যায় নাশবন্দী করার, তাদের কাউকে ধরে আনলেই ল্যাঠা চুকে গেলো।

'ডাক্তারদের হাতে-পায়ে ধরলো বুড়ো, কিন্তু কোনো কাজ হলো না। প্রত্যেকেই সমবেদনা জানালো, কিন্তু বললো, আমাদের হাত পা বাঁধা; ওপর থেকে হুকুম আছে 'কেস' না পেলে কোনো রোগীকে ভর্তি করা চলবে না। আমরা চাকরি করি, আমরা কি করবো এ ব্যাপারে?

'বুড়ো তখন বললো, যদি একটা নাশবন্দী করাই তাহলে চলবে কি? ডিউটিতে ছিলেন যে ডাক্তারটি তিনি একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, ঠিক আছে, তাই আনুন।

'বুড়ো তখন কি করলো জানো ?'

'কি ?' আমি জানতে চাইলাম।

বন্ধুটি বললো, 'নিজেকেই সে অফার করলো ডাক্তারের কাছে। বললো, আমি ছাড়া আমার বংশে আর কেউ নেই নাশবন্দী করাবার মতো। একটিই ছেলে, এখনো বিয়ে হয়নি। আর সবকটি মেয়ে, তাদের প্রত্যেকের বিয়ে হয়ে গেছে।'

জানতে চাইলাম, 'ডাক্তার এই বুড়ো মানুষটাকে অপারেশন করলো !'

'হ্যাঁ।'

'কী পিশাচ ?'

'কে ?'

'ডাক্তারটা।'

'ডাক্তারটা নয়,' বন্ধু আপত্তি জানালো, 'ডাক্তারের কোনো দোষ নেই। সে সংসারী মানুষ, চাকরির পয়সায় সংসার চালায়। ওপরের অর্ডার অমান্য করার ক্ষমতা কোনো চাকরিজীবীর নেই—তাহলে তাকে না খেয়ে মরতে হবে। পিশাচ হচ্ছে তারা, যারা ক্ষমতা পেয়ে সারাটা দুনিয়াকে পায়ের গোড়ালিটুকুর সীমানার মধ্যে এনে ফেলতে চাইছে; যারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে মানুষকে কুকুরের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যেতে।'

বললাম, 'তা বুড়োর এখন কি হয়েছে ?'

'এখন হয়নি, হয়েছে অনেকদিন ধরেই।' ডাক্তার বললো, 'সেপটিক হয়ে গিয়েছিলো, অনেকদিন চিকিৎসা করার পর ঘা-টা শুকিয়ে এসেছিলো। কিন্তু ইদানীং আবার রিল্যাপস্ করছে; মনে হয় না যে এ-যাত্রা আর বাঁচবে।'

এ শুধু একটি নমুনা। এ ধরনের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নমুনা ছড়িয়ে রয়েছে সারাটা উত্তর ও মধ্য ভারত জুড়ে। এই বিশাল বিস্তৃর্ণ এলাকায় মানুষ দিনের পর দিন ঘর ছেড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়েছে। রাতে যদি কখনো বাড়ি ফিরে এসেছে তো সূর্য ওঠার আগেই আবার

তাকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে ঘর ছেড়ে—ভয়, কী জানি কখন এসে জোর করে ধরে নিয়ে যায়।

আসলে ভয়ের জ্বরে একেবারে কাবু হয়ে পড়েছিলো এই এলাকার মানুষ। বড়ো বড়ো শহরের রাস্তাঘাটেও সন্ধ্যার পর লোকজনের চলাফেরা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। অন্ধকার নেমে আসার আগেই সবাই যার যার ঘরে ফিরে যেতো। তাও নিশ্চিতে ঘুম হতো না কারো—সব সময়েই মনে আতঙ্ক থাকতো, এই বুঝি কেউ এসে ঘরের দরজার কড়া নাড়লো; এই বুঝি কেউ এসে বললো, চলো, তোমার ডাক পড়েছে। এ যেন যমের পেয়াদা; ডাক দিলে আর রক্ষা নেই, হাতে যতো কাজই থাক না কেন যেতে তোমাকে হবেই।

অনেককেই প্রশ্ন করতে শুনেছি, এরা যখন এই সব করছিলো, তখন কি এদের কারো মনেই এ প্রশ্ন আসেনি যে একদিন না একদিন তো নির্বাচনে যেতেই হবে, সেদিন আমরা জনতার কাছে বলবোটা কি?

এ প্রশ্নের জবাবে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে বোধ করি না, শুধু এ-প্রসঙ্গে দু একটা নামের উল্লেখ করাই যথেষ্ট বলে মনে করি। জার্মানীতে একজন ভদ্রলোক ছিলেন হিটলার নামে, ইতালীতে ছিলেন একজন মুসোলিনী নামে, আর তারই পাশে স্পেনে ছিলেন একজন যাকে লোকে বলতো ফ্রাঙ্কো। এঁদের কেউই জানতেন না যে একদিন তাঁদেরকেও চলে যেতে হবে। তাই তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন ইতিহাসের চাকাটাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে। তাতে প্রথম প্রথম একটু কম্পন জাগলেও ইতিহাস উল্টো দিকে ঘোরেনি, সে শুধু অপেক্ষা করছিলো জনতার হাতের সমবেত ধাক্কার জন্য; এবং যখন সে ধাক্কা সত্যি-সত্যিই এলো, তখন, যাঁরা চাকাকে পেছনে ঘোরাবার চেষ্টা করেছিলো তাঁদেরকে সে টেনে এনে পিষে ফেললো ধুলোর সাথে। সেদিন তাঁদের উদ্দেশ্যে আক্ষেপ করার জন্য একটি লোককেও খুঁজে পাওয়া গেলো না সারাটা দুনিয়ায়; একজনও এগিয়ে এসে বললো না যে ওঁদের নিধনে আমি মনে মনে দুঃখিত হয়েছি।

ভারতবর্ষেও সেই চাকাকে পেছনে টানার কাজ চলেছিলো। হাতে

শোনা যায় এমন কয়েকটি কাপুরুষ একত্রিত হয়ে মানুষকে গৃহহীন, হৃদয়হীন, পৌরুষত্বহীন করার চেষ্টায় একেবারে পাগলের মতো আচরণ করছিলো। যখন যা মনে আসছিলো তাতেই তারা মেতে উঠছিলো, যখন যা খেয়াল হচ্ছিলো তখন তা-ই করছিলো।

এদের পাগলামির বিচরণক্ষেত্রের কোনো সীমা পরিসীমা ছিলো না। রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন, নাটক, চলচ্চিত্র, সাহিত্য—জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এরা অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এদের একমাত্র হাতিয়ার ছিলো—ভীতি প্রদর্শন। সমাজের কোনো স্তরের লোককেই এরা মানুষ বলে গণ্য করতে চায়নি। প্রত্যেককেই মনে করেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, প্রত্যেককেই চেষ্টা করেছে চোখ রাঙিয়ে দাবিয়ে রাখার। যারা এরই মাঝে তাল মিলিয়ে চলেছে তাদের গলার চেনটাকে এরা কিছুটা আলগা দিয়েছিলো মাত্র, কিন্তু কখনোই তা পুরোপুরি ছেড়ে দেয়নি।

এদের হাতে সব থেকে বড়ো হাতিয়ার ছিলো 'মেইনটেনেন্স অব ইন্দিরা অ্যাণ্ড সঞ্জয় অ্যাক্ট।' ভদ্রতা করে এটার আরো একটা নাম দেওয়া হয়েছিলো, মেইনটেনেন্স অব ইণ্টারনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ; যাকে সংক্ষেপে আদর করে সবাই ডাকতো 'মিসা' বলে।

এই 'মিসা'র মিসইউজের ভয়েই দেশের তাবৎ লোক সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো। কারণ, ভয় ছিলো, যখন তখন যে কাউকে ধরে পুরে দেওয়া হবে ফটকে ; চাই কি তার সাথে জুড়ে দেওয়া হবে ছু চারটে বরদা ডায়নামাইট কিংবা সি. আই. এর গুপ্তচরবৃত্তির মামলা।

পাঠক হয়তো নমুনা জানার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছেন ; কারণ উদাহরণবিহীন কচকচি কারই বা কতোক্ষণ ভালো লাগে! সুতরাং আসুন, ছু একটা নমুনা শোনাই।

জর্জ ফার্নাণ্ডেজের নাম শুনেছেন নিশ্চয় ; তাঁরই বড়ো ভাই হচ্ছেন লরেন্স ফার্নাণ্ডেজ। ভদ্রলোক রাজনীতি করতেন না কোনোদিনই, আজো করেন না। তবে তাঁর পরিবারে আর ছুজন আছেন যাঁরা রাজনীতি করেন—রাজনীতিই যাঁদের পেশা এবং নেশা। এঁদের একজন

যে জর্জ সে তো আগেই বলেছি, অন্যজনের নাম মাইকেল।

মাইকেল ফার্নাণ্ডেজ রাজনীতির সঙ্গে একটা চাকরিও করতেন— বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রীজে। সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো উনিশ শো পঁচাত্তরের বাইশে ডিসেম্বর। গ্রেপ্তারের সময় গ্রেপ্তারের কোনো কারণ দেখানো হয়নি তাঁকে—কারণ তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সেই সর্বরোগের ধন্বন্তরি 'মিসা'তে।

মাইকেল মিসাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর ভাইদের মধ্যে বাড়িতে থাকতেন একমাত্র লরেন্স। কারণ, ছোটো ভাই জর্জ অনেকদিন ধরেই ফেরার। তাঁর খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরছে সারা ভারতবর্ষের পুলিশ। তাঁর মাথার দাম তখন ঘোষণা করা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা।

লরেন্স নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিপ্রিয় মানুষ। মাঝারি সাইজের একটা ছাপাখানার মালিক। দিনরাত সেই ছাপাখানার কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ভাইদের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই, তিনি সে ব্যাপারে কাউকে কখনো কোনো প্রশ্ন করেন না ; তবে তাঁরা রাজনীতি করছে বলে তাঁর তাতে কোনো আপত্তিও নেই।

দু ভাই-ই বাড়িতে না থাকায় সংসার দেখতে হয় একা লরেন্সকেই। এরই মধ্যে খবর এসেছে মাইকেল হেবিয়াস কার্পাসের আবেদন করেছেন, সে ব্যাপারে উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করার ব্যাপারটা তাঁর মাথায় ছিলো, কিন্তু তখনো তিনি সে বিষয়ে এগোননি। এমন সময় কয়েকজন লোক এলো তাঁর সাথে দেখা করতে। বললো, 'আপনার সাথে মাইকেলের হেবিয়াস কার্পাসের আবেদনের ব্যাপারে কিছু কথা আছে।'

লরেন্স বললেন, 'বলুন।'

লোকগুলি বললো, 'বাইরে আসুন।'

'কেন?' জানতে চাইলেন লরেন্স।

'আপনাকে একটু থানায় যেতে হবে।'

'কেন? থানায় যেতে হবে কেন?'

'এ ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানার

দরকার আছে।'

অগত্যা জামাকাপড় পরে বের হতে হলো লরেন্সকে। যাবার সময় মাকে বলে গেলেন, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবো, চিন্তা কোরো না।'

ছেলে 'চিন্তা কোরো না' বললেও মার মনের চিন্তাকে কি বন্ধ করা যায়? সে-মন তো সৃষ্টিই হয়েছে চিন্তা করার জন্য। যখন চিন্তার কিছু থাকে না তখনো যখন সে-হৃদয় চিন্তা করতেই ভালোবাসে, তখন চিন্তা করার মতো সত্যি সত্যিই যদি কিছু ঘটে তাহলে আর সে সময় তাকে সংযত রাখবে কে?

ছেলে চলে যাবার মুহূর্ত থেকেই লরেন্সের মার মনে শুরু হলো দুশ্চিন্তা। বিভিন্ন অশুভ ভাবনা এসে বারবার উঁকিঝুঁকি দেওয়া শুরু করলো মনের জানালার ফাঁক দিয়ে। একটা ভয় যেন ক্রমাগত চতুর্দ্দিক হতে ঘিরে ফেলতে লাগলো তাঁকে।

লরেন্সকে পুলিশ যখন বাড়ি থেকে নিয়ে গেলো তখন রাত নটা। দিনটা ঐতিহাসিক পয়লা মে, সন উনিশ শো ছিয়াত্তর।

গাড়ি গিয়ে প্রথমে হাজির হলো বাঙ্গালোর পুলিশের সদর দপ্তরে। সেখানে একঘণ্টা ধরে প্রশ্ন চললো, জর্জ কোথায়, শেষবার কবে বাড়িতে এসেছিলো, যে-সব চিঠি পাঠিয়েছে সেগুলো আছে কিনা ইত্যাদি হাজার জরুরী অজরুরী বিষয় নিয়ে। তারপর যখন আর প্রশ্ন করার মতো কিছু রইলো না তখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো অফিস অব দ্যা ক্রেপস্ অব ডিকেটটিভ-এ।

ক্রেপস্ অব ডিটেকটিভের অফিসে ঢোকার সাথে সাথেই তাঁকে স্বাগত জানালো হলো গালে প্রচণ্ড জোরে একটা থাপ্পর মেরে। এমন অদ্ভুত সম্ভাষণে লরেন্স একেবারে হতচকিত হয়ে গেলেন। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগলো, তিনি মাতালের মতো টলতে লাগলেন। এমন সময়ে হঠাৎ তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হলো মেঝেতে; তারপর একসঙ্গে দশজন পুলিশ দশটা লাঠি দিয়ে ক্রমাগত পিটিয়ে যেতে লাগলো তাঁকে। পেটাতে পেটাতে এক এক করে দশটা লাঠিই গেলো ভেঙ্গে। তখন শুরু

হলো ফুটবল খেলা। দশজন লোক পায়ে ভারী বুট পড়ে দুদিক থেকে ফুটবলে লাথি মারার মতো ক্রমাগত লাথি মেরে চললো মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে। তার সাথে অতিরিক্ত হিসেবে সংযোজিত হলো অশ্লীল ভাষায় অকথ্য গালাগালি।

যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগলেন লরেন্স। কিন্তু সেজন্য পুলিশের মনে এতোটুকু দয়ার উদ্রেক হলো না। উল্টে লাঠির বিকল্প হিসেবে নিয়ে আসা হলো কলা গাছের ফাতরা দিয়ে তৈরি চাবুক। শুরু হলো লাঠির আঘাতে ফেটে যাওয়া চামড়ার ওপর আবার নতুন করে আক্রমণ।

পাঁচ ঘণ্টা ধরে ৪৭।৪৮ বছর বয়সের একটি লোকের ওপর দশজন ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারার পুলিশের আক্রমণ চলতে লাগলো অবিরাম গতিতে। মুখে তাদের শুধু একটি প্রশ্ন: জর্জ কোথায়?

কিন্তু এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে সে? কি উত্তর দেওয়া সম্ভব? জর্জ কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, সেকথা কি সে কাউকে আগে থাকতে জানিয়ে যাচ্ছে? কেউ কি এ অবস্থায় কাউকে সেকথা জানিয়ে যায়?

সঙ্ঘবদ্ধ নির্বোধদের নির্বোধ প্রশ্নের কোনো জবাব জানা ছিলো না লরেন্সের; তাই কোনো জবাব দেওয়াও সম্ভব হচ্ছিলো না তাঁর পক্ষে। অতএব মারেরও কখনো বিরাম ঘটছিলো না।

পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত বার দশেক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। তখন সাময়িক বিরতি ঘটছিলো মারের, কিন্তু জ্ঞান ফিরলেই আবার শুরু হয়ে যাচ্ছিলো পৈশাচিক আক্রমণ। অত্যাচারের ফলে একজন সুস্থ সবল মানুষ পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে একেবারে বুড়িয়ে গেলেন। তখন আর তাঁকে সেই আগের লরেন্স বলে চেনাই যাচ্ছিলো না। মনে হচ্ছিলো, একজন মৃত্যুপথযাত্রী শুয়ে আছে তাঁর অন্তিম যাত্রার প্রতীক্ষায়।

তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিলো লরেন্সের. বারবার একটু জলের জন্য আবেদন জানাচ্ছিলেন তিনি দস্যুদের কাছে। কিন্তু আবেদনে সিক্ত হওয়ার মতো মন নিয়ে যারা জন্মায়, তাদেরকে কখনো পুলিশের চাকরিতে নেওয়া হয় না। সুতরাং লরেন্সের সেদিন এটা আশা করাই ভুল

হয়েছিলো যে তাঁর আবেদনে পুলিশের মন ভিজবে, তাঁকে জল দেওয়া হবে।

পাঁচটি ঘণ্টা একটি লোককে মেরে মেরে একেবারে প্যাঁকাটি তৈরি করে ফেলা হলো। তখন মনে হচ্ছিলো যে-কোনো মুহূর্তে এই প্যাঁকাটির টুকরোটি গুড়িয়ে ধুলো ধুলো হয়ে যাবে। অতএব ঠিক হলো মুখে দু চামচ জল দেওয়া হোক।

পাঠক, 'দু চামচ' কথাটাকে প্রতীক অর্থে ধরবেন না, এটাকে বাস্তব অর্থে ধরুন। সত্যিসত্যিই তখন লরেন্সের মুখে চায়ের চামচের দু চামচ জলই দেওয়া হয়েছিলো—তার বেশি এক বিন্দু নয়। তবু সেই দু চামচ জলই তাঁর কাছে সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিলো এক অতল আটলান্টিক সাগর, মনে হয়েছিলো যেন কারবালার প্রান্তরে সে আবিষ্কার করেছে নতুন এক ফাল্গু নদীর ধারা।

জল পেয়ে তাঁর নাড়ির গতি সামান্য বাড়লো ঠিকই, কিন্তু তখনো সেটা বেঁচে থাকার আশার স্তর ছুঁতে পারেনি। অতএব আলোচনা শুরু হলো অফিসারদের মধ্যে—এখন একে নিয়ে কি করা যায়? একজন অফিসার বললেন, 'আমার তো মনে হয় না যে বেশিক্ষণ আর বাঁচবে। সুতরাং আর রিস্ক নিয়ে কাজ নেই, অন্ধকার থাকতেই শুইয়ে দিয়ে আসা হোক রেল লাইনের ওপরে।'

কথাটা লরেন্সের কানে গেলো। চমকে উঠলেন তিনি। মৃত্যুর ভয়ে নয়, বিচলিত হলেন এই ভেবে যে তাঁর মৃত্যুর পর এই অত্যাচারের বিন্দু বিসর্গও কেউ জানতে পারবে না। যেসব পুলিশ এই অপরাধ করবে তাদেরকে খুনী বলে সনাক্ত করার জন্যও কেউ থাকবে না। খুনীরা উঁচু মাথা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে ভদ্রলোকের সমাজে, আর তাঁর নামেই লোকে হাসাহাসি করবে এই বলে যে, দেখ, লোকটা কী কাপুরুষ ছিলো; জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে শেষে আত্মহত্যা করলো!

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পুলিশ অফিসারদের মধ্যেই মতবিরোধ দেখা দিলো। দু একজন ছাড়া আর কেউ-ই এ রিস্ক নিতে চাইলো না। কারণ, তাদের আশঙ্কা, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেতে পারে। বিশেষতঃ,

লরেন্সের মা জানেন, পুলিশই তাঁকে নিয়ে এসেছে। সুতরাং সেক্ষেত্রে তাঁর আত্মহত্যার ব্যাপারটা লোকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য না ও হতে পারে। তাই ঠিক হলো, তাঁকে কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রাখা হবে। কিন্তু পরে আবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, হাসপাতালে পাঠিয়ে কাজ নেই, থানাতেই একজন ভালো ম্যাসেজম্যানকে আনিয়ে বডি ম্যাসেজ করানো হোক।

নটা দিন এভাবেই কাটলো; তাঁর চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই হলো না। এমনকি সেই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে একটা দিনও তাঁকে স্নান করতে দেওয়া হলো না। তারপর দশম দিনে তাঁকে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হলো দেড়শো কিলোমিটার দূরে চিত্রদুর্গা নামে এক মফস্বল শহরে। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করে বলা হলো, 'হুজুর, গতকালই একে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার আগেই লরেন্সকে পুলিশ অফিসাররা বলে দিয়েছিলেন, 'আপনাকে যে এক তারিখে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা হয়েছে খবরদার সে কথা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলবেন না; তাহলে পরে আর হাড় মাংস আস্ত থাকবে না। আমরা যা বলে দিচ্ছি, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ঠিক তাই বলবেন। বলবেন, গতকাল অর্থাৎ নয়ই মে আপনাকে এই চিত্রদুর্গা শহরেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

কোর্টের কাজ শেষ হয়ে গেলে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনা হলো বাঙ্গালোরে। সেখানে বিভিন্ন হাসপাতালে বিভিন্ন নামে তাঁর চিকিৎসা চললো কয়েকদিন। এবং মজার কথা, চিকিৎসা চলাকালীনই তাঁকে প্রতিদিন কিছু না কিছু মার সহ্য করতে হচ্ছিলো পুলিশের হাতে। শেষে সেটা এমন এক অসহনীয় পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো যে তিনি বারবারই তাদেরকে অনুরোধ করতে লাগলেন, 'অনুগ্রহ করে আমাকে ট্রেনের তলাতেই দিয়ে আসুন, আমার পক্ষে এ যন্ত্রণা আর সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না।'

দেখতে দেখতে কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর দেহের ওজন কমে গেলো প্রায় ৪০ পাউণ্ড। সারাটা শরীর প্লাস্টার আর ব্যাণ্ডেজে জড়ানো। সেই

অবস্থায় তাঁকে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলো একটা অন্ধকার কুঠুরিতে। সেখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করার মতো কোনো ব্যবস্থা ছিলো না ; তার ওপর বিজলী বাতির লাইনও সে ঘরে রাখা হয়নি।

সেই নির্জন সেলে একা বন্ধ করে রাখা হলো লরেন্সকে। সেখানে বাইশে মে একজন পুলিশ অফিসার এসে জানালেন, 'ওপর থেকে অর্ডার এসেছে, আপনাকে মিসায় আটক করা হলো।'

লরেন্স ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাই বললেন, 'মিসায় আটক করা হলো মানে? আমি তো অনেকদিন ধরেই আটক হয়ে আছি।'

অফিসারটি বললেন, 'ঐ একই হলো, এতোদিন অর্ডারটা আসেনি, আজ এসেছে।'

এরকম অনেকের ক্ষেত্রেই হয়েছে। পুলিশ এসেছে, নাম ধরে ডেকেছে, তারপর প্রত্যাশিত লোকটি বাইরে আসতেই সোজা তুলে নিয়ে গেছে থানায়। কাউকে গ্রেপ্তার করার জন্য যে একটা ওয়ারেণ্ট সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হয়, এই সর্বনিম্ন সৌজন্যতাটুকুও তারা পালন করেনি।

সাধারণ লোকের কথা ছেড়েই দিলাম, সমাজের বিশিষ্ট স্তরের মানুষদের সঙ্গেই পুলিশ যে ব্যবহার করেছে তারও কোনো তুলনা অতীত ইতিহাসের পাতা থেকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।

একটা নমুনা দিচ্ছি :

প্রফেসর বিনয়কুমার মিশ্র অল ইণ্ডিয়া কোলিয়ারি মজদুর কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। হঠাৎ তাঁকে ধরা হলো তাঁর ভাইয়ের বাড়ি থেকে, বেনারসে।

যে পুলিশ অফিসাররা এলো তাঁকে গ্রেপ্তার করতে তাদের কাছে তিনি জানতে চাইলেন ওয়ারেণ্ট এনেছেন কি না। জবাবে একজন অফিসার বললেন, 'ওয়ারেণ্ট-টোয়ারেণ্টের ঝামেলা উঠিয়ে দেওয়া

হয়েছে ; এখন আর লোককে গ্রেপ্তার করতে ওয়ারেণ্টের দরকার পড়ে না।'

পুলিশের জবাব শুনে অবাক হলেন শ্রী মিশ্র। বললেন, 'এমন কোনো আইন হয়েছে বলে তো শুনিনি।'

পুলিশ অফিসারটি বললেন, 'দেশে আইনই উঠে গেছে তো সে ব্যাপারে আর শুনবেনটা কি।'

মিশ্র বললেন, 'আইন যদি উঠে গিয়েই থাকে তো আপনারা আমাকে গ্রেপ্তাব করতে এসেছেন কোন আইনে ?'

অন্য একজন অফিসাব তখন বললেন, 'সব আইন সাসপেণ্ড হয়ে গেছে ; আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে জরুরী আদেশ বলে।'

এবার মিশ্রজী বললেন, 'তাহলে সেই জরুরী আদেশটাই আমাকে দেখান।'

অফিসারটি বললেন, 'সেটা দেখাবো বলেই তো আপনার কাছে আসা। ওদিকে সব ব্যবস্থা তৈরি হয়েই আছে।'

মিশ্র কথাটা ঠিক বুঝলেন না। বললেন, 'ব্যবস্থা মানে ?'

অফিসারটি ব্যবস্থা কি সেটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'যেমন ধরুন যারা সি. আই. এর এজেণ্ট, অথচ মুখে সে কথা স্বীকার করতে লজ্জা পান, তাদের লজ্জা ভেঙ্গে দেওয়া।'

এরপর এসব লোকের সঙ্গে তর্ক করার কোনো মানে হয় না। সুতরাং অধ্যাপক মিশ্র আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন কোথায় যেতে হবে।'

পুলিশের নির্দেশে ভ্যানে উঠলেন প্রফেসর। ভ্যান গিয়ে হাজির হলো সদর কোতোয়ালিতে। সেখানে ভেতরের দিকে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে। সে ঘরে আগে থাকতেই দুজন অফিসার অপেক্ষা করছিলেন। তারা প্রফেসরকে দেখেই অভ্যর্থনা করলেন, 'আরে আসুন আসুন প্রফেসর সাব, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি অনেকক্ষণ থেকে। বেশ কিছুদিন ধরেই একটা জরুরী ব্যাপারে আপনাকে খুঁজছিলাম। কিন্তু শুনলাম আপনি বিদেশে গেছেন, তাই বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করে থাকতে

হলো। তা বলুন, সেখানকার কাজকর্ম চললো কেমন ?'

এ ধরনের কথাবার্তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না শ্রী মিশ্র, তাই অবাক হওয়া স্বরে বললেন, 'বিদেশে গিয়েছিলাম মানে ?'

'বিদেশে গিয়েছিলেন মানে, বিদেশে গিয়েছিলেন।'

'কথাটা বুঝতে পারলাম না।' অধ্যাপক মিশ্র বললেন, 'কি বলতে চাইছেন আপনি ?'

অফিসারটি বললেন, 'আগে থাকতে যখন ঠিকই করে রেখেছেন যে বুঝবেন না, তখন তো এটা না বোঝারই কথা।'

বিরক্ত হলেন প্রফেসর। বললেন, 'ওসব হেঁয়ালি রাখুন, কি বলতে চান সোজাসুজি বলুন।'

অফিসারটি বললেন, 'আমরাও তাই চাইছি মিশ্রজী। সুতরাং আশা করবো আপনিও আমাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নের সোজাসুজিই উত্তর দেবেন।'

প্রফেসর বললেন, 'প্রশ্নগুলো শুনি।'

'এক নম্বর প্রশ্ন,' অফিসারটি কড়ে আঙ্গুলে আঙ্গুল রেখে বললেন 'উনিশ শো একাত্তরে রাজনারায়ণজী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে যে নির্বাচন লড়েছিলেন তার জন্য তিনি টাকা পেয়েছিলেন কোথায় ?'

'জনতা দিয়েছিলো।'

'ওসব জনতা টনতা আমরা অনেক দেখেছি, সোজাসুজি বলুন টাকাটা এসেছিলো কোথা থেকে ?'

'জনতার কাছ থেকে।' বেশ দৃঢ়স্বরে বললেন প্রফেসর, 'আর তাঁর কিছু বন্ধু-বান্ধব সাহায্য করেছিলো। তাছাড়া বহু ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনও তাঁকে টাকা পাঠিয়েছিলো।'

'পাগলের প্রলাপ ছাড়ুন, সোজাসুজি বলুন টাকাটা এসেছিলো কোন সোর্সে ?'

'অবাক করলেন আপনি!' প্রফেসর সত্যিই অবাক হয়েছেন, 'সোজাসুজি জানতে চাইলেন, সোজাসুজি বললাম, আর আপনিই এখন সেটাকে সোজাসুজি গ্রহণ করতে চাইছেন না!'

'গ্রহণযোগ্য হলে গ্রহণ করতাম।'

'তার মানে আপনি গ্রহণযোগ্য কথা শুনতে চাইছেন—সোজাসুজি সত্যি কথাটা নয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি অপারগ। গ্রহণযোগ্য মিথ্যে কথা বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারবো না।'

'ঠিক মতো ওষুধ পড়লেই বলবেন।'

'আজ্ঞে না।' প্রফেসর মিশ্র বেশ কঠিন সুরেই বললেন, 'ওষুধ পড়লেও আমি মিথ্যে কথা বলবো না।'

অতএব শুরু হলো ওষুধ প্রয়োগ। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, রাজনারায়ণজীর প্রাক্তন প্রাইভেট সেক্রেটারি, প্রথম শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে দড়ি দিয়ে হাত পা বেঁধে ফেলা হলো শক্ত করে। তারপর শুরু হলো লাথি-ঘুষি-কিল-চড়। শেষে মাত্রা চড়তে চড়তে বৈদ্যুতিক শক-এ গিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়ালো। মারের চোটে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন প্রফেসর মিশ্র। কিন্তু তা বলে মার কিংবা শক দেওয়া বন্ধ হলো না; শুধু মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দেওয়া হতে লাগলো। তারপর জ্ঞান ফিরলেই আবার শুরু হয়ে গেলো নতুন ডোজ।

একদিন নয়, দু দিন নয়, পরপর সাতদিন ধরে, দুনিয়ার হাটে সভ্য দেশ বলে প্রচারিত একটি দেশের কারাগারে একজন বিশিষ্ট মানুষের ওপর অকথ্য পৈশাচিক অত্যাচায় চালানো হলো প্রগতিশীলতার নামে। সাতদিন একটি লোককে মাঝে মাঝে দু চামচ জল দেওয়া ছাড়া আর কিছু খেতে দেওয়া হলো না। শেষে যখন নাড়ির গতি স্তব্ধ হয়ে আসতে বসলো তখন তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো হাসপাতালে। সেখানে ভদ্রলোককে ভর্তি থাকতে হয়েছিলো সাত মাস। এখন জানা যাচ্ছে, অমানুষিক প্রহারের ফলে তাঁর বুকে কোথাও কোথাও ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। তাই নতুন সরকার বিশেষ তত্ত্বাবধানে তাঁকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু কে জানে এই চিকিৎসার ফলে তাঁর বুক থেকে অসুরদের বুটের লাথির চিহ্ন মুছে কি না।

নাকি, ইহজন্মের মতো বুকের পাজরে লেখা হয়ে যাবে অসুরদের বংশ পরিচয়।

রাজনারায়ন্জীর পার্সোনাল অ্যাসিটেন্ট কে. কুমার। উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেলার গ্রাম্য ছেলে; অনেকদিন ধরে রাজনারায়ণজীর কাছে আছেন। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কাজই তাঁকে এককালে করতে হতো। ইদানীং কিছুটা ছুটি পেয়েছেন অন্য কাজের হাত থেকে। এখন রাজনারায়ণজীর পার্সোনাল অ্যাসিটেন্টের কাজটুকুই তাঁকে দেখতে হয়।

কে. কুমার সংসারী মানুষ, স্ত্রী পুত্র নিয়ে থাকেন রাজনারায়ণজীরই কোয়ার্টারে। রাজনীতির ধার ধারেন না; কোনোকালে রাজনীতি করেনওনি। এবং সত্যি বলতে কি রাজনীতিটা তাঁর ঠিক আসেও না।

২৫ তারিখ রাতেই রাজনারায়ণজী গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। তাঁর কোয়ার্টারে তখন আর যারা ছিলো তারা রান্নাবান্না, ঘরদোর সাফ করার লোক—সুতরাং পুলিশ তাদের কাউকে ধরে নিয়ে যাওয়াটা পণ্ডশ্রম চিন্তা করে আর ধরেনি।

কে. কুমার তখন দেশে গিয়েছিলো; উদ্দেশ্য ছিলো বউ-ছেলেকে দিল্লীতে নিয়ে আসবে। এরই মাঝে হঠাৎ জরুরী অবস্থা জারি হয়ে যাওয়াতে সে দিল্লী আসার পরিকল্পনা কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে দেয়। শেষে মাস দুয়েক পরে, যখন তাঁর মনে হয়েছে যে, উত্তেজনা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে তখন পরিকল্পনা অনুযায়ী দিল্লীতে চলে আসে।

তাঁর দিল্লীতে পৌঁছোবার খবর পেয়েই সদাশয় সরকারের লোকজন এসে হাজির হয় আট নম্বর বিশ্বম্ভর দাশ মার্গে—রাজনারায়ণজীর বাড়িতে। বলে, 'আমাদের সাথে থানায় চলুন, বড়োবাবু ডাকছেন।'

বড়োবাবুর ডাকে যাবো না বলার উপায় নেই; কারণ যারা ডাকতে এসেছে, তারা তৈরি হয়েই এসেছে নিয়ে যাবে বলে। অতএব কে.কুমারকে রোদনশীলা স্ত্রী ও পুত্রদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হলো নতনয়নে।

বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়ার মতো অবকাশ নেই, তাই লেখনীকে সংযত করতে হচ্ছে। তবে পাঠকদের অবগতির জন্য শুধু এইটুকু জানাচ্ছি, দেশ গড়ার জন্য যারা দেশকে খতম করতেও তৈরি ছিলো সেই রেজিস্টার্ড দেশপ্রেমিকদের মাইনে করা পুলিশী গুণ্ডার দল একজন সর্বভারতীয় নেতার ব্যক্তিগত সহকারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোনো খবর না থাকা সত্ত্বেও খবর আদায়ের চেষ্টার নামে তাঁর ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করেছে, তার তুলনা খুঁজতে হলে অতীতের পাতায় চোখ বোলালে হবে না, শুধু সমকালীন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়েই তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

হাত এবং লাঠির সাহায্যে সবকিছু করা সত্ত্বেও যখন পিশাচদের মনের সাধ পূর্ণ হলো না, তখন তারা কে. কুমারকে নগ্ন করে একটি লোহার খাটের ওপর শুইয়ে হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলেন হাতলের সাথে। সে সময় ওদিকে আর একজন ব্যস্ত রয়েছে একটা মোটা মোমবাতিতে অগ্নিসংযোগ করতে। তারপর দড়ির গিঁট পরীক্ষা শেষ করে যখন ও. কে. সার্টিফিকেট দেওয়া হলো, তখন সেই জ্বলন্ত মোমবাতিটা খাটের নিচের দিক থেকে একজন চেপে ধরলো নগ্ন মানুষটির স্পর্শকাতর চামড়ার ওপর এক জায়গায় নয়, দেহের অন্তত পঞ্চাশটি জায়গা এভাবে মোমবাতির শিখায় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আজো কে. কুমার যখন রাতে বিছানায় শোয়, সে নিশ্চিতে ঘুমোতে পারে না ; একটু এপাশ ওপাশ ফিরলেই যন্ত্রণা শুরু হয় শরীরে। অনেক চিকিৎসা করিয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ উপশম কিছুতেই হচ্ছে না। আমার বিশ্বাস, এ-ক্ষত কোনোদিনই সম্পূর্ণ সারবে না। অন্তত দেড়জন মানুষের রাজত্বকালের ভয়ঙ্কর স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেবার জন্যও সে যতো সামান্য পরিমাণেই হোক না কেন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবেই।

কে. কুমার রাজনীতি করতো না, শুধু রাজনৈতিক লোকের কাছে যেহেতু কাজ করতো সেই অপরাধে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো কোতলখানায়। কিন্তু তার থেকেও বিচিত্র কাণ্ড ঘটেছে বাঙ্গালোরে।

সেখানে, শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে পরিচয় আছে এই অপরাধে জনৈক স্বনামধন্যা মহিলাকে ধরে নিয়ে গিয়ে চিরকালের জন্য বিদায় করে দেওয়া হয়েছে দুনিয়া থেকে।

ভদ্রমহিলার নাম শ্রীমতী স্নেহলতা রেড্ডি। কয়েক বছর আগে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছিলো একটি কানাড়ী চলচ্চিত্র; নাম: সংস্কার। সেই ছবিটির নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্রীমতী রেড্ডি। কানাড়ী চলচ্চিত্রে তিনিই ছিলেন সব থেকে জনপ্রিয়া অভিনেত্রী।

হঠাৎ একদিন পুলিশ এসে হাজির হলো তাঁর বাঙ্গালোরের বাড়িতে। কিন্তু তিনি তখন বাড়ি ছিলেন না। একটা ছবির সুটিংয়ের ব্যাপারে তাঁকে যেতে হয়েছিলো মাদ্রাজে, সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী।

মাদ্রাজে পৌঁছেই শ্রীমতী রেড্ডি খবর পেলেন আগেরদিন রাত্রে পুলিশ তাঁর বাঙ্গালোরের বাড়িতে হানা দিয়ে সারারাত ধরে তন্নতন্ন করে তল্লাসি চালিয়েছে। তাঁর ৮৪ বছরের বৃদ্ধ বাবাকে সকাল ছটা পর্যন্ত জেরা করেছে, যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গেছে পুত্র কোনারককে।

খবর পেয়ে আর স্থির থাকতে পারলেন না স্নেহলতা; ঠিক করলেন প্রথম প্লেনেই ফিরে যাবেন বাঙ্গালোরে। স্বামী স্ত্রী তৈরি হয়ে নিলেন বের হবেন বলে। কিন্তু পথে আর পা দেওয়া হলো না, হোটেলের গেটেই পুলিশ অপেক্ষা করছিলো, নিচে নামতেই গ্রেপ্তার করলো দুজনকে।

এরপর সেই এক ইতিহাস। অত্যাচার, অত্যাচার আর অত্যাচার! এদিকে তাঁর ছেলেকে পুলিশ কোথায় নিয়ে গেছে তা তিনি জানেন না, মেয়েকেও যে কোথায় রাখা হয়েছে তাও তাঁকে বলা হচ্ছে না। দিনকে দিন তাঁর মানসিক উদ্বেগ বেড়ে যেতে লাগলো—স্বামী, পুত্র, কন্যা সকলেই জেলে, কে কি রকম আছে তার দুশ্চিন্তায় তাঁর ঘুম হতো না।

জেলের মধ্যে বিভিন্ন রকমের অসুখ দেখা দিলো। কানাড়া চলচ্চিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীকে থাকতে দেওয়া হয়েছিলো 'সি-ক্লাস' বন্দিনীদের সাথে। এ ধরনের নরকে যে তাঁকে কখনো থাকতে হবে

পারে এ-কথা তিনি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেননি। অথচ সেই অভাবিত কাণ্ডই শেষ পর্যন্ত ঘটলো। সেই অসহ্য অবস্থাকে তিনি বেশিদিন সইতে পারলেন না, তাঁর হার্টের ট্রাবল দেখা দিলো। প্রায়ই তিনি হার্টের অসুখে ভুগতে লাগলেন।

অসুখ শেষ পর্যন্ত বেশ জমিয়ে বসলো। তলব পড়লো ডাক্তার-দের। একসঙ্গে চারজন ডাক্তার পরীক্ষা করলেন স্নেহলতাকে। সকলে মিলে রায় দিলেন রোগীকে হাসপাতালে পাঠাবার. কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তাদের সে পরামর্শ মানা হলো না। পরে, মৃত্যুর আগে লিখিত ডায়রীতে স্নেহলতা অভিযোগ করে গেছেন, জেল সুপারেন-টেনডেণ্টের লোভী ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করার জন্যই তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়নি।

হার্টের অসুখের সাথে হাঁপানির রোগও ছিলো স্নেহলতার। প্রায়ই তিনি সে রোগে আক্রান্ত হতেন। যতোই দুশ্চিন্তা বাড়ছিলো ততোই রোগটা কামড়ে ধরছিলো তাঁকে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় ছটফট করতেন মাটিতে শুয়ে ; কারো সাহায্য চাইবেন সে ক্ষমতাও থাকতো না তাঁর। যদি বা কখনো ডাক্তার আসতো, কিন্তু তার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী কোনো চিকিৎসার বাবস্থা হয়নি কোনোদিন। বড়ো জোর সাময়িকভাবে একটা জোড়াতালি দেওয়া হতো।

রোগীর যখন প্রায় মরো মরো অবস্থা তখন তাঁকে এক মাসের জন্য প্যারোলে ছুটি দিলো কর্তৃপক্ষ। ছিয়াত্তরের বিশে ডিসেম্বর স্নেহলতা জেলের চৌহদ্দি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে মুক্ত পৃথিবীর বাতাস গ্রহণ করলেন বুক ভরে। তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা তাঁকে নিয়ে গেলো চিকিৎসকের কাছে। কিন্তু এতোদিন তাঁর কি চিকিৎসা চলেছে, ডাক্তাররা কি কি রিপোর্ট দিয়েছেন তার কিছুই জানা গেলো না—ফলে নতুন করে রোগ ধরে চিকিৎসা শুরু করতে অনেক দেরি হয়ে গেলো।

দেখতে দেখতে একটা মাস অতিক্রান্ত হলো। বিশে জানুয়ারী তাঁর প্যারোল উত্তীর্ণ হবার দিন। তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে ছিলেন আবার সেই অন্ধকার কুঠুরিতে ফিরে যাবার জন্য।

কিন্তু না, তাঁকে আর সেখানে যেতে হলো না। ফিরে যাবার আগের মুহূর্তে খবর এলো সদাশয় সরকার বাহাছুর তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন।

খবরটা শুনে বিন্দুমাত্র আনন্দিত হলেন না স্নেহলতা। কারণ ততোক্ষণে হয়তো তিনি বুঝে গেছেন সরকারী মুক্তির থেকেও বড়ো মুক্তির সময় হয়ে এসেছে তাঁর।

স্নেহলতার হিসেবে এতোটুকু এদিক ওদিক হলো না। এক, ছুই, তিন, চার করে মাত্র পাঁচটা রাত্রি পার হলো—অনেক কষ্টে এই পাঁচটা রাত্রির যন্ত্রণাকে তিনি মুখ বুজে সহ্য করে গেলেন। কিন্তু ষষ্ঠ রাত্রির আগত যন্ত্রণাকে নীরবে আহ্বান জানাবেন যে সে ক্ষমতা আর তাঁর রইলো না। তাই রাত হওয়ার আগেই যাতে চুপি চুপি সরে পড়তে পারেন তার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন সকাল থেকেই। কিন্তু যাবেন কি করে? ছুয়ার আগলে দাঁড়িয়ে রইলো ডাক্তারের দল। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, স্নেহলতাকে এভাবে ভয় পেয়ে চলে যেতে দেবেন না কিছুতেই। কিন্তু যে যাবার তাকে আটকে রাখবে কে? যে থাকবার নয় তাকে ধরে রাখার সাধ্য কার? তাই, একসময় দেখা গেলো, সবার সব সতর্কতাকে ফাঁকি দিয়ে, ছুয়ার আগলে থাকা মানুষগুলোর চোখে ধুলো ছিটিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্নেহের স্নেহলতা চিরকালের জন্য পালিয়ে গেছে জীবনের খেলাঘর ছেড়ে। এরপর আর কোনোদিন তাঁর অভিযোগ শোনা যাবে না, 'আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেড়জন মানুষ আমাকে বাঁচতে দিলো না।'

প্রিয় পাঠক, কেন স্নেহলতাকে এভাবে মরতে হলো বলতে পারবেন? অনুমান করতে পারছেন?

জানি, পারবেন না। চেষ্টা করেও কোনো লাভ নেই। কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে আগে থাকতে না জানলে এর কারণ খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। সুতরাং বলেই ফেলি।

জেনে স্তম্ভিত হোন: স্নেহলতাকে মরতে হয়েছে শুধুমাত্র একটি

অপরাধে ; তিনি ছিলেন জর্জ ফার্নাণ্ডেজের পুরোনো বন্ধুদের একজন। হ্যাঁ, শুধু এই একটি কারণেই তাঁর মতো একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতৃকে ধরে নিয়ে বন্ধ কবে রাখা হয়েছিলো জেলের অন্ধ কুঠুরিতে ; অত্যাচারে অত্যাচারে অসহনীয় করে তোলা হয়েছিলো তাঁর জীবন ; অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও কোনোরকম চিকিৎসা করা হয়নি তাঁর, কোনো পথ্য দেওয়া হয়নি। তাই, সময় হওয়ার অনেক আগেই, জীবনের চল্লিশটি বসন্ত পার হতে না হতেই, চলচ্চিত্র জগতের এক অসামান্য প্রতিভাকে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই চলে যেতে হয়েছে পৃথিবী ছেড়ে।

শুধু স্নেহলতাই নয়, চলচ্চিত্র শিল্পের আরো অনেকের ওপরই এ ধরনের আক্রমণ চলেছে। যদিও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, কিন্তু তাদের ওপর চাপ দিয়ে যেভাবে কাজ আদায় করার চেষ্টা হয়েছে সে কাহিনী শুনলে পাঠক বিচলিত না হয়ে পারবেন না।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরদিন থেকেই চলচ্চিত্র শিল্পী এবং প্রযোজক পরিচালকদের সঙ্গে এমন ব্যবহার শুরু করে দেওয়া হয় যে বাইরে থেকে দেখলে যে কারো তখন মনে হতে পারতো, হয়তো প্রভু তার ভৃত্যদের সঙ্গে কথা বলছেন।

প্রমাণ হিসেবে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

বোম্বেতে অল ইণ্ডিয়া ফিল্ম প্রডিউসারস কাউন্সিলের সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা। সারাটা হলে তিল ধারণের জায়গা নেই, এমনকি গেটের বাইরেও অনেকে দাঁড়িয়ে শুক্লাজীর মুখ নিঃসৃত অমৃতবাণী শুনছেন।

শুক্লাজী তাঁর বক্তৃতায় চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত লোকজনদের তুলোধোনা করে দিতে লাগলেন। তাঁর বক্তব্য হলো : চলচ্চিত্র জগতের লোকদের মতো এমন অবাধ্য লোক তিনি আর কোথাও দেখেননি। দেশ গঠনের কাজে এদের কাছ থেকে কখনোই কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না। এরা নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত ; টাকা কামাবার ধান্দাতেই এদের সারাটা সময় ব্যয় হয়ে যায়।

তিনি বললেন, 'কিন্তু এসব আর সহ্য করা হবে না। আমি [illegible]

দিচ্ছি, আপনারা যদি নিজে থেকে সংযত না হন তাহলে কি করে অসংযত লোককে সংযত করতে হয় তা আমার জানা আছে। বাধ্য হয়ে আমাকে শেষ পর্যন্ত সেই পথই ধরতে হবে। মনে রাখবেন, সেটা আপনাদের পক্ষে মোটেই ভালো হবে না। কারণ জেলে থাকাটা খুব একটা আনন্দদায়ক ব্যাপার নয়।'

শুক্লাজীর ধমকানি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন উপস্থিত জনমণ্ডলী। এর আগেও চলচ্চিত্র শিল্পের লোকজনেরা বহু অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছেন, দেশের বহু মান্যগন্য নেতা সেখানে ভাষণ দিয়েছেন, কিন্তু কৈ, কখনো কারো মুখে এমন শব্দের ব্যবহার তো তারা শোনেননি !

উপস্থিত শ্রোতাদের বিস্মিত হওয়ার তখনো অনেক বাকি ছিলো। সেটা পুরো হলো একটু পরেই।

বক্তৃতা দিতে দিতে হঠাৎ থেমে গেলেন শুক্লাজী। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন সমবেত শ্রোতাদের ওপর। তারপর প্রথম সারিতে বসা একজন ভদ্রলোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'ইউ, ইউ স্ট্যাণ্ড আপ।'

শুক্লাজীর নির্দেশ শুনে হকচকিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। সেই স্কুল ছাড়ার পর সারাটা জীবনে তাঁকে এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি কখনো। কোনোদিন যে এমন একটা কাণ্ড ঘটতে পারে তা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। কিন্তু আজ সেটাই বাস্তবে ঘটলো।

আদেশ পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠলো। প্রত্যেকেই দেখতে চাইলো লোকটিকে। এক পলকের দেখাতেই সবাই তাঁকে চিনতে পারলো : ইনি রামানন্দ সাগর।

রামানন্দজী বাধ্য ছাত্রের মতো উঠে দাঁড়ালে পর শুক্লাজী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার "চরস" ছবিটাকে তো এখনো সেন্সর সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি। তা এরমধ্যে আপনি তার পোস্টার ছেপে রাস্তায় টাঙানো শুরু করলেন কোন সাহসে ?'

সাগর আমতা আমতা করে বললেন, 'সাধারণত ছবি সেন্সার বোর্ডে পাঠাবার আগেই আমরা পোস্টার ছাপার অর্ডার দিয়ে দিই;

নাহলে সময় মতো প্রচার শুরু করা সম্ভব হয় না। আর নিয়ম হচ্ছে ছবি সেন্সার বোর্ডে চলে গেলেই শহরে শহরে পোস্টার এবং হোর্ডিং লাগানো শুরু হয়ে যায়। তবে আপনি যদি বলেন তাহলে আমি এখনি সেগুলোকে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে রাজি আছি।'

সাগরজীর কথা শুনে ধমকে উঠলেন শুক্লাজী, 'এখানে আপনার রাজি থাকা আর না থাকায় কি এসে যাচ্ছে? আপনি কি মনে করেন আপনি রাজি থাকলেই পোস্টার উঠবে, না রাজি থাকলে উঠবে না?'

'না, ঠিক তা নয়, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি—'সাগরজী কী জবাব দেবেন তা যেন খুঁজে পাচ্ছেন না।

শুক্লাজী বললেন, 'সিট ডাউন। দেখছি আপনার "চরস" কি করে সার্টিফিকেট পায়।'

অপমানে, লজ্জায় কান দুটো লাল হয়ে উঠলো রামানন্দ সাগরের। নীরবে মাথা নুইয়ে বসে পড়লেন তিনি। মনে মনে বললেন, হে ভগবান, শেষ পর্যন্ত এতো লাঞ্ছনাও ছিলো কপালে!

মিটিং শেষ হলো; শুক্লাজী ফিরে গেলেন দিল্লীতে।

পরদিন সকালেই প্লেন ধরলেন রামানন্দ সাগর; সোজা গিয়ে হাজির হলেন শ্রীনগরে।

শেখ আবদুল্লার সাথে তাঁর অনেক দিনের আলাপ। তাঁকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। অনুরোধ করলেন, দিল্লীতে গিয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে, নাহলে কোটি টাকার লোকসানে পড়বেন তিনি।

সাগরের অনুরোধ রাখলেন আবদুল্লা; দিল্লীতে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ঠিক হলো, যুব কংগ্রেসের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে তিনটে চ্যারিটি প্রিমিয়ার শোয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে সাগরকে। তাহলেই তাঁর 'চরস' সেন্সর সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে।

'বন্দবস্ত' অনুযায়ী ব্যবস্থা হলো। পর পর তিনটে চ্যারিটি প্রিমিয়ার শোয়ের আয়োজন করলেন সাগরজী। তাতে বিপুল অর্থ সংগৃহীত হলো। সে অর্থ তিনি তুলে দিলেন যুব কংগ্রেসের হাতে।

বিনিময়ে পেলেন 'সেন্সর সার্টিফিকেট।'

যারা চলচ্চিত্রে খুন-খারাবি-চুরি-জোচ্চুরি-রাহাজানি-মদ্যপান বন্ধ করে দেবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তারাই মাত্র তিনটে প্রিমিয়ার শোয়ের আদায়ীকৃত টাকার লোভটুকুও সামলাতে পারলেন না; পকেটে চাঁদি পড়তেই 'চরস'-এর মতো সর্বগুণসম্পন্ন একটি উত্তেজক ছবিকে প্রদর্শনের সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন।

এ ব্যাপারে বোম্বের চলচ্চিত্র মহলের অনেককেই বলতে শুনেছি, 'আসলে কিছুই না, শুক্লাজী সেদিন ইনডাইরেক্টলি ওটাই বলতে চেয়েছিলেন। আর সেজন্যেই সাগরজীকে সবার সামনে ধমকে ইঙ্গিতে পরে দেখা করতে বলেছিলেন।'

সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিলো, চলচ্চিত্রে খুন-জখম চুরি-রাহাজানি-মদ্যপান ইত্যাদির বাহুল্য দেখানো চলবে না। মানুষের মনের পশু প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে এরকম কোনো দৃশ্য থাকলে তাকে কেটে দেওয়া হবে। এবং সেই উদ্দেশ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরে, ইন্দিরাজী ইন্দ্র গুজরালের হাত থেকে তথ্য ও বেতার দপ্তর কেড়ে নিয়ে বিদ্যাচরণ শুক্লাকে দেবার কয়েকদিনের মধ্যেই সরকারী আদেশ জারি করা হলো: ইতিপূর্বে যেসব ছবিকে প্রদর্শনের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে আবার রিভিউ করে দেখা হবে।

এই আদেশ অনুযায়ী প্রতিটি ছবিকে রিভিউ করা হলো, এবং তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই সেন্সর বোর্ডের কিছু না কিছু কাঁচির ছোঁয়া লাগলোই। কিন্তু একটি ছবি একেবারে অক্ষত রয়ে গেলো। অথচ সেই ছবিটিই ইদানীং ভারতবর্ষে তৈরি সবকটি ছবির মধ্যে সব থেকে বেশী খুন-রাহাজানি-ডাকাতি-মদ্যপান ও উত্তেজক দৃশ্যে পরিপূর্ণ। ছবিটির নাম 'শোলে'।

পাঠকও হয়তো এতক্ষণে কথাটা ভাবতে আরম্ভ করেছেন, এবং এই ছবিটিকে অক্ষত রাখার কারণ চিন্তা করে বের করতে পারছেন না [illegible] নিজের বুদ্ধির ওপর দোষারোপ করা শুরু করে দিয়েছেন।

[illegible] এতে [illegible] করার কিছু নেই, কারণটা অতি সহজ।

সোলে চিত্রটির প্রযোজক হচ্ছেন জি. পি. সিপ্পী নামে এক ভদ্রলোক। ইনি বোম্বের চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির সভাপতি, এবং একজন কট্টর কংগ্রেস সমর্থক। কংগ্রেসের ওপরমহলে তাঁর অনেকদিনের আনাগোনা। তিনি জরুরী অবস্থা চলাকালীন প্রায়ই প্রেসের লোকজনদের ডেকে বিবৃতি দিতেন, 'চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি লোকই কংগ্রেস সরকারের কাজকর্মে যথেষ্ট খুশি। তারা মনে করেন, একমাত্র কংগ্রেসই দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলচ্চিত্র শিল্পকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।'

শ্রী সিপ্পী যখন এসব বিবৃতি দিতেন তখন প্রযোজক সমিতির আর কারো সাথে কথা বলাটা দরকার বলে তিনি মনে করতেন না। কারণ তাঁর সামনে তখন একটাই উদ্দেশ্য ছিলো, যেনতেন প্রকারে সরকারী আনুকূল্য লাভ। অথচ তখন তাঁরই সতীর্থ অন্য প্রযোজকরা সরকারের খেয়ালখুশি মতো চলতে সক্ষম হচ্ছিলেন না বলে বসে বসে মার খাচ্ছিলেন, সরকার বিভিন্নভাবে তাদেরকে হয়রাণ করছিলো।

এই হয়রানির একটি বড়ো শিকার শ্রী দেব আনন্দ। তাঁর প্রথম অপরাধ: বিদ্যাচরণ শুক্লা কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী হওয়ার পর বোম্বের চিত্রজগতের লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের উদ্দেশ্যে যে পার্টির আয়োজন করেছিলেন তাতে তিনি যাননি। একজন সাধারণ ফিল্ম হিরোর এমন ঔদ্ধত্যে শুক্লাজীর নবাবী মেজাজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, দেব আনন্দের নাম থেকে 'আনন্দ' শব্দটাকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে তবে ছাড়বেন।

দেব আনন্দজী পরে এ ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন, 'যারা নিয়মিত পার্টিতে যান আমি সে স্বভাবের লোক নই। তাছাড়া কেউ আমন্ত্রণ জানালেই যে সেখানে যাওয়াটা বাধ্যতামূলক তা-ও আমার কখনো মনে হয়নি।'

দেব আনন্দজীর মনে না হলেও শুক্লাজীর কিন্তু তাই মনে হলো। নতুন নবাবী ব্যবস্থায় তিনি এটাই চেয়েছিলেন যে যাকেই তিনি [illegible] পাঠাবেন সেই এসে 'হুজুরে হাজির' হয়ে [illegible]। কিন্তু [illegible]

দেশে তখনো এমন কিছু কিছু লোক থেকে গিয়েছিলেন যারা ঠিক হুজুরে হাজির হবার মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মাননি।

দেব আনন্দজী তখন 'জানেমন' নামে একটি ছবি তৈরি করেছেন। 'হুজুরে হাজির' না হওয়ার শাস্তি হিসেবে তাঁর সেই ছবিটিকে বোম্বের সেন্সর কর্তৃপক্ষের সামনে পেশ না করে দিল্লীতে পাঠিয়ে দিতে বলা হলো। নির্দেশ পেয়ে ছবি পাঠানো হলো দিল্লীতে।

দিল্লীতে ছবি নিয়ে টালবাহনা শুরু হলো। দেব আনন্দজী বারবার খোঁজ নেন, কি হলো, সেন্সর সার্টিফিকেট পেতে আর কতো দেরি আছে, কেন পাওয়া যাচ্ছে না, ইত্যাদি। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট জবাব আসে না। শেষে একদিন তিনি নিজেই গেলেন তথ্য ও বেতার দপ্তরে। সেখানে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হলো। অবশেষে 'জানেমন' প্রদর্শনের সার্টিফিকেট পেলো।

এরপর দেব আনন্দজী একটা নতুন ছবি তৈরির কাজে হাত দিলেন। ছবিটার নাম: 'দেশ পরদেশ।' ঠিক হলো 'পরদেশ' সংক্রান্ত দৃশ্যগুলো তোলা হবে বিদেশে। সুতরাং তাঁকে আবার যেতে হলো তথ্য ও বেতার দপ্তরে। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে দেখা করে বিদেশে সুটিং করতে যাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি চাইলেন। অফিসারটি বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে বললেন, 'এটা আমার হাতে নেই; আপনি দয়া করে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করুন।'

দেব আনন্দজী মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। সেখানে তখন আর একজন বসেছিলেন; শুক্লাজী তাঁর সাথে দেব সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর নাম ভিঠ্ঠলভাই প্যাটেল; ইনি নির্বাচনে কংগ্রেসের তরফ থেকে দাঁড়াবেন; আপনার একে নির্বাচনে কিছুটা সাহায্য করতে হবে।'

দেব আনন্দ বুঝলেন, 'দেশ পরদেশ' আর চিত্রায়িত করা যাবে [illegible] কারণ, এই শর্তে বিদেশে সুটিং করার অনুমতি নেওয়ার থেকে [illegible] ছবিটির কাজ বন্ধ করে দেওয়াটাও অনেক বেশি সম্মানজনক [illegible] হলো। এবং তিনি তাই করলেন।

শুধু যে 'জানেমন'-এর জন্যই তাঁর ওপর এই শর্ত চাপানো হলো তা নয়, এই শর্ত আরোপের আরো একটা কারণ হলো : টি. ভি.-তে নামার ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে 'জীবনভর' চুক্তির যে প্রস্তাব এসেছিলো তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন। সেই প্রত্যাখানের চরম মুল্য তাকে শোধ করতে হলো 'দেশ পরদেশ' বাবদ ইতিমধ্যে ব্যয়িত কয়েক লক্ষ টাকা জলে ফেলে দিয়ে।

টি. ভি.-তে জীবনভর কাজ করার চুক্তিতে সই করতে অস্বীকার করে শুধু এক দেব আনন্দ সাহেবই নন, আরো অনেককেই বিপদে পড়তে হয়েছে।

কিশোরকুমারের কাহিনী এখন সকলেরই জানা। তাঁর মতো একজন প্রখ্যাত গায়ককে যেভাবে নাস্তানাবুদ করা হয়েছে তার কোনো তুলনাই হয় না। শুধু যে টি. ভি. এবং রেডিওতে তাঁর গান প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো তাই নয়, অন্যান্য ব্যাপারেও তাঁকে বেশ বিপদে ফেলার চেষ্টা চলেছিলো। বিদেশী মুদ্রা আইন ভঙ্গ থেকে পাশপোর্ট জাল ইত্যাদি বহু রকম আইনগত দিক থেকে তাঁকে 'উচিত শিক্ষা' দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো সরকারের তরফে। তখন কিশোরকুমার বাধ্য হয়েই সোজাসুজি গিয়ে দেখা করেন শুক্লাজীর সঙ্গে। নিজের কৃতকর্মের জন্য দুঃখপ্রকাশ করে এ-যাত্রা মাফ করে দেবার আবেদন জানান তাঁর কাছে। আবেদনে শুক্লাজী প্রীত হন। সেদিন থেকে আবার রেডিও এবং টি. ভি.-তে প্রচারিত হতে থাকে কিশোরকুমারের গান।

একই বিড়ম্বনা ঘটতে যাচ্ছিলো লতা মুঙ্গেশকারের কপালেও। তাঁকেও একদিন ডেকে বলা হলো, '"গীতো ভরি শাম" অনুষ্ঠানে আপনাকে অংশ নিতে হবে।'

এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিলো যুব কংগ্রেসের তরফে। নিজেদের প্রচারের জন্য তারা এটাকে চালু করেছিলো ; এবং লোককে আকৃষ্ট করার জন্য দেশের প্রখ্যাত গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে এসে গাওয়াতো, কিন্তু তার জন্য তাদেরকে কোনো পারিশ্রমিক দিতো না।

এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিশোরকুমার প্রথম আপত্তি জানান ; তিনি বিনা পারিশ্রমিকে গান গাইতে অস্বীকার করেন। এই অস্বীকৃতির জন্য তাঁকে যা মূল্য দিতে হয়েছে, সে কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। সুতরাং লতাজীও যখন সেই পথই ধরলেন তখন ঠিক হলো তাঁকেও সেই একই দণ্ড দেওয়া হবে।

যিনি ৩০ হাজার গানের রেকর্ড করেছেন, এবং যাঁর রেকর্ড সংখ্যাই আজ দুনিয়াতে একটা 'রেকর্ড', তাঁকেও শুক্লাজী রেহাই দিতে চাইলেন না। তাঁকেও ব্ল্যাক লিস্টেড করার আয়োজন চললো।

লতাজী তখন খুব চমৎকার একটা মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি এতো রেকর্ড করেছি, এবং সে রেকর্ড এতো লোকে শুনেছে যে এরপর যদি আমার রেকর্ড রেডিও এবং টেলিভিসনে শোনানো না-ও হয় তবু আমার কোনো দুঃখ থাকবে না। বরং গান গাইতে গাইতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ; তাই এখন, এই সুযোগে যদি বিশ্রাম নিতে পারি তাহলে মনে মনে খুশিই হবে।'

কিন্তু আশার কথা, জাতির সামনে সে দুর্ভাগ্যের দিন নেমে আসেনি। প্রধানমন্ত্রীর সময়োচিত হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা মাঝপথেই থেমে যায়। ভারতীয় গোয়েবলস এই একটা ক্ষেত্রে তাঁর মনের আশা চরিতার্থ করার সময় পাননি।

লতাজীর ব্যাপারে ইন্দিরাজী হস্তক্ষেপ করেছিলেন বলে পাঠক যেন ভুলেও এটা ভেবে না বসেন যে, চলচ্চিত্র শিল্পের ওপর যে হামলা চলেছিলো, ইন্দিরাজীর তাতে সমর্থন ছিলো না।

একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

বোম্বে ফিল্ম লাইনে কবীর বেদী নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন। আগে বিভিন্ন বিজনেস হাউসের হয়ে তিনি বিজ্ঞাপনে মডেলের কাজ করতেন, তারপর ফিল্ম লাইনে চলে আসেন। এখানে ফিল্মে তেমন সুবিধে করতে পারছিলেন না বলে যে-কোনো সূত্রেই হোক কিছুদিন আগে তিনি রোমে চলে যান, এবং সেখানে দু-একটি ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ করে নেন। শোনা যাচ্ছে ইদানীং তাঁর কোনো একটি ছবি ইউরোপে যথেষ্ট সাড়া

জাগিয়েছে।

জরুরী অবস্থা চলাকালীন কবীরজী একবার দেশে এসেছিলেন। খবর পেয়ে শ্রীমতী গান্ধী একদিন তাঁকে ডেকে পাঠালেন দিল্লীতে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য। প্রধানমন্ত্রীর ডাক পেয়ে ছুটে এলেন কবীর ; দেখা করলেন শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে।

শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে বললেন, 'শুনেছি আপনি এখন রোমে খুব বড়ো অভিনেতা বলে পরিচিত হয়েছেন। সুতরাং সেদিক থেকে দেখতে গেলে ইতালীতে আপনি আমাদের একজন বিশিষ্ট বেসরকারী রাষ্ট্রদূত। অতএব আমি আপনার কাছে থেকে আশা করবো, সেদেশে ভারতের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনো কাজ আপনি করবেন না। বরং ভারতে জরুরী অবস্থায় যে উন্নতি হয়েছে সে কথাই তাদেরকে বলবেন।'

কবীরজী প্রধানমন্ত্রীর কথায় যথেষ্ট প্রভাবিত হলেন। বললেন, 'আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না ম্যাডাম যে মনে মনে আপনাকে আমি কী শ্রদ্ধা করি। আপনি আমাকে যে আদেশ দেবেন আমি তাই মাথা পেতে নেবো।'

কবীরের কথায় খুশি হলেন ইন্দিরাজী। বললেন, 'কখনো যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয় তাহলে আমার কাছে চলে আসবেন ; কোনো লজ্জা করবেন না।'

লজ্জা ব্যাপারটা কবীরের এমনিতেই ছিলো না, তার ওপর যখন ইন্দিরাজী সেধেই বললেন যে 'সাহায্যের দরকার হলে চাইবেন' তখন আর তিনি নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। ব্যাপারটাকে ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবি না রেখে সঙ্গে সঙ্গে 'ক্যাশ' করে নিতে চাইলেন। বললেন, 'অন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই, শুধু একটা ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে সামান্য সম্মতি পেলেই হবে। আমি কিছুদিন আগে কয়েকটা হিন্দী ছবিতে অভিনয় করেছি, কিন্তু তার অনেকগুলোতেই আমার ব্যক্তিত্বের যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। সুতরাং এই ছবিগুলো যদি ইউরোপে দেখানো হয় তাহলে সেখানকার মানুষের মনে আমার যে ইমেজ গড়ে উঠেছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আপনার কাছে অনুরোধ,

এ ছবিগুলোর কোনোটাকে রপ্তানী-লাইসেন্স দেওয়ার আগে যেন আমার সাথে একবার আলোচনা করা হয়।'

'বেসরকারী রাষ্ট্রদূত' কবীরের আবেদনে সম্মত হলেন ইন্দিরাজী ; কথা দিলেন, 'তাই হবে।'

এর কদিন পরে বিজয় আনন্দ পরিচালিত 'বুলেট' নামে একটি ছবির শুভমুক্তি ঘটলো। এই ছবিটিতে উপরোক্ত কবীর বেদীও অভিনয় করেছিলেন।

এই 'বুলেট' নিয়েই শুরু হলো বুলেট চালাচালি। ছবিটির নির্মাতা নবকেতন নামে একটি প্রতিষ্ঠান ; সেই প্রতিষ্ঠানের মালিক হচ্ছেন শ্রী দেব আনন্দ। আনন্দজী যে সরকারের হাতে বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হয়েছেন সেকথা আগেই বলেছি। এবার এই 'বুলেট' নিয়েও তাঁর নিগ্রহ শুরু হলো। এবং সেটা করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী।

ছবিটির পরিচালক বিজয় আনন্দ ঠিক করেছিলেন ইউরোপে ছবিটির একটি বিশেষ প্রিমিয়ার শো করবেন। সেই অনুযায়ী বিধি ব্যবস্থা করার কাজে তিনি লেগে পড়েছিলেন। কিন্তু সেসময় হঠাৎ একদিন রোম থেকে একটা চিঠি এলো তাঁর নামে। চিঠিটা লিখেছেন কবীর বেদী। তাতে বেদী বলেছেন, 'ইউরোপে "বুলেট"-এর প্রিমিয়ার শোয়ের ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে। তবে যদি আমাকে ওভারসিজ রাইট দেওয়া হয় তাহলে আমি ছবিটাকে এখানে রিলিজ করতে দিতে রাজি আছি।'

কবীরের চিঠি পেয়ে বিজয় আনন্দ অবাক। তিনি ভেবেই পেলেন না কবীরের একথা লেখার সাহস হলো কিভাবে। কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই সব কিছু জানা গেলো। তখন বিজয়জী বুঝলেন, বিদেশে 'বুলেট' প্রদর্শনের চেষ্টা করা বৃথা ; যেখানে ইন্দিরাজী কবীরের সহায় সেখানে তাঁর আর করার কি আছে। অতএব বুলেটেরও সলিল সমাধি হলো বিরাট ধারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে।

'আনন্দ' পরিবারের শুধু দেব, বিজয়-ই নয়, বড়ো ভাই চেতন আনন্দকেও এই একই অভিজ্ঞতার মুখে পড়তে হয়েছে। জরুরী অবস্থা

ঘোষণার কয়েকদিন পরেই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিলো দিল্লীতে। তিনি দিল্লীতে পৌঁছোলে পর তাঁকে একটি ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর করতে বলা হয়। সে ঘোষণা-পত্রে শর্ত ছিলো, যখনি তাঁর কাছে টেলিভিসনে দেখাবার জন্য ছবি চাওয়া হবে, তখনি তিনি তা দিতে বাধ্য থাকবেন।

কোনো বিবেকবান ভদ্রলোকের পক্ষে এ ধরনের শর্তে রাজি হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং চেতন আনন্দও রাজি হতে পারেননি। ফলে শুক্লা সাহেব তাঁকেও তাঁর অন্য দু ভাইয়ের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে দিলেন। যিনি এককালে 'হকিকৎ' এবং 'হিন্দুস্তান কী কসম' করেছিলেন তিনিই সরকারের কাছে রাতারাতি 'হিন্দুস্তান কী দুশমন' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলেন।

চেতনজী গোগোলের বিখ্যাত কাহিনী 'দ্যা ইনস্পেক্টর জেনারেল' অবলম্বনে একটি হিন্দী ছবি তুলেছিলেন। সেটি পাঠিয়েছিলেন সেন্সর বোর্ডে। একদিন দুদিন করে পুরো ছটা মাস কেটে গেলো, কিন্তু সেন্সর অফিস থেকে কোনো খবর এলো না। তখন চেতনজী দেখা করলেন সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী খান্দপুরের সঙ্গে। কিন্তু খান্দপুরের মুখ থেকে কোনো আশাব্যঞ্জক কথা শোনা গেলো না।

এর কিছুদিন পর একটা চিঠি এলো। চিঠিতে বলা হলো, 'একজামিনিং কমিটি আপনার ছবিটি দেখেছে। তাদের মতে ছবিটির বেশ কিছু দৃশ্য আপত্তিজনক। অতএব সেগুলি বাদ দিলে তবেই ছবিটিকে প্রদর্শনের যোগ্য বলে ঘোষণা করা সম্ভব হবে।'

চেতন আনন্দ একজামিনিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। দাবি জানালেন, ছবিটিকে রিভাইজিং কমিটির সামনে পেশ করা হোক।

তাঁর দাবি মেনে নেওয়া হলো, কিন্তু সেখানেও খুব একটা ইতর বিশেষ হলো না। শেষে ঠিক হলো ছবিটিকে দিল্লীতে পাঠানো হবে। সেখানে তিনজন বিচারকের এক কমিটির সঙ্গে তিনি ছবিটির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেলো, সেই তিনজন বিচারক সেখানে এলেন না, পরিবর্তে তথ্য ও বেতার মন্ত্রীর পরিবারের

লোকেরা এলেন ছবিটি দেখতে।

মন্ত্রী মহাশয়ের পরিবারের লোকজন ছবি দেখে যাওয়ার পরদিন একসাথে ভৌতিকভাবে আবির্ভূত হলেন সেই তিনজন বিচারক। তারা ছবিটি দেখলেন, এবং যাওয়ার সময় ছবিটির প্রদর্শনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে গেলেন।

চেতনজী কিন্তু এতেও আশা ছাড়লেন না; তিনি নতুন করে লড়াই শুরু করলেন। জানতে চাইলেন কি কারণে তাঁর ছবিটিকে 'ব্যান' করা হচ্ছে।

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর এলোনা। তবে জানানো হলো, ছবিটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হচ্ছে কয়েকটি বিশেষ শর্তে। শর্ত হলো, বেশ কয়েকটি দৃশ্যকে কেটে বাদ দিতে হবে।

চেতনজী এ শর্তও মেনে নিতে প্রস্তুত নন; তাই দাবি জানিয়েছেন, শুধু নিষেধাজ্ঞা তুললেই হবে না, ছবির এতোগুলো দৃশ্য কেন কাটতে হবে তাঁর কারণও জানাতে হবে।

কিন্তু সে কারণ জানাবার আর দরকার হবে না। কারণ, ইতি-মধ্যে দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন আর কারণ জানাবার মালিক 'কংগ্রেস' নয়, 'জনতা' সরকার। তাই আশা করা যায় এ দেশের জনতা কিছুদিনের মধ্যেই চেতনজীর 'সাহেব বাহাদুর'কে দেখার সুযোগ পাবেন।

চেতনজীর সাহেব বাহাদুরই শুধু নয়, আরো বহু ছবিই ক্রমে ক্রমে দর্শকদের সামনে হাজির হবে। তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি ছবির নাম 'ধরম-বীর'। ছবিটি তৈরি করেছেন মনমোহন দেশাই এবং সুভাষ দেশাই নামে দুজন ভদ্রলোক।

ছবিটিতে কি আছে তা আমার জানা নেই, তবে শুনেছি, সাধারণত বাজার চলতি হিন্দী ছবিতে যা যা থাকে তার সবকিছুই এতে আছে। অর্থাৎ এটি অন্যান্য মাথামুণ্ডুবিহীন হিন্দী ছবিরই এক নতুন সহদর। এ ধরনের ছবিকে সেন্সর ছাড়পত্র দেওয়া উচিত কি উচিত নয়, সে বিতর্কে আমি যেতে চাইছি না; তবে এই প্রসঙ্গে শুধু এইটুকুই উল্লেখ করতে

চাই যে গত দেড় দু বছরব্যাপী যতোগুলি হিন্দী ছবি সেন্সর ছাড়পত্র পেয়েছে তার শতকরা নব্বইটিই এ ধরনের ছবি। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের অন্যান্য ছবিকে যখন ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে তখন এ ছবিটিকেই বা তা দেওয়া হলো না কেন ?

এ ছবিটিকে ছাড়পত্র না দেওয়ার পেছনের কারণ কি তা জানলে পাঠক বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। 'সোলে' নামক একটি ছবি যে সেন্সর বোর্ডের রিভিউর পরও অক্ষত অবস্থায় প্রদর্শিত হবার ছাড়পত্র পেয়েছিলো সে কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। এবং কি কারণে সেই ছবিটিতে খুনখারাপী ডাকাতি-রাহাজানি-মদ্যপান ও উত্তেজক দৃশ্যের ছড়াছড়ি থাকা সত্ত্বেও সেন্সরের কাঁচির স্পর্শ লাগেনি তাও পাঠক জেনে গেছেন। কিন্তু তার থেকেও বিস্ময়কর তথ্য এবার আপনাদের সামনে হাজির করছি।

ইদানীং ভারতবর্ষে যেসব ছবি তৈরি হয়েছে তার মধ্যে 'সোলে'ই ছিলো সব থেকে ব্যয়বহুল এবং একমাত্র ৭০ মিলি মিটারের ছবি। এই ছবিটির অসাধারণ জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে শ্রী মনমোহন দেশাই ও শ্রীসুভাষ দেশাই আরো বেশি অর্থ ব্যয়ে আরো বেশি উত্তেজক দৃশ্যাবলী সহযোগে 'ধরম-বীর' ছবিটি তৈরি করেন। এটিও ৭০ মিলি মিটারেই তৈরি হয়েছে।

ছবিটি তৈরির সময়েই বাজারে গুজব এবং প্রচার রটতে থাকে যে এ ছবি সোলের থেকেও অনেক বেশি আকর্ষক ও উত্তেজক হবে। ফলে দর্শকদের মধ্যেও ছবিটি দেখার জন্য মানসিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। এতে সোলে ছবির নির্মাতা শ্রী জি. পি. সিপ্পী মনে মনে প্রমাদ গুণলেন। কারণ তখনো তাঁর সোলে ভারতবর্ষের অনেক শহরেই হাউসফুল চলেছে। সুতরাং সেসময় যদি ধরম-বীর মুক্তি পেয়ে যায় তাহলে হয়তো হুজুগে দর্শক সোলে ছেড়ে ধরম-বীরের সামনেই লাইন লাগাতে শুরু করবে। অতএব শ্রী সিপ্পী তাঁর বন্ধু বিদ্যাচরণ শুক্লার কাছে দরবার শুরু করলেন, যতোক্ষণ না আমি বলছি ততোক্ষণ ধরম-বীরকে ছাড়পত্র দেবেন না।

শ্রী সিপ্পী যে জরুরী অবস্থায় কংগ্রেস সরকারের কাজকর্মকে সমর্থন করে মাঝে মাঝেই বিবৃতি দিচ্ছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। তাঁর এই

বিবৃতির মূল্য তিনি এবার আদায় করলেন। বিদ্যাচরণ শুক্লার নির্দেশে 'ধরম-বীর' সেন্সর বোর্ডের ঠাণ্ডা ঘরে বন্দী হয়ে গেলো। যে লোকটি বহু আশা নিয়ে সুদে লক্ষ লক্ষ টাকা ধার করে ছবিটি নির্মাণ করেছিলেন কিছু লাভের আশায় তার কথা কংগ্রেসী সরকারের মন্ত্রী একবার চিন্তাও করলেন না। একজন মোসাহেবের স্বার্থ রাখতে গিয়ে নির্দ্বিধায় আর একজনের সর্বনাশ করলেন!

এতো গেলো বাইরের লোকের ব্যাপার। কংগ্রেসের নিজেরই দলের একজন লোকসভা সদস্যের তোলা ছবির কী হাল করা হয়েছে তা জানলে পাঠক চমকিত না হয়ে পারবেন না।

অমৃত নাহাটা ছিলেন কংগ্রেস দলের এম. পি। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'আমি সেইসব রাজনীতিকদের মধ্যে একজন ছিলাম যাদেরকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর একান্ত কাছের লোক বলে মনে করা হতো। একদিন রাতে আমরা কয়েকজন বন্ধু ইন্দিরাজীর সঙ্গে তাঁর বাসভবনে ডিনার খেতে বসেছি, কথায় কথায় হঠাৎ তিনি আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন, "নাহাটাজী, আপনি কি মনে করেন রাজনীতিতে ন্যায় অন্যায় বলে কিছু আছে?" প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠলাম, ব্যথিত হলাম। এরপর দেশের রাজনীতির গতি যে পথে এগোতে লাগলো তাতে আমি স্থির নিশ্চিত হলাম যে এ দেশের ভাগ্যে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী জুটেছেন যিনি ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে কোনো ফারাক দেখেন না—যিনি নিজের ক্ষমতা রাখার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত।'

নাহাটার সঙ্গে আগে থাকতেই ফিল্ম লাইনের যোগাযোগ ছিলো। তিনি 'সন্ত জ্ঞানেশ্বর' নামে একটি ছবি পরিচালনাও করেছিলেন। তাছাড়া একটি রাজনৈতিক ছবি তোলার চেষ্টা করেছিলেন 'সবসে বড়া সওয়াল' নামে। কিন্তু ফিল্ম ফাইনান্স করপোরেশন থেকে কোনোরকম আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় তাঁকে সে পরিকল্পনা বাতিল করে দিতে হয়।

কিন্তু এবার আর তা হলো না। ইন্দিরা গান্ধীর প্রশ্ন ও মন্তব্যে নাহাটাজী এতো বেশি আঘাত পেয়েছিলেন এবং মনে মনে এতো বেশি

শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন যে প্রতিমুহূর্তে একটা কিছু করা দরকার বলে অন্তরে উপলব্ধি করছিলেন। সেই উপলব্ধিরই ফলশ্রুতি হলো 'কিস্সা কুর্শী কা।'

নাহাটাজী ঠিক করলেন দেশের জনমতকে জাগরিত করে তোলার জন্য তিনি সব থেকে সহজ মাধ্যম চলচ্চিত্রের আশ্রয় নেবেন। 'সবসে বড়া সওয়াল'-এর স্ক্রিপ্ট তৈরিই ছিলো, সেটাকে একটু ঘষামাজা করে নিয়ে সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা হলো। এবার তার নাম দেওয়া হলো 'কিস্সা কুর্শী কা।'

ছবিটি তুলতে গিয়ে কোনোরকম আইনগত বাধার সম্মুখীন হতে হবে কিনা এ ব্যাপারে নাহাটাজী বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত আইনজীবীর সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারা প্রত্যেকেই বললেন কোনো আইনের সাহায্যেই সরকার এ ছবির প্রদর্শন বন্ধ করতে পারবে না।

সব ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ হলো তখন সমস্যা দেখা দিলো টাকার। সাধারণতঃ বোম্বেতে তৈরি হিন্দী ছবির খরচ খরচার একটা বিরাট অংশ অগ্রিম হিসেবে সরবরাহ করেন ডিস্ট্রিবিউটররা ; আর সে কারণেই তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যে ধরনেরই ছবি হোক না কেন তাতে সেক্স-ক্রাইম ভায়োলেন্স-হরর-রোমান্স-মোলোড্রামা রাখতেই হয়। কিন্তু নাহাটাজী তাঁর ছবিতে সে সব রাখতে অস্বীকার করলেন, ফলে কোনো ডিস্ট্রিবিউটরও এগিয়ে এলো না তাঁকে সাহায্য করতে।

নাহাটাজী দমলেন না, তিনি আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এবং সবশেষে মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে উনিশ শো চুয়াত্তরের জুলাই মাসে 'কিস্সা কুর্শী কা'র স্যুটিং শুরু করলেন। অক্টোবরের মধ্যে স্যুটিং শেষ হয়ে ছবির নেগেটিভ এলো এডিটিং টেবিলে। তখনো এডিটিং, ডাবিং, ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক, মিক্সিং এবং স্পেশাল এফেক্ট দেওয়া বাকি রয়ে গেছে। সেটা সারতে সময় লাগলো আরো পাঁচ মাস। ইতিমধ্যে নেগেটিভ বাবদ নাহাটাজীর খরচ হয়ে গেছে ৯ লক্ষ টাকা।

আরো ২ লক্ষ টাকা খরচ করে ছবির প্রিণ্ট তৈরি করলেন

নাহাটাজী; এবং ১৯৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল বোম্বাইতে সেণ্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সরস-এর কাছে ছবিটির প্রদর্শনের সার্টিফিকেট চেয়ে একটি প্রিণ্ট সহ আবেদন দাখিল করলেন। বোর্ডের অ্যাকটিং চেয়ারম্যান প্রথমেই সেটিকে পাঠিয়ে দিলেন রিভাইজিং কমিটির কাছে, এবং যখন দেখলেন যে রিভাইজিং কমিটির সদস্যদের বেশির ভাগই ছবিটিকে সেন্সর সার্টিফিকেট দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করছেন তখন তিনি ব্যাপারটা রেফার করলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে।

প্রায় আড়াই মাস চুপচাপ কাটলো। এই সময়টুকুর মধ্যে বিদ্যাচরণ শুক্লার দপ্তর থেকে ছবিটি সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য করা হলো না। শেষে একদিন হঠাৎ একটা চিঠি দিয়ে জানানো হলো ছবিটির ৪০টি দৃশ্য আপত্তিজনক, এবং এ সম্পর্কে শ্রী নাহাটার যা বক্তব্য তা ১১ জুলাই জানাতে হবে।

চিঠি পেয়ে জবাব তৈরি করলেন শ্রী নাহাটা। ১১ জুলাই সেই জবাব পৌঁছে দেওয়া হলো তথ্য ও বেতার দপ্তরে। কিন্তু আশ্চর্য, নাহাটাজীর চিঠিটা পড়া প্রয়োজনই বোধ করলেন না তথ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, তিনি সেদিনই এক আদেশ জারি করলেন: 'কিস্সা কুর্শী কা' চলচ্চিত্রটিকে প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে না।

এর তিনদিন পর, ১৪ জুলাই ভারত সরকারের তরফে ঘোষণা করা হলো: ভারতরক্ষা বিধি অনুযায়ী 'কিস্সা কুর্শী কা' ছবিটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ছবিটির নেগেটিভ ও প্রিণ্ট বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হচ্ছে।

আদেশ শুনে নাহাটাজী ভীত হলেন একথা ভেবে যে হয়তো সরকার তাঁর ছবিটির নেগেটিভ নিয়ে গিয়ে নষ্ট করে ফেলবে। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন জানালেন সরকারকে এ ধরনের কাজ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার আদেশ দেবার জন্য। সুপ্রীম কোর্ট তাঁর আবেদনের উত্তরে ১৮ জুলাই তাঁকে আদেশ দিলেন ছবির নেগেটিভ, প্রিণ্ট এবং অন্যান্য যাবতীয় জিনিস সরকারের হাতে তুলে দেবার জন্য, এবং সেই সঙ্গে সরকারকেও আদেশ দিলেন যতোক্ষণ না রিট পিটিশনের

চূড়ান্ত ফয়সালা হচ্ছে ততোক্ষণ যেন প্রাপ্ত সব জিনিসের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

২৬ অক্টোবর সুপ্রীম কোর্ট সরকারকে নির্দেশ দিলেন বিচারকরা ছবিটি দেখতে চান এবং তারজন্য দিন স্থির হলো ১৭ নভেম্বর ১৯১৩।

নির্ধারিত দিনের দু সপ্তাহ আগে সরকারী কৌশলী হঠাৎ এসে কোর্টকে জানালেন: 'কিস্সা কুর্শী কা' ছবিটির একমাত্র যে পজেটিভ প্রিণ্টটি সরকারের হেফাজতে ছিলো সেটি পাওয়া যাচ্ছে না, সুতরাং কোর্ট নির্ধারিত দিনে বিচারকদের সামনে ছবিটিকে দেখানো সম্ভব হবে না।

৩০ জানুয়ারি সুপ্রীম কোর্ট সরকারকে আদেশ দিলেন ছবিটির প্রিণ্ট খুঁজে বের করার জন্য এবং সে আদেশে এ-ও বললেন, যদি প্রিণ্ট খুঁজে না পাওয়া যায় তবে সরকারের হেফাজতে যে নেগেটিভটি রয়েছে তা থেকে যেন একটি প্রিণ্ট তৈরি করে সেটি কোর্টের সামনে প্রদর্শন করা হয়।

এর উত্তরে ২ মাস ১৯ দিন পর সরকারের তরফে কোর্টকে জানানো হলো যে ছবিটির নেগেটিভটিও পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দিরা গান্ধীর আমলে আইন-আদালতের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো এ ঘটনাটা তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। যেখানে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় আদেশ দিলেন ছবির নেগেটিভ ও প্রিণ্ট যত্ন সরকারে রক্ষণাবেক্ষণের সেখানে কিনা বারবার গড়িমসির পর তাকে জানানো হলো যে নেগেটিভ ও প্রিণ্ট দুটোই সরকারী হেফাজত থেকে চুরি হয়ে গেছে! এবং সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার এই চুরির কোনো অনুসন্ধান হলো না, এবং যারা এই চুরির জন্য দায়ী, কিংবা যাদের গাফিলতির জন্য এমন চুরিটা সম্ভব হলো তাদের কাউকেই সরকার কিছু বললেন না!

আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে অন্য। স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধীই নির্দেশ দিয়েছিলেন ছবিটির নেগেটিভ ও প্রিণ্ট দুটোই নষ্ট করে ফেলতে। সেই অনুযায়ী বিদ্যাচরণ শুক্লার চেলা চামুণ্ডারা সরকারী দপ্তর থেকে নেগেটিভ ও প্রিণ্ট সরিয়ে ফেলে। এখন জানা যাচ্ছে, নেগেটিভ ও প্রিণ্ট তখন সরকারী দপ্তর থেকে সরিয়ে ফেলা হলেও সাথে সাথে নষ্ট করা হয়নি;

নষ্ট করা হয়েছে গত দোসরা এপ্রিল উনশ শো সাতাত্তরে।

প্রিণ্ট ও নেগেটিভ সরকারী দপ্তর থেকে সরিয়ে নিয়ে রাখা হয় গুরগাঁওয়ে মারুতি কারখানায়। এতোদিন সেখানেই সেগুলো বাক্সবন্দী হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু কংগ্রেস লোকসভার নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর যারা একাজ করেছিলো তারা বেশ ভীত হয়ে পড়ে, এবং ঠিক করে প্রিণ্ট ও নেগেটিভ জ্বালিয়ে ফেলবে। সেই অনুযায়ী কাজ শুরু হয় দোসরা এপ্রিল রাত একটার পর, এবং শেষ হয় ভোর পাঁচটা নাগাদ। কাজ শেষ করে সকাল ছটার মধ্যে যে যার বাড়িতে ফিরে আসে। এদের মধ্যে একজন, যিনি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় প্রতিদিনই প্রাতর্ভ্রমণে বের হতেন সঙ্গে একটি কুকুর নিয়ে, তাঁকে আর সেদিন কেউ প্রাতর্ভ্রমণে বের হতে দেখেননি। সেদিন তাঁর কুকুরটিকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছিলো তাঁর পরিবারের একজন পুরাতন ভৃত্য—যাকে দু দশক আগে নিয়ে আসা হয়েছিলো এলাহাবাদের নিকটবর্তী ফুলপুর থেকে।

'কিস্যা কুর্শী কা' তুলতে অমৃত নাহাটার খরচ হয়েছিলো ৯ লক্ষ টাকা, সে বাবদ তাঁর পাওনাদারদের কাছে সুদ বাকি রয়েছে ২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এখন তাঁর বাজারে ধার মোট ১১ লক্ষ টাকা। যেহেতু তিনি ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী মনোবৃত্তিকে সমর্থন করতে পারেননি, সেহেতু একজন কংগ্রেসী লোকসভা সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ইন্দিরাজী তাঁকে রেহাই দেননি। শুধু প্রিণ্টই নয় ছবির নেগেটিভ পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়ে তাঁর ভবিষ্যতের সব আশাকে তিনি একেবারে নির্মূল করে দিয়েছেন। এখন পাওনাদারদের তাগাদায় তাগাদায় অস্থির হওয়া ছাড়া শ্রী নাহাটার সামনে আর কোনো রাস্তাই খোলা নেই।

এ ধরনের তুঘলঘী কারবার আরো অনেক ঘটেছে। কিন্তু যেহেতু পরিসর অল্প তাই অনেক কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও বলা সম্ভব নয়। তবু কিছু কথা আছে, যা না বললে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষগুলির সাথে কংগ্রেস সরকার উনিশমাসব্যাপী যে অন্যায়, অপমানকর ব্যবহার করেছে তা চিরকাল জনতার অজ্ঞাতেই থেকে যাবে।

বিদ্যাচরণ শুক্লা এবং তাঁর দলবল ফিল্ম জগতের কাউকেই যেন

মানুষ বলে মনে করেনি। যখন যাকে খুশি ডেকে পাঠিয়েছে দিল্লীতে ; যাকে দিয়ে যা ইচ্ছা করাবার চেষ্টা করেছে।

তাদের এক নম্বর লক্ষ্য ছিলেন হেমা মালিনী। বিদ্যাচরণজী হেমা মালিনীকে মনে করতেন যেন তাঁর মাইনে করা বাঁদী। একবার নয়, দুবার নয়, বহুবার বহু অনুষ্ঠানে তিনি তাঁকে যেতে বাধ্য করেছেন। এমনকি গত বছর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও বিদ্যাচরণ হেমাজীকে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সামনে নাচিয়ে ছেড়েছেন। হেমাজী বলেছিলেন, শরীরটা ভালো নেই। কিন্তু বিদ্যাচরণ সে কথা শুনতে চাননি। ভয় দেখিয়েছিলেন, না নাচলে অন্য ব্যবস্থার কথা চিন্তা করবেন তিনি। ফলে অসুস্থ শরীর নিয়েও হেমাজী নাচতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সারাটা চলচ্চিত্র জগত বিদ্যাচরণের ভয়ে এতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো যে প্রায় প্রত্যেকেই বাড়িতে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখতেন সবসময়। প্রত্যেকেরই মনে ভয় থাকতো, হয়তো এখনি বিদ্যাচরণের ফোন আসবে ; হয়তো হুকুম হবে ঃ ফাস্ট প্লেনেই চলে আসুন দিল্লী, কিংবা বোম্বে থেকে নাইট ফ্লাইট ধরে চলে যান রায়পুর— সেখানে আমার কিছু ফলোয়ার একটা জলসা করছে, তাতে তারা আপনার নাম এনাউন্স করে দিয়েছে।

এ ধরনের ঘটনা তখন হরদম ঘটছে। সকলেই সবসময় ভয়ে ভয়ে রয়েছে, এই বোধ হয় তার নাম বিদ্যাচরণের 'ব্ল্যাক লিস্টে' ঢুকে গেলো, কিংবা এই হয়তো বিদ্যাচরণ বলে পাঠালেন 'আপনার ব্যাপারে অন্য ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হচ্ছে।'

এই 'অন্য ব্যবস্থা' জিনিসটা যে কি পাঠক সম্ভবতঃ সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। তাদের অবগতির জন্য জানাই, সংক্ষেপে এই 'অন্য ব্যবস্থা'র মানে হচ্ছে ঃ 'আপনার অভিনীত কিংবা আপনার পরিচালিত কিংবা আপনার প্রযোজিত কিংবা আপনার সুরারোপিত কোনো ছবির মুক্তি হবে না। আপনার সাথে যে ছবির সামান্য সম্পর্কও থাকবে সেটাকে জমা করে দেওয়া হবে সেন্সর বোর্ডের মর্গে।'

এ ধরনের অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়েছে। তার ফলে যে বিপুল পরিমাণ ছবি তৈরি হওয়া সত্ত্বেও সরকারী বাধার জন্য মুক্তি পায়নি সেগুলো এখন মুক্তি পেতে শুরু করবে। এবং আমার ধারণা তার অনেকগুলোই আশানুযায়ী ব্যবসায়িক সাফল্য পাবে না। কেননা এতোগুলো ছবি একসাথে মুক্তি পেলে দর্শকরা কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবেন তাই ঠিক করে উঠতে পারবেন না। তাছাড়া বহু ছবি একসাথে মুক্তি পাওয়ার জন্য হলেরও টানাটানি পড়ে যাবে। সেটাও ব্যবসায়িক অসাফল্যের একটি কারণ হবে।

আতঙ্ক চিত্রজগতের লোকদের কোন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলো তার দু একটি ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গের শেষ করবো।

নির্বাচনের ঠিক আগেই জনতা পার্টিকে সমর্থনের আবেদন জানিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা যে বিবৃতি প্রচার করেছিলেন তাতে সই ছিলো মোট ৬১ জনের। এই সাক্ষরকারীদের মধ্যে রাজেশ খান্নাও ছিলেন। অথচ এই লোকটিই জরুরী অবস্থা চলাকালীন দিনের পর দিন, যখনি সুযোগ ঘটেছে, যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতী অম্বিকা সোনিকে বাড়িতে ডেকে এনে ডিনার খাইয়েছেন। তাঁর সাথে মিশতে পেরে এমন ভাব দেখিয়েছেন যে মনে হয়েছে অম্বিকাজী তাঁর সাথে মেশায় তিনি যেন নিজেকে ধন্য মনে করছেন।

আর একটি নমুনা :

পালাম এয়ারপোর্টে অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো দেব আনন্দের। তখন সবে নির্বাচন হবে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু কবে হবে তা বলা হয়নি। অটলজী দেব আনন্দকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন। কারণ, তিনি শুধু দেব আনন্দজীরই বন্ধু নন, তাঁর পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গেও অনেকদিন ধরেই ঘনিষ্টভাবে পরিচিত। কিন্তু দেব আনন্দ অটলজীকে জড়িয়ে ধরতে পারলেন না। এ ঘটনার কথা মনে করে নির্বাচনের পরে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, ‘আজ আমার লজ্জায় মাথা নুয়ে আসছে এই কথা ভেবে যে সেদিন অটলজী আমাকে অমন ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে ধরা সত্ত্বেও তাঁকে আমি সামান্য

আলিঙ্গনও করতে পারিনি শুধু এই ভয়ে যে হয়তো কেউ এ ঘটনাটাকে পরে আমার বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে।'

এই ছিলো সেদিন সমগ্র চলচ্চিত্র জগতের অবস্থা। তখন কোনো বন্ধু কাউকে চিঠি লিখলেও লোকে আতঙ্কিত হতো। মনে করতো এই বুঝি পুলিশ এসে হাজির হলো; এই বুঝি গ্রেপ্তার করে নিয়ে ভরে দিলো সেই অন্ধ কুঠুরিতে, যেখানে স্নেহলতা রেড্ডির মতো একজন রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্তা নায়িকা প্রতি মুহূর্তে ধুকে ধুকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে।

তবু সেদিন সেই ভয়ঙ্কর আতঙ্কের আবহাওয়ার মধ্যেও একটি লোক যে সাহস দেখিয়েছেন তার তারিফ করতেই হয়। ভদ্রলোকের নাম প্রাণ। জরুরী অবস্থায়ও তিনি যেভাবে প্রতিবাদ মিশ্রিত স্বরে কথা বলেছেন তার জন্য বোম্বের চিত্র জগত চিরকাল তাঁর কাছে ঋণী থাকবে। তিনি না থাকলে শত্রুঘন সিনহা, অমল পালেকর, গোল্ডি আনন্দ, গুলজার, হৃষিকেশ মুখার্জী—এঁদের কেউই অমন জোরের সঙ্গে 'জনতা'র পক্ষে আওয়াজ তুলতেন কিনা সে-বিষয়ে আমার আজো সন্দেহ আছে।

চিত্র জগতে যখন একটার পর একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে চলেছে তখন এদিকে দিল্লীর রাজনৈতিক মঞ্চেও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে একটার পর একটা দৃশ্য।

ইন্দিরা গান্ধী সঞ্জয়কে অনেক আগেই কাঁধে তুলে দিয়েছিলেন, শুধু বাকি ছিলো মাথায় চড়াবার কাজটুকু। সেই বাকি কাজটুকুও তিনি এবার সম্পূর্ণ করে দিলেন। গৌহাটি কংগ্রেসে সঞ্জয় এবং তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা আমাদের পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছো।' অর্থাৎ বুড়োদের আর কিছু করার নেই, এবার যা কিছু করার তা যুব কংগ্রেসভুক্ত যুবকদেরকেই করতে হবে।

যদিও ছুনিয়ার হাটে সবকারী দালালদের দল জরুরী অবস্থা শুরুর অনেক আগে থাকতেই প্রচার করে আসছিলো ভারতবর্ষের মানুষের মতো এমন সুখে শান্তিতে থাকার সৌভাগ্য ছুনিয়ার আর কোনো দেশের

মানুষের হয়নি, কিন্তু সেকথা বিশ্বাস করার মতো লোক কোথাও খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। তারপর জরুরী অবস্থা যখন জারি হলো তখন তো দালালদের গলার আওয়াজের চোটে লোকের কান ফাটার যোগাড়। কিন্তু যতোই আওয়াজ উঁচুতে উঠতে লাগলো ততোই বিশ্বাসীদের দলে ভাঁটার টান আসা শুরু হলো। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে সারাটা ত্বনিয়া ঘুরেও, একমাত্র 'যাই. হোক না কেন কুড়ি বছর বিশ্বাস করবোই' চুক্তিতে যারা সই করেছে তাদেরকে ছাড়া বিশ্বাস করাবার মতো আর কাউকে খুঁজে পাওয়াই ভার হলো। ফলে দালালদের মধ্যেও আর তেমন উৎসাহ রইলো না। এবং সত্যি বলতে কি, মিথ্যে কথা বলতে বলতে তাঁরা এতো বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো যে, তাঁদের প্রত্যেকেরই কিছুদিনের জন্য ছুটি নেওয়াটা তখন স্বাস্থ্যের কারণেই জরুরী হয়ে উঠেছিলো। অতএব সে কথা তারা বিভিন্নভাবে দিল্লীকে জানাতে লাগলো।

পৃথিবীর সমস্ত রাজধানী থেকে 'বিশেষ ডাকে' আসা চিঠিতে চিঠিতে যখন ইন্দিরাজীর টেবিল একেবারে বোঝাই হয়ে উঠলো তখন তিনি ব্যাপারটা বেশ গভীরভাবে ভাবা শুরু করলেন।

আমাদের 'কুড়ি বছরের বন্ধু'রা মুদ্রার বিনিময় হারের ব্যাপারে কিছুদিন ধরে একতরফাভাবে যেসব সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন তাতে শ্রীমতী গান্ধী যথেষ্ট ত্বশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কেননা 'কুড়ি বছরের বন্ধু'দের খুশি রাখার জন্য 'বন্ধু হতে পারতেন' এমন অনেককেই তিনি বিদায় করে দিয়েছিলেন এই আশায় যে কুড়ি বছরের বন্ধুরা আমাদের বিপদের দিনে আর্থিক সাহায্যের থলি নিয়ে এগিয়ে আসবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেলো আর্থিক সাহায্যের থলি নিয়ে এগিয়ে আসা তো দূরের কথা, তারা বারবার মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তনের জন্য চাপ দিয়ে চলেছে। অথচ তাদেরকে খুশি রাখার জন্য আমরা আমাদের দেশ থেকে কোটি কোটি টাকার মাল অর্ধমূল্যে, এমনকি এক তৃতীয়াংশ মূল্যেও রপ্তানী করেছি।

যদিও বাইরে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছিলো যে

আমাদের বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার একেবারে উপচে পড়ছে, কিন্তু আসল সত্য ছিলো এই যে, সেই ভাণ্ডারে সঞ্চিত মুদ্রার বেশির ভাগই আন্তর্জাতিক বাজারে বিনিময়যোগ্য নয়। ফলে আমাদেরকে বাধ্য হয়েই অনেক জিনিস এই 'কুড়ি বছরের বন্ধু'দের কাছ থেকে আমদানি করতে হচ্ছিলো, এবং আমাদের বন্ধুরাও মওকা বুঝে এমন দর হাঁকছিলেন যে আমাদের নাভিশ্বাস ওঠার যোগাড় হয়েছিলো।

শ্রীমতী গান্ধী এই অসহায় অবস্থা থেকে নিস্তার পেতে চাইছিলেন। তাই দুনিয়ার অনেক রাজধানীতেই তিনি 'বন্ধুদের' পাঠিয়েছিলেন 'নতুন বন্ধু' খুঁজে বের করার জন্য। তাঁর সেই বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই এই বন্ধু খোঁজার কাজে সফলতা অর্জন করেছিলেন। এমনকি অনেকে অগ্রিমই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা 'বিনিময়যোগ্য' মুদ্রার থলি হাতে নিয়েই বন্ধুত্ব করতে চান। তবে একটা শর্তে : যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচন করতে হবে। কেননা, যে-দেশে ছ বছর ধরে নির্বাচন হয়নি সে দেশকে সাহায্য দেওয়াটা তাঁদের দেশের পার্লামেণ্ট অনুমোদন করবে না।

এ ছাড়া আরো একটা কারণ ছিলো। ইন্দিরাজী অনেক কষ্টে যে ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করে তুলেছিলেন সেটাকে তিনি অন্য কারো হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে রাজি ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছে ছিলো ক্ষমতা 'তৃতীয় পুরুষ'-এ বর্তাক। তাই তৃতীয় পুরুষের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ করার জন্য নির্বাচন করাটা জরুরী হয়ে উঠেছিলো। কেননা একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই লোকসভা থেকে 'বুড়ো হাবড়াদের' সরিয়ে দিয়ে সেখানে যারা 'পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছে' সেই নতুন প্রভাতের দূতদের নিয়ে আসা সম্ভব। এবং তা যদি একবার করা যেতো তাহলে তৃতীয় পুরুষকে ক্ষমতার গদিতে বসিয়ে দেবার পথে আর কোনো বাধাই থাকতো না।

অবশ্য নির্বাচনের পরেই যে তৃতীয় পুরুষ ক্ষমতার গদিতে বসে যেতো তা নয়। তবে তাকে ক্ষমতার গদির একেবারে কাছাকাছি এনে 'ফিক্স' করে ফেলা যেতো। আর সে কারণেই আমরা দেখতে পাই, নির্বাচন ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যে প্রেস কনফারেন্স ডেকে শ্রীমতী

অম্বিকা সোনি বিবৃতি দিচ্ছেন: যুব কংগ্রেসকে নির্বাচনে অন্তত ২০০টি আসন দিতেই হবে।

নির্বাচনে গেলে জেতা যাবে কিনা এ ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর আদরের 'র'কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। 'র' অর্থাৎ 'রিসার্চ অ্যাণ্ড অ্যানালিটিক্যাল উইংস' শ্রীমতী গান্ধীর প্রশ্নের উত্তরে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়েছিলো। আর তার সেই ঘাড় নাড়াতেই তিনি এতো খুশি হয়ে উঠেছিলেন যে পরদিনই মন্ত্রীসভার বৈঠক ডেকে প্রস্তাব রাখলেন: আমি নির্বাচনে যেতে চাই।

প্রস্তাব শুনে সকলেই হতভম্ব হয়ে গেলেন। দু মিনিট আগেও কেউ এটা কল্পনা করতে পারেননি। কেননা গত কয়েকদিন ধরেই তারা সংবাদপত্রে শ্রীমতী গান্ধীর সাঙ্গপাঙ্গদের বিবৃতি পড়ে আসছিলেন যে 'যতোদিন না জরুরী অবস্থার সুফলগুলো দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াচ্ছে ততোদিন নির্বাচনের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।' তারা শুধু এই ভেবে অবাক হলেন যে, হঠাৎ এমন কি হলো যে-কারণে 'মুক্তিসূর্য' দেশে নির্বাচন করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন!

অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন দেখা দিলেও কেউ সেটা বাইরে প্রকাশ করলেন না। কারণ 'দেশনেত্রী'র সামনে কোনোরকম কৌতূহল প্রকাশ করাটা ছিলো বারণ। বরং সবাই তাদের নিত্যদিনের অভ্যাস অনুযায়ী যেটা করা দরকার তাই করলেন; অর্থাৎ হাত তুলে সমর্থন জানালেন 'ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া'কে। ঠিক হলো কিছুদিনের মধ্যেই নির্বাচন ঘোষণা করা হবে।

আর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক বাবুজী বুঝলেন এ হচ্ছে ইন্দিরাজীর এক ঢিলে দুটো পাখি মারার খেলা। তাই আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই তিনি প্রতি-আক্রমণ করলেন। বুদ্ধির প্যাঁচ দিয়ে ইন্দিরাজীর নিক্ষিপ্ত ঢিলকে বিপথগামী করতে চাইলেন। তাঁকে বললেন, 'নির্বাচন ঘোষণা করার আগে আপনি লোকসভা ভেঙ্গে দিন।'

ইন্দিরাজী ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

বাবুজী বললেন, 'নির্বাচন ঘোষণা করলে, জরুরী অবস্থা যদি তুলে না-ও দেওয়া হয়, তবু যারা যারা নির্বাচনে প্রার্থী হবে তাদেরকে তো আপনাকে ছেড়ে দিতেই হবে।'

ইন্দিরাজী বললেন, 'হ্যাঁ, তা তো দেবোই।'

বাবুজী বললেন, 'তার মধ্যে যে-সব কংগ্রেসী সদস্যকে জেলে পুরে রাখা হয়েছে তারাও তো থাকবে।'

'তা অবশ্য থাকবে, তবে তাদের বেশির ভাগকেই তো আমরা কংগ্রেস থেকে বের করে দিয়েছি।'

'বের করে দিলেও তারা যদি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এই সরকারের বিরুদ্ধে নো-কনফিডেন্স নোটিশ দিয়ে বসে, তখন?'

'তাতে কি হবে? তারা আর কজন!'

'সংখ্যা দিয়ে ব্যাপারটাকে বিচার করবেন না, বিচার করুন গুরুত্বের হিসেবে।' বাবুজী বললেন, 'একটি কংগ্রেসী সদস্যও যদি এই সরকারের বিরুদ্ধে নির্বাচনের আগে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দেয় তাহলে নির্বাচনের ওপর তার কী প্রভাব পড়বে একবার ভেবে দেখেছেন কি?'

ইন্দিরাজী কথাটা আগে মোটেই ভাবেননি, কিন্তু এবার ভাবতে শুরু করলেন। তাঁর মনে হলো, সত্যিই তো, এরকম একটা ঘটনা তো ঘটতেও পারে। তার থেকেও যে কথাটা ভেবে তিনি বেশি বিচলিত হলেন, তা হলো, সেক্ষেত্রে বাবুজীর সমর্থকরাও তো তাদের সঙ্গে জুটে গিয়ে হৈচৈ শুরু করে দিতে পারে। সুতরাং তিনি ঠিক করলেন, কোনোরকম 'রিস্ক' নিয়ে দরকার নেই; বরং লোকসভাকে ভেঙ্গে দেওয়া যাক। সেই অনুযায়ী ১৮ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ঘোষণা প্রচারিত হলো: লোকসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আগামী মার্চে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ইন্দিরাজী যেমন কোনো 'রিস্ক' নিতে চাননি, তেমনি বাবুজীও চাননি কোনো 'রিস্ক' নিতে। কারণ, তিনি জানতেন, যদি লোকসভাকে জীবিত রাখা হয় তবে শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচনে হেরে যাবার কোনো সম্ভাবনা দেখা দিলে যে কোনো ছল ছুতোয় নির্বাচন বাতিল করে,

এই লোকসভাকেই আবার এক দু বছর চালিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু যদি লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় তখন আর তার পক্ষে নির্বাচন বন্ধ করা কোনো মতেই সম্ভব হবে না। কারণ, বাজেট পাশ করার জন্য মার্চের আগে নতুন লোকসভা গঠন করতেই হবে।

বাবুজীর প্রথম প্যাঁচে ইন্দিরাজী কাৎ হলেন। এবার এলো ইন্দিরাজীর তরফে প্যাঁচ দিয়ে বাবুজীকে কাৎ করার পালা।

বাজারে হাওয়া তুলে দেওয়া হলো, এবার অন্তত দুশোটি সিট যুব কংগ্রেসকে ছাড়তেই হবে, কেননা তারা কংগ্রেসের 'পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছে।'

যারা পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছে তাদেরকে সিট ছাড়া মানে যাদের পালের হাওয়া কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদেরকে বিদেয় করে দেওয়া। অর্থাৎ সোজা কথায় যাকে বলে 'বুড়ো হটাও' অভিযান, তাই।

বাবুজী বুঝলেন এ ষড়যন্ত্র তাঁর বিরুদ্ধে ; কিন্তু মুখে তিনি কিছু বললেন না।

এবার শুরু হলো নতুন খেলা। প্রতিটি প্রদেশেই দেখা গেলো এক একটি আসনের জন্য দশ পনেরোজন করে প্রার্থী টিকিট চাইছেন ; তা নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে তুলকালাম ঝগড়া চলেছে, এবং শেষ পর্যন্ত সেখানে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হলো না এই যুক্তি দেখিয়ে সম্পূর্ণ প্রার্থী তালিকাটাই পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তাঁকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে, 'আপনি এই সম্পূর্ণ তালিকা থেকে প্রতিটি আসনের জন্য একজন করে প্রার্থী বাছাই করে দিন। আপনি যাকে বাছাই করবেন অন্য সবাই তাকেই মেনে নেবে।'

প্রথম প্রথম দুটো একটা প্রদেশ থেকে এ ধরনের অনুরোধ জানিয়ে যখন ইন্দিরাজীর সামনে প্রার্থী তালিকা রাখা হলো তখন কেউ সেটাকে তেমন সিরিয়াসভাবে নেয়নি। কিন্তু যখন একটার

পর একটা প্রদেশে ঠিক একই ঘটনা ঘটতে লাগলো তখন অনেকের মনেই সন্দেহ জাগলো, ইন্দিরাজীর এটা প্রি-প্ল্যানড নয় তো ?

সন্দেহটা আরো ঘনিভূত হলো যখন চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়া শুরু হলো, তখন। দেখা গেলো বাবুজীর সমর্থক কেউই প্রায় টিকিট পাচ্ছেন না।

এটা যে হতে পারে তা বাবুজী অনেক আগেই অনুমান করেছিলেন। কিন্তু তিনি চিরকালই 'ওয়েট অ্যাণ্ড সি' নীতিতে বিশ্বাসী। তাই শেষ পর্যন্ত কি ঘটে সেটা দেখার জন্য এতোদিন চুপচাপ বসেছিলেন।

অবশ্য পুরোপুরি চুপচাপ বসেছিলেন বলাটা ঠিক হবে না। কারণ, মাঝে মাঝে তিনি এর ওর সাথে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে কাউকেই সম্পূর্ণ কথা দেননি ; কেননা, তখনো তিনি 'ধীরে চলো' নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছিলো যারা তাঁর কাছে যাতায়াত করছিলেন তাদেরকে নিয়ে। তারা কিছুতেই আর অপেক্ষা করতে চাইছিলেন না ; বারবার তাঁকে অনুরোধ করছিলেন দল ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য। এঁদের মধ্যে ছিলেন বহুগুণা, নন্দিনী শতপথী, কে. আর. গণেশ, রামধন ইত্যাদিরা।

এঁরা ছাড়াও আরো কয়েকজন বাবুজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্ত, মোহন ধারিয়া এবং বিজু পট্টনায়ক।

ইন্দিরাজীকে যখন বাবুজী লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচন করার কথা বলেছিলেন তখন তাঁর মনে মনে পরিকল্পনা ছিলো, যদি জনতা পার্টি শ দেড়েক আসনও পায় তাহলে নির্বাচনের পরে তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে 'জনতা'র সঙ্গে সমঝোতা করবেন। এ পরিকল্পনার কথা দু একজনের কাছে তিনি বলেওছিলেন ; এবং সেটা জনতা পার্টির নেতাদের কানেও পৌঁছেছিলো। কিন্তু জনতা পার্টির নেতারা বাবুজীর এ পরিকল্পনাকে সমর্থন করলেন না। তাঁদের হয়ে

চন্দ্রশেখর এবং রামধন বাবুজীর সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'এ ধরনের কোনো কাজ করতে গেলে তার পরিণতি খুবই খারাপ হবে। কারণ, তখন ইন্দিরাজী হয়তো এই যুক্তিতে লোকসভা ভেঙ্গেও দিতে পারেন যে, যারা কংগ্রেসের টিকিটে জনসাধারণের ভোটে জিতে এসেছেন তারা দল বদল করে জনমতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সুতরাং যে লোকসভায় জনমতের যথাযথ প্রতিফলন হচ্ছে না, সে লোকসভাকে টিঁকিযে রাখার কোনো মানে হয় না। অতএব বিশ্বাসঘাতকে পূর্ণ লোকসভাকে ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।'

অবশেষে ঠিক হলো বাবুজী বেরিয়ে আসবেন। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিলো ঃ কখন ?

ইতিমধ্যে সি. পি. আইও এগিয়ে এসে কথা দিলো তারা বাবুজীকে সমর্থন করবে ; তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন নন্দিনী শতপথী এবং কে. আর. গনেশ।

জানি, অনেক পাঠকই এ কথা ভেবে বিস্মিত হচ্ছেন যে, সি. পি. আই কেন এগিয়ে এলো বাবুজীকে সমর্থন করতে। কারণ, তারাই তো গত দশ বছর ধরে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীলদের খুঁজে বের করে তাঁদের থেকে প্রতিক্রিয়াশীলদের আলাদা করার কাজ চালিয়ে চলেছিলো। তারা তো বারবার প্রকাশ্যেই ঘোষণা করছিলো যে, কংগ্রেসের মধ্যে যারা প্রগতিশীল আমরা কেবলমাত্র তাদেরকেই সমর্থন করবো, অন্যদের নয়। আর সেই হিসেবে ইদানীংকার কংগ্রেসের মধ্যে বাবুজী এবং তাঁর অনুগামীদেরকেই তারা সব থেকে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে চিহ্নিত করেছিলো।

হঠাৎ তাদের এই মত পাল্টে যাবার কারণ কি? অনেক সাংবাদিক বন্ধুই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাদের প্রতিবেদনে বলেছেন, যুব কংগ্রেসের হাতে সি. পি. আই যেভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছিলো সে কথা তারা কিছুতেই ভুলতে পারছিলো না। তাছাড়া শেষের দিকে শ্রীমতী গান্ধীও তাদের ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন, এবং কংগ্রেসের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু বলে পরিচিত, যেমন নন্দিনী শতপথী, কে আর গনেশ,

হেমবতী নন্দন বহুগুণা, রজনী প্যাটেল, চন্দ্রজিৎ যাদব, এমনকি সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এবং দেবকান্ত বরুয়াকেও তিনি বিভিন্নভাবে বেইজ্জত করছিলেন। এঁদের কাউকে কাউকে বের করে দেওয়া হয়েছিলো কংগ্রেস থেকে, আর বাকিদেরকেও এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিলো প্রায় দরজার কাছে। ফলে, সি. পি. আইর যতোটুকু সহানুভূতি ছিলো কংগ্রেসের প্রতি সেটাও শেষ হয়ে গিয়েছিলো।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যদি তাই হয়, তাহলে বাবুজী দল থেকে বেরিয়ে আসার পরও কেন সি. পি. আই কংগ্রেসের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালায় জোট বাঁধতে গেলো?

আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে অন্য। সি. পি. আই বাইরে যতোই হম্বিতম্বি করুক না কেন তার টিকিটি বাঁধা রয়েছে সেই 'মহান মহান মহান' প্রভুদের কাছে। সুতরাং মহান মহান মহান প্রভুরা যেভাবে তাকে চলতে নির্দেশ দেবে সে সেভাবেই চলতে বাধ্য।

এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মহান প্রভুরা ইন্দিরাজীকে সব ব্যাপারে মদদ জুগিয়ে গেলেও ভারতীয় রাজনীতির পট পরিবর্তনের ব্যাপারে কোনোরকম ঝুঁকি নেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। সে কারণে তারা আগে থেকেই দুটো বিকল্প পথের কথা চিন্তা করছিলেন। এ দুটো পথ হলো: এক, যদি নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হন, এবং কংগ্রেসই ক্ষমতায় থাকে তবে তারা কি করবেন। দুই, যদি কংগ্রেস লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, এবং অকংগ্রেসীরা মন্ত্রীসভা গঠন করেন তাহলেই বা তারা কি করবেন।

প্রথম অবস্থার জন্য তারা তেমন চিন্তিত ছিলেন না। কারণ, সে রকম অবস্থা যদি ঘটতো তাহলে যেভাবেই হোক বরুয়া, নন্দিনী, চন্দ্রজিৎ, বহুগুণা এবং রজনী প্যাটেলদের মারফত তারা বাবুজী কিংবা চৌহান—যেই প্রধানমন্ত্রী হোন না কেন তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টির একটা পথ খুঁজে পেতেন। অবশ্য সেক্ষেত্রেও তারা প্রথম থেকেই চেষ্টা চালাতেন যাতে ইন্দিরা গান্ধীর ছেড়ে যাওয়া আসনে বাবুজী গিয়ে বসতে না পারেন। সে অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য তাদের 'প্রথম পছন্দ' হতেন অতি

অবশ্যই শ্রী যশোবন্তরাও বলবন্তরাও চৌহান।

কিন্তু সমস্যা দেখা দেবে যদি কংগ্রেস নির্বাচনে জিততেই না পারে তাহলে। সেক্ষেত্রে তারা কি করবেন? কাকে সমর্থন জানাবেন?

কংগ্রেস হেরে যাওয়া মানে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসবেন মোরারজী দেশাই। 'মহান মহান মহান' বন্ধুর দল আর যাই আশা করুন এটা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেননি যে মোরারজী দেশাই আর কোনো কালে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে গিয়ে বসতে পারবেন। যদি তাদের মনে সে সম্ভাবনার কথাটা একবারও উদয় হতো তাহলে কি তারা গত দশ বছর ধরে মোরারজীকে প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কাজে নিজেদেরকে যেভাবে নিয়োজিত করেছিলো, তা করতো! অমনভাবে কি মোরারজী-বিরোধী মহলকে তারা খোলাখুলি মদত দিতে যেতো!

এ ব্যাপারটা নিয়ে সত্যিই খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো আমাদের বন্ধুর দল। যে-কোনো একটা পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য তারা ছটফট করছিলো। তাই যখন খবর পেলো বাবুজী কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে রাজী হয়েছেন, তখনি দিল্লীর সি. পি. আই সদর দপ্তরে নির্দেশ এলো: বাবুজীকে মদদ দাও।

'বাবুজীকে মদদ দাও' কথাটার মানে এই নয় যে 'ইন্দিরাজীকে ছেড়ে যাও।' কারণ তা যদি হতো তাহলে আর লোকে সি. পি. আইকে আদর করে 'কৌশল পার্টি' বলে ডাকতো না।

'কৌশল পার্টি' তাদের হেড কোয়ার্টার থেকে খবর পেয়েই ময়দানে নেমে পড়লো। এদেশে হঠাৎ কংগ্রেসী সরকার উলটে গেলে আমাদের মহান মহান মহান বন্ধুদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেজন্য মোটামুটি একটা রাস্তা আগে থাকতে করে রাখতে হবে তো! তাই বাবুজী যখন কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তখন সি. পি. আই একেবারে সবার আগে দৌড়ে গেলো তাঁর গলায় মালা পরাতে।

পাঠক হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে বাবুজীও কি আমাদের মহান বন্ধুদের স্বার্থেই কাজ করতেন?

পাঠক, অনুগ্রহ করে বাবুজীর মতো একজন রাজনীতিজ্ঞের সম্পর্কে এ ধরনের চিন্তা করবেন না। এতোক্ষণ যা বললাম, সেটা বাবুজীর কথা নয়, বাবুজীর সম্পর্কে কৌশল পার্টি এবং তাদের প্রভুরা যা-চিন্তা করছিলো এ হচ্ছে সেই কাহিনী।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে আমাদের মহান মহান মহান বন্ধুর দল এ ধরনের চিন্তা করতে গেলেন কেন? আগেই বলেছি, ইন্দিরাজী নির্বাচনে পরাজিত হলে কংগ্রেসের মধ্যে যে নেতৃত্বের লড়াই লাগতো তাতে আমাদের বন্ধুবা অবধারিতভাবেই বাবুজীর বিরুদ্ধে চৌহানকে সমর্থন করতেন। কারণ, সেখানে তাঁদের কৌশল হতো, 'বেশি প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে কম প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থন করো।'

ঠিক সেই একই ফর্মুলায়, বাবুজী যখন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তারা বাবুজীকে সমর্থনের জন্য ছুটে গেলো। কারণ, সেই এক-ই: 'বেশি প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে কম প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থন করো।' এখানে 'বেশি' হচ্ছেন মোরারজী এবং 'কম' হচ্ছেন বাবুজী।

বাবুজীকে সমর্থন করে বিবৃতি দিলেও সি. পি. আই কিন্তু কখনোই বললো না যে 'আমরা ইন্দিরাজীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' বরং ৩ ফেব্রুয়ারি সি. পি. আই-এর সর্বোচ্চ সাংগঠনিক সংস্থা সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট 'আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ এমন এক লোকসভাকে স্বাগত জানাতে চান যেখানে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি নিশ্চিতভাবে স্থায়িত্ব লাভ করবে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ও প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাস্ত করার লক্ষ্য নিয়ে যেসব প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও বাম শক্তি চেষ্টা চালাচ্ছিলো জগজীবন রাম ও ২ ফেব্রুয়ারির যুক্ত বিবৃতিতে সহ-সাক্ষরকারী অন্যান্য নেতারা তাদেরকে শক্তিশালী করবেন বলে বিবৃতি দেওয়ার পরদিনই রাজেশ্বর রাও শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার ব্যাপারে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে বৈঠকে বসলেন। এই বিচিত্র ব্যাপার দেখে জনসাধারণ অবাক হলো বটে, কিন্তু যারা কৌশল পার্টির কৌশলসূত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তারা মোটেই আশ্চর্য হলো না।

আসলে সি. পি. আই বাইরে যতোই 'বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে ঐক্য চাই' বলে বিবৃতি দিক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাকে সে-পথেই চলতে হবে যে-পথ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে মস্কো থেকে। তাই আমরা দেখতে পাই কেন্দ্রে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠনের দিন থেকে যে দল লাগাতার শ্লোগান দিয়ে আসছিলো 'যেভাবেই হোক কংগ্রেসকে পরাস্ত করো' সেই দলই ১৯১৩ সালের জুন মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কম্যুনিস্ট সম্মেলন শেষ হওয়ার পরের দিন থেকেই আওয়াজ তুললো 'যেভাবেই হোক প্রগতিশীল কংগ্রেসীদের মদদ দাও।'

১৯১৩—দীর্ঘ আট বছর ধরে হাজার বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও সি. পি. আই কিন্তু তার প্রগতিশীল কংগ্রেসীদের মদদ দেবার নীতি থেকে এক চুলও বিচ্যুত হলো না। এমনকি দেশে গুরুতর জরুরী অবস্থা চালু হওয়ার পর 'সংবিধান বহির্ভূত রীতিনীতি'কে উৎসাহ দেওয়া শুরু হয়েছে বলে যখন তারা অভিযোগ জানাতে লাগলো তখনো তাদের দিক থেকে 'মদদ' দেওয়ার ব্যাপারটা চালুই রইলো। শেষে ইন্দিরাজীও যখন তাদেরকে 'বিয়াল্লিশের বেইমান' বলে একহাত নিলেন তখনো তারা সেটাকে চুপচাপ হজম করে গেলো।

শুধু তাই নয়, এতোকাল প্রগতিশীলদের 'মদদ' দেওয়ার যে নীতি চালু ছিলো ইন্দিরাজী তাদেরকে 'বেইমান' বলার পর ১৯৭৭ সালের জানুয়ারিতে বাঙ্গালোরে বৈঠক ডেকে তারা সে নীতি সংশোধন করে নতুন নীতি ঘোষণা করলো: 'সব গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দলের মধ্যে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।' অর্থাৎ এখন থেকে আর শুধু প্রগতিশীল কংগ্রেসীদেরকেই নয়, সব ধরনের কংগ্রেসীকেই 'মদদ' দেওয়া হবে। এবং সম্ভবতঃ সেই নীতি অনুযায়ীই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা কংগ্রেসীদেরকেও 'মদদ' দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হলো বাবুজী কংগ্রেস দল ত্যাগ করার সাথে সাথেই।

কংগ্রেস ছেড়ে আসার জন্য বাবুজীকে 'স্বাগত' জানানো সত্ত্বেও কিন্তু নির্বাচনে মদদ দেবার প্রস্তাব নিয়ে রাজেশ্বর রাও আলোচনায় বসলেন ইন্দিরাজীর সঙ্গে। কারণ ওপরওলার নির্দেশে বাবুজীকে 'স্বাগত'

জানালেও সি. পি. আই এবং তার প্রভুরা কখনো ভাবতেই পারেনি যে ইন্দিরাজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস নির্বাচনে হেরে যেতে পারে। যদি সেটা তারা আগে থাকতে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতো তাহলে বহুগুণা এবং নন্দিনী শতপথীর সঙ্গে গোপনে গোপনে উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যায় আসন ভাগাভাগির আলোচনা না চালিয়ে সর্বভারতীয় পর্যায়ে প্রকাশ্যেই চালাতে।

সি. পি. আই ও তার প্রভুরা স্থির নিশ্চিত হয়ে বসেছিলো যে জনতা পার্টি যদি খুব বেশি সিটও পায় তো একশোটার বেশি পাবে না; এবং সি. এফ. ডি যদি তাদের সঙ্গে জোটও বাঁধে তাহলে তারা বড়ো জোর আরো পঞ্চাশটা সিট পাবে—অর্থাৎ জনতা ও সি. এফ. ডির ভাগ্যে যতো আসনই মিলুক না কেন কখনোই তা দেড়শোর সীমারেখা অতিক্রম করতে পারবে না।

এই হিসেবের সঙ্গে সি. পি. আই নিজেদের হিসেবটাও জুড়ে নিয়েছিলো। প্রতিটি ব্যাপারেই তারা যেমন 'আশা' করতে অভ্যস্ত এ ব্যাপারেও তেমনি 'আশা' করেছিলো যে কম করেও পঞ্চাশটি আসন তারা পাবেই। এছাড়া ডি. এম. কে, আন্না ডি. এম. কে, সি. পি. এম, মুসলিম লীগ ইত্যাদি মিলে পাবে আরো পঞ্চাশটি। অতএব কংগ্রেস যদি খুব বেশি সিটও পায় তো তিনশোর ওপরে কিছুতেই পাবে না, বরং দুশো আশি নব্বইর মধ্যে থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

এই দুশো আশি নব্বইর হিসেব মাথায় রেখেই তারা নির্বাচনী পরিকল্পনা ঠিক করছিলো। তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলো যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তাদের ঠাঁই হবে না ঠিকই তবে এবার নির্বাচনের পর কংগ্রেসকে 'বাইরে থেকে চাপ দেওয়ার ক্ষমতা' তাদের অনেক বাড়বে। আর সে কারণেই, ভয় দেখাবার হাতিয়ার হিসেবে সি. এফ. ডি-কে তারা সঙ্গে পেতে চেয়েছিলো।

সি. এফ. ডি-কে যে ভয় দেখাবার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে সেটা সি. এফ. ডি গঠিত হওয়ার দিনই তারা বুঝে ফেলেছিলো যখন দেখলো যে ইন্দিরা গান্ধীসহ একজনের পর একজন কংগ্রেসী নেতা

তাদেরকে 'পেছন থেকে ছুরি মারা হয়েছে' বলে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন। এ থেকে অন্তত এটুকু স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে বাবু জগজীবন রাম কংগ্রেস ছেড়ে চলে আসায় ইন্দিরা গান্ধীসহ প্রতিটি কংগ্রেস নেতাই বেশ ভীত হয়ে পড়েছেন। সুতরাং সি. পি. আই তার চিরাচরিত কৌশল হিসেবে সেই ভীতিকেই 'ক্যাশ' করার চেষ্টায় নামলো।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও আর ভীতির ভাবটাকে চেপে রাখা হলো না। যে ইন্দিরাজী সি. পি. আইকে বেইমানের দল হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, যে ইন্দিরাজী কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে ১৯৫৯ সালে কেরলের কম্যুনিস্ট সরকারকে বরখাস্ত করায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই ইন্দিরাজীই এবার রাজেশ্বর রাওয়ের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন, এমনকি একটু ঘুরিয়ে স্বীকারও করলেন যে উনষাট সালে কেরল মন্ত্রীসভাকে ওভাবে ভেঙ্গে দেওয়াটা ঠিক হয়নি।

শুধু ইন্দিরাজী—রাজেশ্বর রাও-ই নন, বৈঠকে বসলেন ভুপেশ গুপ্ত, এন. কে. কৃষ্ণন প্রভৃতিরাও। ভুপেশ গুপ্ত ও রাজেশ্বর রাও গিয়ে দেখা করলেন দেবকান্ত বরুয়া ও ওম মেহতার সঙ্গে। অনেক আলোচনা হলো দু-পক্ষে। কংগ্রেস সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সি. পি. আইর সঙ্গে জোট না বেঁধে প্রস্তাব দিলো কেরল, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে জোট বাঁধার। সি. পি. আই এ প্রস্তাবে রাজি হলো না; কারণ তাহলে জনসাধারণের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হবে যে বামপন্থীদের, বিশেষ করে সি. পি. এমকে দমিয়ে রাখার জন্যই তারা এ ধরনের জোট বেঁধেছে। তাই তারা জেদ ধরে রইলো সমঝোতা হলে সর্বভারতীয় স্তরেই হতে হবে। এবং সেই জেদকে গতিশীল করে তোলার জন্য ফাঁকে ফাঁকে তারা সি. এফ. ডির সম্পাদক বহুগুণার সঙ্গে 'কথাবার্তা' চালিয়েও যেতে লাগলো।

এই সময়ে সব থেকে লক্ষণীয় বিষয় ছিলো যা তা হলো, সি. পি. আই মাঝে মাঝেই সি. এফ. ডিকে সমর্থন করে বিবৃতি দিচ্ছিলো, কিন্তু কোনো কংগ্রেস নেতাই তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলছিলো না। বরং যতোই দিন যাচ্ছিলো ততোই তারা সি. পি. আইকে নতুন নতুন আসন ছেড়ে দিতে লাগলো।

এর পেছনে মূল কারণ ছিলো, কংগ্রেসের বামপন্থী ভাবমূর্তি গড়ে তোলা। অন্তত কম্যুনিস্ট নামধারী একটি দল যে তাদের সঙ্গে রয়েছে এটাও তাদের দিক থেকে প্রচারের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

এই সব আলাপ আলোচনা, কৌশল প্রয়োগ এবং কাটান যখন চলছিলো তখন মস্কো কিন্তু একেবারে চুপচাপ। সি. পি. আই বাবুজী এবং তাঁর দলকে সমর্থন করে পর পর কয়েকটা বিবৃতি দেওয়া সত্ত্বেও রাশিয়ার সরকারী পত্রিকা 'প্রাভদা'য় তার কোনো উল্লেখই করা হলো না। অথচ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সি. পি. আইর প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিই প্রাভদায় মুদ্রিত হয়ে থাকে।

এই মৌনতার একটিই মাত্র কারণ ছিলো : ইন্দিরা গান্ধীকে সোজাসুজি না চটানো। কারণ, তখনো মস্কো আশা করছিলো, নির্বাচনে কংগ্রেসই জিতবে। তবে তা সত্ত্বেও 'জরুরী রক্ষা কবচ' হিসেবে তারা বেসরকারী স্তরে সি. পি. আই মারফত বাবুজীকেও সমর্থন জানিয়ে চলছিলো এই পরিকল্পনা সামনে রেখে যে যদি কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজিত হয় তাহলে তখন 'বেশি প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে কম প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থন করো' নীতির এমন একটি আধার অন্তত খুঁজে পাওয়া যাবে, যাকে সামনে রেখে 'বেশি প্রতিক্রিয়াশীল' মোরারজীর বিরুদ্ধে দালালদের মারফত অবিরাম প্রচারের তুফান ওঠানো সম্ভব হবে।

এই 'কম' 'বেশি'র লড়াই ২১ মার্চ সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেলো। নির্বাচনে তখনো জনতা দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেনি, তবে ফলাফল ঘোষণার গতি দেখে প্রায় প্রত্যেকেই বুঝে গিয়েছিলো যে জনতাই সরকার গঠন করবে। অবশ্য তখনো কেউই এ ব্যাপারে নিশ্চিত ভাবে একথা বলতে পারছিলো না যে জনতা দল একাই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে, নাকি সি. এফ. ডির প্রাপ্ত আসন সংখ্যাকেও তার সাথে যোগ করতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হলো লবিং। প্রথমে কাগজে কাগজে 'বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ' পরিবেশন করা হতে লাগলো। বলা হলো : মোরারজী দেশাইকে মদদ দিচ্ছে একমাত্র সংগঠন কংগ্রেস। বাকি

প্রত্যেকেই রয়েছে বাবু জগজীবন রামের পেছনে। এমন কি কোনো কোনো সংবাদপত্রে এ ধরনের রিপোর্টও বেরোলো যে চৌধুরী চরণ সিং-ও আভাস দিয়েছেন, বাবু জগজীবন রামকেই তিনি সমর্থন করবেন। এ ছাড়া আকালীদের সম্পর্কেও সেই একই কথা—তারাও মোরারজীর বিরুদ্ধে বাবুজীকেই সমর্থন জানাবে।

বাইশ তারিখ 'বিশ্বস্তসুত্রে প্রাপ্ত' সংবাদের সঙ্গে আরো কিছু 'সংবাদ' যোগ হলো। বলা হলো: জনতা পার্টির একমাত্র সংগঠন কংগ্রেস ছাড়া অন্য সবকটি শরিক দলই চাইছেন যে বাবুজীই প্রধানমন্ত্রী হোন। তবে তার আগে তারা এটাও দাবি করছেন যে সি. এফ. ডি জনতার সঙ্গে মিশে যাক।

প্রচারের রাজনীতি চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠলো তেইশ তারিখ। বোম্বের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা অগ্রিম সংবাদ ছাপালো: শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ চান যে বাবুজীই দেশের প্রধানমন্ত্রী হোন। তাঁর এটা চাইবার প্রধান কারণ হচ্ছে, বাবুজী প্রধানমন্ত্রী হলে এদেশে এই প্রথম একজন হরিজন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার গৌরব লাভ করবে।

মহান মহান মহান দেশের বন্ধুবান্ধবদের পরিচালিত হু-রঙা পত্রিকাগুলো 'হ্যাঁ' কে 'না' এবং 'না' কে 'হ্যাঁ' বলে প্রচার করতে চিরকালই অভ্যস্ত। তাছাড়া চক্ষু লজ্জার ব্যাপারটাও তাদের কোনো কালেই নেই। দু সপ্তাহ আগে ইন্দিরা-সঞ্জয়ের প্রশস্তিতে যারা পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলছিলো তারাই ছুটো সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই 'ফ্রিডম রিগেইন—নাউ ফর ভিজিলেন্স' হেডিং দিয়ে জনতা-প্রশস্তি শুরু করে দিলো।

এইসব পত্রিকা কোথা থেকে মদদ পায়, কাদের অঙ্গুলি হেলনে চলে জনসাধারণ সে সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নয়। ফলে বিভিন্ন রকম বিভ্রান্তিকর খবর ছেপে এদের পক্ষে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা খুবই সহজ। কিন্তু যারা রাজনীতি করেন, যারা এম. পি. হয়ে লোক-সভায় এসেছেন তারাও যে এ ব্যাপারটা জানেন না, তা নয়। সুতরাং প্রশ্ন জাগবেই, প্রধানমন্ত্রী তো নির্বাচন করবে সংসদ সদস্যরা—যারা বিচার

বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম, সুতরাং সেক্ষেত্রে বাজারী পত্রিকায় এ ধরনের বিভ্রান্তিকর সংবাদ ছেপে লাভটা কি ?

লাভ একটা আছে—অন্তত মহান বন্ধুদের দালালরা সেটাই ভেবেছিলো। তাদের পরিকল্পনা ছিলো জনমত গড়ে তোলা। এবং সেই জনমতের চাপে 'বেশি প্রতিক্রিয়াশীলের' পরিবর্তে 'কম প্রতিক্রিয়াশীলকে' গদিতে বসানো।

এ ছাড়া আরো একটা সুবিধে ছিলো তাদের পক্ষে। লালবাহাদুর শাস্ত্রী মারা যাওয়ার পর মোরারজীর বন্ধুরা যে কারণে মোরারজীকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে না দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন, ঠিক সেই একই কারণে মোরারজীকে এবারও প্রধানমন্ত্রী হতে না দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন জনতা পার্টির-ই কয়েকজন সর্বভারতীয় নেতা। কারণ, তারা মনে করছিলেন মোরারজীকে যদি প্রধানমন্ত্রী করা হয় তাহলে তিনি আর কারো কথা শুনবেনই না—নিজে যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন।

ঠিক এই একই ভয়ে ছেষট্টিতে মোরারজী ভাইয়ের বন্ধুরা মোরারজীকে প্রধানমন্ত্রী না করে প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে। কারণ তাদের আশা ছিলো তারা শ্রীমতী গান্ধীকে নিজেদের ইচ্ছে মতো চালনা করতে পারবেন ; এবং যেহেতু পার্টির সংগঠনে ইন্দিরাজীর খুব বেশি একটা প্রভাব নেই সেহেতু যতোদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকবেন ততোদিন প্রভাবশালী পার্টি-বসদের কথা শুনেই চলবেন।

মোরারজী ভাইয়ের বন্ধুদের আশা কতোটা সফল হয়েছিলো তা দেশবাসী ইতিমধ্যে জেনে গেছেন, সে ব্যাপারে আর কথা তুলে কাউকে লজ্জা দেওয়াটা উচিত বলে মনে করি না। কিন্তু বড়ো আশ্চর্য লাগে যখন দেখি আজও অনেকে সেই হুজুর ভয় দেখিয়েই মোরারজী ভাইয়ের বিরোধীতা করার জন্য লোক জড়ো করার চেষ্টা করেন।

বাবুজীকে প্রধানমন্ত্রী করা হোক বলে যারা দাবি জানাচ্ছিলেন

তারা কেউই মোরারজীকে কেন প্রধানমন্ত্রী করা হবে না সে ব্যাপারে কোনো যুক্তি দেখাতে পারছিলেন না। তবে বাবুজীকে কেন করা দরকার সে ব্যাপারে তারা কয়েকটি যুক্তি দিচ্ছিলেন। তাদের যুক্তিগুলো ছিলো মোটামুটি এই ঃ

এক, বাবুজী কংগ্রেস ছেড়ে আসার জন্যই কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে।

দুই, বাবুজীর জন্যই জনতা পার্টি লক্ষ লক্ষ হরিজন ও মুসলমানের ভোট পেয়েছে।

তিন, বাবুজী চরিত্রগতভাবে প্রত্যেকের সঙ্গেই মানিয়ে চলতে পারেন।

চার, বাবুজীকে প্রধানমন্ত্রী করলে দেশ প্রথম হরিজন প্রধানমন্ত্রী লাভের গৌরব অর্জন করবে; এবং দেশের হরিজন সমাজ নিজেদের নিরাপত্তা অনুভব করবে।

বাবুজীর সমর্থকদের এই যুক্তিগুলোর বিরুদ্ধে মোরারজীর সমর্থকেরা যা বলছিলেন তা হলো ঃ

এক, বাবুজী কংগ্রেস ছেড়ে আসাতে অনেক ভোট পাওয়া গেছে ঠিকই। তবে সে ভোট না পাওয়া গেলে জনতা পার্টির একেবারে ভরাডুবি হতো এ যুক্তি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, প্রায়-নির্বাচন কেন্দ্রেই যতোটা হরিজন ভোট আছে তার থেকে অনেক বেশি ভোটের ব্যবধানে জনতা পার্টির প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন।

দুই, হরিজন ও মুসলমানদের ভোট পাইয়ে দেবার জন্য জনতা পার্টি বাবুজীর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এটাও ঠিক যে বাবুজী কংগ্রেস ছেড়ে আসার অনেক আগে থাকতেই বহু মুসলমান এবং হরিজন কংগ্রেসের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলো।

তিন, বাবুজী চরিত্রগতভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে মানিয়ে চলেন, এটা তাঁর একটা গুণ। তবে মোরারজীও আজকাল এ গুণটা বেশ ভালো-ভাবেই রপ্ত করেছেন। নাহলে চারটে দল এতো অল্পদিনের মধ্যে মিলে গেলো কি করে?

চার, বাবুজীকে প্রধানমন্ত্রী করলে অনেকেই গর্ব এবং আনন্দ অনুভব করবেন ঠিকই ; তবে তার থেকেও বেশি লোক আনন্দিত হবেন যদি মোরারজীর মতো একজন শক্ত মনের মানুষকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। কারণ, নীতির প্রশ্নে মোরারজী ভাই চিরকালই অনড়। তাঁর সাথে যার নীতিতে মেলেনি, তিনি তার সঙ্গে এক মুহূর্তও থাকেননি। এমন কি গদি বজায় রাখার জন্যও নয়।

পাঁচ, মোরারজীকে প্রধানমন্ত্রী করলে এমন একজন লোককে যথাযথ সম্মান জানানো হবে যিনি নীতির প্রশ্নে কোনো আপোস-রফা না করার জন্য ৮০ বছর বয়সেও জেলে যেতে পিছ পা হননি।

ছয়, মোরারজী প্রধানমন্ত্রী হলে এমন একজনের ওপর এ দেশের শাসনভার অর্পিত হবে যিনি সুযোগের জন্য অপেক্ষা না করে কর্তব্যের জন্য দরকার পড়লে গদি ছেড়ে দিতে দ্বিধা করবেন না।

যতোক্ষণ জয়প্রকাশজী দিল্লীতে এসে পৌঁছোননি ততোক্ষণ যুক্তি প্রতিযুক্তির পালা বেশ জোর কদমেই চলছিলো। কিন্তু ২৩ মার্চ বিকেলে জয়প্রকাশকে নিয়ে পাটনা থেকে বিমান এসে যখন পালাম এয়ারপোর্টে নামলো তখন থেকে আলোচনার ধারাটাই গেলো পালটে।

পালাম এয়ারপোর্টে অনুরাগীদের সম্বর্ধনা গ্রহণের পর জয়প্রকাশজী সোজা চলে এলেন ২২৩ নম্বর দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে—গান্ধী পীস ফাউণ্ডেশনের সদর দপ্তরে।

সেখানে এসে পৌঁছোবার আগেই বহু গণ্যমান্য নেতা এসে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর জন্য। বহুগুণা, সঞ্জীব রেড্ডি—এঁরা পালাম এয়ার-পোর্টেই গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এবং পথে কিছুটা আলোচনা সেরে নিতে।

গান্ধী পীস ফাউণ্ডেশনে পৌঁছোবার পর খবর পেয়ে এসে হাজির হলেন মোরারজী দেশাই। নিভৃত কক্ষে তাঁর সাথে আলোচনা হলো জয়প্রকাশজীর। শুনলাম বাবুজীও এসেছিলেন দেখা করতে, তবে সে সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি।

২৩ তারিখ রাতেই জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৭ নম্বর যন্তর-মন্তর রোড থেকে জানানো হলো আগামী কালই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারটা সম্পন্ন হবে।

সকাল থেকেই গান্ধী পীস ফাউণ্ডেশনে লোকের ভীড় জমা শুরু হলো। প্রথমে এলেন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সংসদ সদস্য শ্রী জ্যোতির্ময় বসু। তখন ঘড়িতে সকাল সাড়ে সাতটা।

জ্যোতির্ময় বসুর সঙ্গে জয়প্রকাশজী মিনিট দশেক নিভৃতে কথা বললেন। তারপরই এলেন শ্রী জগজীবন রাম। ভক্তবৃন্দের জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে ধীর পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে গেলেন প্রধান হল ঘরের দিকে। বাইরে থেকে দ্বারী দরজা টেনে বন্ধ করে দিলো।

এরপর স্ত্রী শ্রীমতী কমলা বহুগুণাকে সাথে নিয়ে হাজির হলেন শ্রী হেমবতী নন্দন বহুগুণা। তার মুখে সেই চিরাচরিত হাসি। জনতার অভিনন্দনের উত্তরে তিনিও প্রত্যাভিনন্দন জানালেন।

বহুগুণাজী এসে পৌঁছোবার পর একে একে এলেন চন্দ্রশেখর, প্রকাশ সিং বাদল, এন. জি. গোরে, নানাজী দেশমুখ প্রভৃতি। হলের এক কোণায় দাঁড়িয়ে তিনজন নিজেদের মধ্যে খুব নিচু স্বরে কথা বলতে লাগলেন, শুধু নানাজী দেশমুখ বসে রইলেন সোফায়। অপেক্ষা—জয়প্রকাশজী কখন ডেকে পাঠাবেন।

নানাজী যখন জে. পির জন্য তাঁর ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছেন তখন হঠাৎ মোরারজী ভাইকে নিয়ে একটা কালো গাড়ি এসে থামলো গান্ধী পীস ফাউণ্ডেশনের সম্পাদক শ্রী রাধাকৃষণের বাংলোর সামনে। সেদিকের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন মোরারজী ভাই। ওদিকে বাবুজী তখন রাধাকৃষণজীর বাংলোতে বসে কথা বলে চলেছেন রাধাকৃষণজীর সঙ্গে।

পাশের ঘরে সে সময় জয়প্রকাশজীর সঙ্গে কথা বলছেন শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। হঠাৎ দরজা খুলে তিনি বের হয়ে এলেন। হলের এক ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্রী বিজয়কুমার মালহোত্রা এবং কনোয়ারলাল

গুপ্তা। তাঁদেরকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন ক্যান্টিনে যাওয়ার দরজাটার ঠিক পাশেই। তিনজনে মিলে নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলতে লাগলেন।

ঠিক এই সময় বাইরে তুমুল হৈ হৈ শুরু হয়ে গেলো। শ্লোগানে শ্লোগানে গান্ধী পীস ফাউণ্ডেশনের চত্বর মুখরিত হয়ে উঠলো। সবার মুখে এক ধ্বনিঃ রাজনারায়ণ জিন্দাবাদ; হিন্দুস্থান কে জিমি কার্টার জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।

মাথায় সেই সবুজ ফেট্টি, একগাল কাঁচপাকা দাড়ি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মুখে উচ্ছ্বল হাসি নিয়ে পরিচিত মানুষটি হাতের স্টিলের লাঠিতে ভর দিয়ে জনতাকে অভিবাদন জানাতে জানাতে এগিয়ে গেলেন জে. পির ঘরের পেছনের দরজার দিকে।

ইতিমধ্যে আর একজন 'জায়েণ্ট কিলার' এসে পৌঁছেছেন। তিনি শ্রী রবীন্দ্রপ্রতাপ সিং—যিনি আমেথিতে সঞ্জয়কে হারিয়ে রাতারাতি দুনিয়ার খবরের কাগজগুলোতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। রবীন্দ্রপ্রতাপকে দেখেই রাজনারায়ণজীর ফটো তুলবার জন্য যারা তাঁর পেছন পেছন চলছিলো তারা ক্যামেরার মুখ ঘুরিয়ে নিলো। রবীন্দ্রপ্রতাপকে অনুরোধ করলো একটু দাঁড়াতে, দু একজন অনুরোধ জানালো 'একটু হাস্থন', এবং তাদের অনুরোধে রবীন্দ্রপ্রতাপ হাসলেনও; কিন্তু মুশকিল হলো রবীন্দ্রপ্রতাপের বিরাট গোঁফজোড়ার গাম্ভীর্যকে অতিক্রম করে সেই হাসি শেষ পর্যন্ত আর ক্যামেরার লেন্সে প্রতিফলিত হলো না। ফলে গম্ভীর হাসিপূর্ণ মুখের ফটো নিয়েই দেশী বিদেশী ক্যামেরাম্যানদের সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

রবীন্দ্রপ্রতাপের পর এলেন শ্রীমতী চন্দ্রাবতী—যিনি ভিমানিতে শ্রী বংশীলালকে পরাজিত করে দুনিয়ার মানুষের কাছে 'খবর' হয়েছেন। তাঁকে দেখেও জনতা অভিনন্দন জানালো এবং ক্যামেরাম্যানরাও নিজেদের ইতিকর্তব্য সেরে নিলো।

চন্দ্রাবতী ভেতরে চলে যাওয়ার পরই উপস্থিত জনতার মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো কি

হলো ? কে হচ্ছে ?

জয়প্রকাশজী এবং আচার্য কৃপালনী দুজনেই এক ঘরের মধ্যে বসেছিলেন। রাজনারায়ণজী আসার পর তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে প্রধান হলে এলেন। তখন জানা গেলো কোনোরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি—মোরারজী ভাই এবং বাবুজী—এঁদের দুজনেই প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য দাবি জানিয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে রাজনারায়ণজী প্রস্তাব দিলেন সমগ্র ব্যাপারটা জয়প্রকাশজী এবং কৃপালনীজীর ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক ; তাঁরা যে সিদ্ধান্ত করবেন সেটাকেই সবাই মেনে নেবেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন শ্রী মধু লিমায়ে।

এ প্রস্তাবে প্রচণ্ড বিরক্ত হলেন বহুগুণাজী। তিনি আর নিজের মনের বিরক্তি চেপে রাখতে পারলেন না। প্রকাশ্যেই বন্ধু-বান্ধবদের বলতে লাগলেন, 'আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করা হচ্ছে। যে কথা দেওয়া হয়েছিলো তা রাখা হচ্ছে না।'

রামধনকে দেখলাম অতি দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর যাবার একটু পরেই বাবুজীও চলে গেলেন। দেখে মনে হলো এ সিদ্ধান্তে তিনি মোটেই খুশি নন। এবং সব থেকে মজার ব্যাপার, যে-রাজনারায়ণ এই প্রস্তাব দিলেন তাঁকেও তখন কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাতে লাগলো।

গুজব রটে গেলো সি. এফ. ডি মন্ত্রীসভায় যোগ দেবে না। কেউ কেউ দাবি জানালো ভোটাভুটি হোক।

আগেই জানা গিয়েছিলো মোরারজী ভাই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'যদি ভোটাভুটি হয় তাহলে আমি প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য প্রার্থী হবো না।'

মোরারজীর ঘোষণা শুনে চৌধুরী চরণ সিং বলেছেন, 'মোরারজী ভাই যদি প্রার্থী না হন তবে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো।'

চৌধুরী চরণ সিং শুধু ব্যাপারটা বললেনই না, কাগজেও লিখে দিলেন। তাঁর সেই লিখিত চিঠি নিয়ে এসে হাজির হলেন শ্রী রাজ-নারায়ণ। এর আগে আর একটা চিঠি নিয়ে এসেছিলেন চৌধুরীর পত্নী। সেটা তিনি সকালেই দিয়ে গিয়েছিলেন জয়প্রকাশজীর হাতে।

রাজনারায়ণ চরণ সিংয়ের দ্বিতীয় চিঠি নিয়ে আসার সাথে সাথেই এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে মোরারজী ভাই-ই প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। যারা তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিরোধিতা করছিলেন তাদের মুখ দেখেই সেটা বোঝা গেলো।

চিঠি পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই জয়প্রকাশজী এবং কৃপালনীজী রওয়ানা দিলেন সংসদ ভবনের পথে। নবনির্বাচিত সদস্যদের ইতিপূর্বেই সেখানে চলে যেতে বলা হয়েছিলো—কারণ, জানানো হয়েছিলো, ঠিক বেলা বারোটার সময় সংসদ ভবনে ঘোষণা করা হবে নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম।

ঠিক বারোটার সময় সংসদের সেণ্ট্রাল হলো দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে সকলের 'দাদাজী' হিসেবে পরিচিত আচার্য কৃপালনী ঘোষণা করলেন: 'ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত করা হলো শ্রী মোরারজী দেশাইকে।'

ঘোষণার সাথে সাথেই সেণ্ট্রাল হল করতালিতে ফেটে পড়লো। কিন্তু তারই মাঝে দেখা গেলো দু একটি মুখ একেবারেই বিষণ্ণ। সেই বিষণ্ণ মুখগুলিকে সাক্ষি রেখেই যবনিক পড়লো দিল্লীর 'হাই ড্রামা'র প্রথম দৃশ্যের ওপর।

ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল

দল		আসন
জনতা পার্টি	...	২৭১
কংগ্রেস	...	১৫৩
সি এফ ডি	...	২৮
সি পি আই এম	...	২২
এ ডি এম কে	...	১৯
আকালি দল	...	৮
সি পি আই	...	৭
পি ডব্লু পি	...	৫
আর এস পি	...	৪
ফরোয়ার্ড ব্লক	...	৩
মুসলিম লীগ	...	২

আর পি আই (খো)	...	২
ন্যাশন্যাল কনফারেন্স	...	২
কেরল কংগ্রেস	...	২
ডি এম কে	...	১
ইউ ডি এফ	...	১
এইচ এস পি ডি পি	...	১
এম জি পি	...	১
নির্দল	...	৮
নির্বাচন বাকি	...	২
মোট		৫৪২

বিভিন্ন প্রদেশে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা

অন্ধ্র : আসন ৪২ : জনতা ১, কংগ্রেস ৪১।
আসাম : আসন ১৪ : জনতা ৩, কংগ্রেস ১০, নির্দল ১।
বিহার : আসন ৫৪ : জনতা ৪৬, সি এফ ডি ৮।
গুজরাট : আসন ২৬ : জনতা ১৬, কংগ্রেস ১০।
হরিয়ানা : আসন ১০ : জনতা ১০।
হিমাচল : আসন ৪ : জনতা ৩।
জম্মু ও কাশ্মীর : আসন ৬ : কংগ্রেস ২, জাতীয় সম্মেলন ২, নির্দল ১।
কর্ণাটক : আসন ২৮ : জনতা ২, কংগ্রেস ২৬।
কেরল : আসন ২০ : কংগ্রেস ১১, সি পি আই ৪, অন্যান্য ৫।
মধ্যপ্রদেশ : আসন ৪০ : জনতা ৩৭, কংগ্রেস ১, অন্যান্য ১, নির্দল ১।
পশ্চিমবঙ্গ : আসন ৪২ : জনতা ১১, সি এফ ডি ৩, সি পি আই (এম) ১৭, কংগ্রেস ৩, অন্যান্য ৬, নির্দল ২।
আন্দামান : আসন ১ : কংগ্রেস ১।
চণ্ডীগড় : আসন ১ : জনতা ১।
দাদরা নগর হাভেলি : আসন ১ : কংগ্রেস।
দিল্লী : আসন ৭ : জনতা ৬. সি এফ ডি ১।
অরুণাচল : আসন ২ : কংগ্রেস ১, নির্দল ১।
গোয়া : আসন ২ : কংগ্রেস ১, অন্যান্য ১।
লাক্ষাদ্বীপ : আসন ১ : কংগ্রেস ১।
মিজোরাম : আসন ১ : নির্দল ১।
পণ্ডিচেরি : আসন ১ : এ ডি এম কে ১।

মহারাষ্ট্র : আসন ৪৮ : জনতা ১৯, সি পি আই (এম) ৩, কংগ্রেস ২০,
অন্যান্য ৬।

মণিপুর : আসন ২ : কংগ্রেস ২।

উত্তরপ্রদেশ : আসন ৮৫ : জনতা ৭১, সি এফ ডি ১৪।

মেঘালয় : আসন ২ : কংগ্রেস ১, এইচ এস পি ডি এস ১।

নাগাল্যাণ্ড : আসন ১ : অন্যান্য ১।

ওড়িশা : আসন ২১ : জনতা ১৪, সি এফ ডি ১, সি পি আই (এম) ১,
কংগ্রেস ৪, নির্দল ১।

পাঞ্জাব : আসন ১৩ : জনতা ৪, সি পি আই (এম) ., অকালি ৮।

রাজস্থান : আসন ২৫ : জনতা ২৪, কংগ্রেস ১।

সিকিম : আসন ১ : কংগ্রেস ১।

তামিলনাড়ু : আসন ৩৯ : জনতা ৩, কংগ্রেস ১৪, এ ডি এম কে ১৮,
ডি এম কে ১।

ত্রিপুরা : আসন ২ : সি এফ ডি ১, কংগ্রেস ১।

দ্রষ্টব্য : অন্যান্যের মধ্যে আছে পি ডব্লিউ পি ৫, আর এস পি ৪ ফরোয়ার্ড ব্লক ৩, মুসলিম লীগ ২, রিপাবলিকান পার্টি অব ইণ্ডিয় (খোবরাগারে গোষ্ঠী) ২, ন্যাশন্যাল কনফারেন্স (জম্মু-কাশ্মীর) ২ কেরল কংগ্রেস ২, ইউনাইটেড ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট (নাগাল্যাণ্ড) ১ হিল স্টেট পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (মেঘালয়) ১, মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টি ১। নির্দলদের মধ্যে ১ জন জনতা সমর্থিত ও একজন বিদ্রোহী জনতা।

ছুটি কেন্দ্রের নির্বাচন এখনো বাকি। সেগুলি হচ্ছে : মানডি ও লাদাখ।

॥ সমাপ্ত ॥